কেমন হবে ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম এবং তাঁর সাথীদের যিন্দেগী?
সীরাতের আলোকে রচিত ঈমানদীপ্ত একটি অদ্বিতীয় কিতাব-

নবীওয়ালা এবং সাহাবাওয়ালা যিন্দেগী
(গরীব ইসলাম)

(প্রথম খণ্ড)

-শাইখ মাহমুদ আল হিন্দী

অনুবাদ-
আবু আব্দুল্লাহ

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيراً ﴿٢١﴾

"তোমাদের মাঝে যারা আল্লাহ (তাআলার সন্তুষ্টি ও মহব্বত) এবং শেষ দিবসের (কামিয়াবীর) আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, আল্লাহর রাসূলের মাঝে তাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ (উস্‌ওয়াতুন্‌ হাসানাহ্‌)।"

(৩৩ সূরা আহযাব:২১)

হযরত আয়েশা রদিয়াল্লহু আনহা হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন,

بَدَأَ الْاِسْلَامُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ غَرِيْبًا فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ

“ইসলাম শুরুতে গরীব (অপরিচিত) ছিল, খুব শীঘ্রই তা আবার গরীব (অপরিচিত) হয়ে যাবে যেমনটি শুরুতে ছিল, সুতরাং সুসংবাদ গোরাবাদের জন্য (যারা অপরিচিত ইসলামকে নিজেদের জীবনে আঁকড়ে ধরে রাখে)।” (সহীহ মুসলিম)

[বি.দ্রঃ ‘গরীব’ শব্দটি আরবী শব্দ, যার অর্থ ‘অপরিচিত’। উর্দূ এবং বাংলাতেও ‘গরীব’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ ‘নিঃস্ব’। সুতরাং শব্দ একই হলেও বিভিন্ন ভাষায় অর্থ ভিন্ন ভিন্ন।- অনুবাদক]

হযরত সা’দ বিন হিশাম রদিয়াল্লহু আনহু আম্মাজান হযরত আইশা রদিয়াল্লহু আনহাকে প্রশ্ন করলেন, হে মুমিনদের আম্মা! আমাকে নবীজী ﷺ-এর আখলাক সম্পর্কে বলুন। আম্মা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি কুরআন পড়ো না? সা’দ বিন হিশাম রদিয়াল্লহু আনহু বললেন, জ্বী হ্যাঁ। তখন আম্মা বললেন, কুরআনই হলো নবীজী ﷺ-এর আখলাক।

যেহেতু কুরআন নবীজী ﷺ-এর আখলাক, আর কুরআনই হলো সকল এলেমের উৎস, তাই নবীজী ﷺ-এর যিন্দেগীই হলো সকল এলেমের মূল কেন্দ্রবিন্দু, বাস্তব জগতে কুরআনের অনুবাদ। আর নবীজী ﷺ-এর যিন্দেগীর যে ওয়ারিশ হবে বা সেই পবিত্র যিন্দেগীকে যে নিজের যিন্দেগী বানাবে কেবলমাত্র তারাই প্রকৃত আলেম, তাঁরাই প্রকৃত কুরআনের অনুসারী।

১০ জিলহজ্জ, ১৪৪০ হিজরী (১২ই আগস্ট, ২০১৯ ঈসায়ী) তারিখের ঘটনা।

আল্লাহর রাসূল ﷺ কোনো একটি যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে জিহাদের সমস্ত প্রস্তুতি শেষ করে সাহাবায়ে কেরাম রদিয়াল্লহু আনহুম আযমাঈনদের নিয়ে আহার করতে বসেছেন। খাসীর গোশত ও রুটি। এরই মধ্যে এক ব্যক্তি ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে উঁকি দিল। লোকটি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে ঘরে অবস্থান করতে দেখে চলে গেলো। তখন নবীজী ﷺ ইরশাদ করলেন, "লোকটি আবু জেহেল। সে যুদ্ধের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। সে তার ঘোড়াগুলোর পীঠে লোহার জীন পরিয়েছে।"......

না, এটি সীরাতের কোনো ঘটনা নয়, বাস্তবে এমন কিছু ঘটেনি, আবার এটি কল্প কাহিনীও নয়! এটি একটি স্বপ্ন!

স্বপ্নটির কথা কেন লিখলাম? কারণ আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, "যে আমাকে স্বপ্নে দেখল, প্রকৃতপক্ষে সে আমাকেই দেখল। কেননা শয়তান আমার রূপ ধারণ করতে পারে না।"

আর উপরোল্লিখিত স্বপ্নটিতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বার্তা আছে, তাই সর্বাগ্রে তা উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করছি। যথা:

১. আবু জেহেল সারা দুনিয়ার বাতিল ও কুফুরী শক্তির প্রতীক। আবু জেহেলের উত্তরসূরী বর্তমান যামানার সকল ত্বগুত শক্তি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলেছে।

২. আবু জেহেল ঘোড়া প্রস্তুত করেছে। অর্থাৎ দুনিয়ার সকল কাফের মুশরিকরা যুদ্ধের সকল সরঞ্জাম নিয়েই মাঠে নেমেছে।

৩. মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য যত রকমের শক্তি সঞ্চয় করা প্রয়োজন, বাতিল তা প্রস্তুত করতে কোনোই কার্পণ্য করেনি। কেননা লোহা সমর শক্তির প্রতীক। যেমন, কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

"আর আমি নাযিল করেছি লৌহ, তাতে আছে প্রচণ্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার।" (৫৭ সূরা হাদীদ: ২৫)

৪. রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরাম হচ্ছেন, আল্লাহ তাআলার মকবুল এক বাহিনী। তাঁরা আল্লাহ পাকের বাহিনীর প্রতীক। আল্লাহর বাহিনীতে আরো আছেন সম্মানিত ফেরেশতাবৃন্দ, আরো আছে অনেকে, আরো অনেক কিছু। যাকে ইচ্ছা তাকে দ্বারা আল্লাহ তাআলা তাঁর বাহিনীর কাজ নিতে পারেন। এক কথায়, আল্লাহ তাআলা ও তাঁর বাহিনীও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু......

উম্মত এখনো বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। তাই উম্মতকে দ্রুত জাগাতে হবে। পৃথিবীর ইতিহাসের সর্বশেষ ও সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধ, হক ও বাতিলের সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধের জন্য উম্মতকে এখনি জাগিয়ে তুলতে হবে।

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা! আপনারা এখন যে কিতাবটি পড়তে যাচ্ছেন, উপর্যুক্ত এই লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করতে এটি তেমনি এক প্রচেষ্টা। যদিও এই ধাচের কিতাব রচনা করার মতো উপযুক্ত ব্যক্তি কখনোই ছিলাম না, ভবিষ্যতেও হতে পারবো কিনা জানিনা, কেবল উম্মতের দুর্দশার কথা চিন্তা করে এবং ইলম গোপনের গুনাহ থেকে বাঁচার তাগিতে কিতাবটি রচনায় হাত দেই। তাছাড়া আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ-এর এই নির্দেশ পালনে-"আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও একটি আয়াতও যদি হয়।" (বুখারী, হাদীস নং-৩,৪৬১) এবং নিম্নোক্ত হাদীসের ভাষ্যটি সামনে রেখে এ গুরুতর কাজটি সম্পন্ন করার সাহস করি।

নবীজী ﷺ ইরশাদ করেন,"আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তিকে সজীব ও তরতাজা রাখুন, যে আমার নিকট থেকে কোনো হাদীস শুনে তা মুখস্থ করলো এবং অন্যকে পৌঁছে দিল। কেননা, হতে পারে জ্ঞানের কথার বহু ধারক তার চেয়ে জ্ঞানী ও সমঝদার ব্যক্তির নিকট তা পৌঁছাল, আবার এও হতে পারে যে, জ্ঞানের কথার অনেক ধারক নিজে তেমন জ্ঞানী ও সমঝদার নয়।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং-৩৬,৫১৬)

যাই হোক, কিতাবটিতে উম্মতে মুহাম্মাদীর সকল স্তরের ভাই/বোনদের জাগানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এই কাজ করতে গিয়ে প্রয়োজনের তাগিদে প্রত্যেকের ভুল-ত্রুটি নিয়েও আলোচনা করতে হয়েছে। সাধারণ দ্বীনদার, নাফরমান, গোনাহগার, সালেকীন, সালেহীন, দাঈ, রাজনীতিবিদ, মুজাহিদ, ত্বলিবুল ইলম, আলেম সমাজ সকল তবকার মুসলমানদের 'ইসলাহ' করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। কিতাবের বিষয়বস্তু অনেকের কাছে নতুন বা ভিন্নরকম

বোধ হতে পারে। তার কারণ নামের মাঝেই নিহিত। আমরা আমাদের সমাজের গতানুগতিক ইসলাম নিয়ে আলোচনা করছি না। চৌদ্দশত বৎসর আগের "অপরিচিত" ইসলাম নিয়ে কথা বলছি। যেহেতু আমাদের ইসলামের সাথে সেই যামানার ইসলামের অনেক পার্থক্য বিদ্যমান এবং আমরা প্রকৃত ইসলামের অনেক বিকৃতি ঘটিয়েছি, তাই আলোচনার প্রসঙ্গ অনেকের "স্ব-রচিত"(!) ইসলামের বিরুদ্ধে চলে যেতে পারে। এক্ষেত্রে আমরা অপারগতা প্রকাশ করছি। আমাদেরকে সত্য বলতেই হবে, উম্মতের সামনে সঠিক ইসলামকে তুলে ধরতেই হবে। এ ব্যাপারে আমরা আল্লাহ তাআলার পর অন্য কাউকে ভয় বা তোয়াক্কা করি না। কারো সমালোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, বরং আমরা উম্মতের ইসলাহ কামনা করি। আল্লাহর কসম আমরা উম্মতের ভালাই চাই। তাই কিতাবটি পাঠান্তে সমালোচনা নয়, আত্মসমালোচনা চাই; বিরোধিতা নয়, আত্মসংশোধন চাই; যুগের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়া নয়, যিন্দেগীর পরিবর্তন চাই; আর গাফলত নয়, এবার জাগ্রত হওয়া চাই, রণসাজে সজ্জিত হয়ে, "আল্লাহু আকবার" তাকবীর ধ্বনি তুলে, ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়া চাই।

মাহমুদ আল হিন্দী

-উম্মতে মুহাম্মাদীর একজন 'নাদান' হিতাকাঙ্ক্ষী।

সাহাবাওয়ালা মেজাজ গড়তে..........

কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতকে সঠিক পথ দেখাতে.........

পৃথিবীর মানচিত্র ও ইতিহাসকে পরিবর্তন করতে.........

উম্মতকে সাহাবাওয়ালা ঈমানী চেতনায় জাগ্রত করতে.........

আখেরী যামানার উম্মতকে নবুয়তের যামানায় ফিরিয়ে নিতে.......

সাহাবায়ে কেরামের জামাতের আদলে একটি নূরানী জামাত তৈরি করতে.......

এই কিতাবটি যথেষ্ট সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ!!!

-মাহমুদ আল হিন্দী

উৎসর্গঃ

প্রথমত, আমার নফ্‌স-কে, কেননা কাউকে নসীহত করার মতো যোগ্যতা বা ক্ষমতা কোনোটাই আমার নেই, কেবল আমার নফ্‌স ছাড়া! সবচেয়ে বেশি নসীহতের মুহতাজ আমি নিজে।

হে নফস্‌! এই কিতাবের প্রতিটা শব্দ তোমার জন্য। তাই কিতাবটি ভালোভাবে বারবার পড়ো, কেননা এর উপর তোমাকে অবশ্যই আমল করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, যারা সাহাবাওয়ালা যিন্দেগী চিনতে চায়, গড়তে চায়, তাদেরকে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে সাহাবাওয়ালা যিন্দেগী দান করুন। আমীন।

সূচিপত্র (প্রথম খণ্ড)

কিছু কথা

কিছু কথা কিছু ব্যথা

কেমন হবে ইমাম মাহ্দী আলাইহিস্ সালাম এবং তাঁর সাথীদের যিন্দেগী?

ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম এই পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা করবেন "নবুয়তের আদলে খিলাফত"। আর ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের আখলাক (স্বভাব চরিত্র) ও যিন্দেগী হবে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মত; কিন্তু চেহারা তাঁর মত হবে না। তাহলে, ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের সাথীদের আখলাক ও যিন্দেগী কেমন হবে? 'নবুয়তের আদলে খিলাফত' কায়েমের জন্য যদি নেতার (ইমামের) আখলাক ও যিন্দেগী রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মত হতে হয়, তাহলে নেতার সাথীদের আখলাক ও যিন্দেগী নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথীদের (সাহাবায়ে কেরামের) অনুরূপ হওয়া আবশ্যক। ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের সাথী হতে হলে এই ১৪০০ বছর পরও সাহাবাওয়ালা যিন্দেগীই হতে হবে। যারা মনে করেন এবং বিশ্বাস করেন, এই যামানায় সাহাবীদের হুবহু অনুকরণ ও অনুসরণ সম্ভব নয়, বরং নিষ্প্রয়োজন, দশ ভাগের কমপক্ষে একভাগ অনুকরণ ও অনুসরণ করলেই চলবে, দুঃখিত! তারা আর যাই হোন না কেন, ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের সাথী হতে পারবেন না। হ্যাঁ, দশ ভাগের একভাগ আমল করলে হয়ত জান্নাত মিলবে, কিন্তু ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের সাথী হওয়া আওর চীয্, তা হতে হলে নবীওয়ালা এবং সাহাবাওয়ালা যিন্দেগীই লাগবে। একটুও কম হলে চলবে না। তাই

আমাদেরকে নবীওয়ালা/সাহাবাওয়ালা যিন্দেগীর মাপকাঠি জেনে নিতে হবে। কেননা ইমাম মাহদীকে চিনতে হলে সর্বাগ্রে যাচাই করতে হবে, যার মধ্যে ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের কিছু আলামত পাওয়া যাচ্ছে, তার যিন্দেগী আল্লাহর রাসূল ﷺ এর যিন্দেগীর মত কিনা, তাঁর ﷺ যিন্দেগীর সাথে পুরোপুরি মিলে কিনা। আবার আমরা যারা ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের সাথী হবার স্বপ্ন দেখি আমাদেরও সাহাবাওয়ালা যিন্দেগী কিরূপ ছিল তা জেনে যিন্দেগী সেভাবে গড়তে হবে। আমরা যেন এই কথা মনে না করি, কালো পতাকার বাহিনীতে নাম লিখিয়েছি বলেই ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের হাতে বাইয়াত হতে পারবো কিংবা ৩১৩ জন বদরী সাথীদের একজন হয়ে যাবো। কেননা, কালো পতাকার বাহিনীতে হাজার হাজার মুজাহিদ বর্তমান আছেন, কিন্তু ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের সবচেয়ে মর্যাদাবান ৩১৩ জন সাথী কি সবাই হতে পারবেন? পারবেন না। আবার সেই ৩১৩ জন যে সবাই কালো পতাকার বাহিনীর সাথী হবেন, এমন তো কোনো হাদীস নেই, হ্যাঁ, সবাই হতে পারেন, কিছু হতে পারেন, অধিকাংশ হতে পারেন, আবার কেউ নাও হতে পারেন, সবগুলোই সম্ভাবনা রাখে। কালো পতাকার বাহিনী ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের সহযোগী হবেন, খিলাফত কায়েম করবেন, ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম চিহ্নিত হবার পর। আর প্রকৃত ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামকে চিহ্নিত করা এবং তাঁর হাতে বাইয়াত হয়ে ৩১৩ জনের অন্তর্ভূক্ত হওয়া কেবল তাদের পক্ষেই সম্ভব যাদেরকে আল্লাহ পাক স্বয়ং গাইড্ করবেন। আর আল্লাহ তাআলা হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের প্রাথমিক ৩১৩ জন সাথী তাদেরকেই নির্বাচিত করবেন, যাদের যিন্দেগী সাহাবাদের সাথে মিলবে, সে পৃথিবীর যে প্রান্তেই

থাকুক না কেন। আবারো বলছি, ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামকে চিহ্নিত করা কেবল তাদের পক্ষেই সম্ভব হবে যাদের যিন্দেগী সাহাবাওয়ালা, কারণ আল্লাহ তাআলা তাদেরকেই পথ প্রদর্শন করবেন, সত্য ইমাম মাহদীকে চিনিয়ে দিবেন। তাই ইমাম মাহ্দী আলাইহিস্ সালামের বদরী সাথী হতে হলে, যিন্দেগী সাহাবাওয়ালাই হতে হবে। শুধু কি বদরী সাথী হওয়ার জন্যই সাহাবাওয়ালা যিন্দেগী দরকার? না, ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের বাহিনীর অন্তর্ভূক্ত হতে হলে, তাঁর সহযোগী হতে হলে, আল্লাহ তাআলার মদদ-নুসরত পেতে হলে, আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক সাহাবাওয়ালাই হতে হবে। যিন্দেগী সাহাবাদের যিন্দেগীর মতোই হতে হবে। সে ব্যক্তি সবচেয়ে বড় আহাম্মক, যার যিন্দেগী সমাজের আর দশজন দ্বীনদারদের মতো (যাদের যিন্দেগীর অধিকাংশ কার্যকলাপ ইহুদী-নাসারাদের সাথে মিলে যায়), আর সে আশা রাখে হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের সাথী হবে!

আমরা যারা হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের হাতে বাইয়াত হওয়ার জন্য হিজরত করতে চাই, তাঁর সাথী হতে চাই, কেন চাই? কোন্ নিয়তে চাই? কেবলই কি মর্তবা হাছিল করা উদ্দেশ্য? আসমানের নীচে, জমিনের উপরে আমি সর্বশ্রেষ্ঠ হবো, এজন্য? না, নিয়ত সহীহ হলো না।

আমাদেরকে এ নিয়ত করতে হবে, হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম উম্মতকে সেই ইসলাম আবারো উপহার দিবেন, যা প্রিয় নবীজী ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে দিয়েছিলেন। তাই যদি আমি ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের সাথী হতে পারি, তাহলে আমিও সেই ইসলামের স্বাদ লাভ করতে পারবো, আমার যিন্দেগীও সাহাবাদের মতো হবে, আল্লাহ

তাআলার মারেফাত লাভ ও তাঁর সাথে আমার সম্পর্কও সাহাবায়ে কেরামের মতো হবে, আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলের মহব্বতও আমার দীলে সাহাবাওয়ালাই হবে। তাই আমরা নিয়তকে পরিবর্তন করি, সকলেই নবীওয়ালা/ সাহাবাওয়ালা যিন্দেগী গড়ার নিয়ত করি। কেননা, ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের হাতে বাইয়াত হলেই আমি আমার মঞ্জিলে মাকসাদে পৌঁছে গেলাম না। এরপর আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন কঠিন পরীক্ষাগুলো আসতে থাকবে। সেগুলো মোকাবেলা করা সাহাবাওয়ালা যিন্দেগী, সাহাবাওয়ালা কুরবানী আর সাহাবাওয়ালা ঈমানী শক্তি ছাড়া সম্ভব নয়। একারণেই অনেকেই (এক তৃতীয়াংশ) হয়রত ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের হাতে বাইয়াত হয়েও রণে ভঙ্গ দিবে, জিহাদ থেকে পালাবে, মুরতাদ হয়ে চিরকালের জন্য জাহান্নামে যাবে। এদেরকে আল্লাহ তাআলা কোনোদিন ক্ষমা করবেন না। তাই জোশে নয়, হুশের সাথে চিন্তা করে করে কদম বাড়ানো। সকল কিছুর আগে সাহাবাওয়ালা যিন্দেগী গড়ার মেহনত, পরে অন্য মেহনত। আর এজন্য আল্লাহ পাকের দরবারে খুব বেশি দুআ করা চাই, খুব বেশি পানাহ চাওয়া চাই। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে হেফাযত করুন। আমীন।

একটা বিষয় স্পষ্ট হওয়া দরকার। যেহেতু সবাই এখন ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের অপেক্ষা করছে, পারিপার্শ্বিক আলামত দৃষ্টে সবার মুখে এখন এক কলরব “ইমাম মাহদী”, ইমাম মাহদী”, তাই তাঁর প্রসঙ্গ এনে আলোচনা শুরু করা হলো। নয়তো, ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম যদি আমার জীবদ্দশায় নাও আসেন, বরং আরো একশ বা এক হাজার বছর পরেও তাঁর আবির্ভাব হয়, তবুও সকলের উপর এটা বাধ্যতামূলক

ছিল যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ এবং সাহাবাদের যিন্দেগী দেখে দেখে উম্মত নিজের যিন্দেগী বানাবে, সাহাবায়ে কেরামের যিন্দেগী যেমন ঈমানদীপ্ত ছিল, উম্মতের যিন্দেগীও তেমনি হবে, সাহাবায়ে কেরামের দীল যেমন দুনিয়া থেকে পাক ছিল, উম্মতের প্রত্যেকের দীলও তেমনি দুনিয়া থেকে পাক হবে, সাহাবায়ে কেরামের নাম শুনলে যেমনভাবে ভয়ে কুফ্ফারদের কাপড় নষ্ট হয়ে যেত, এই উম্মতের প্রত্যেকের নাম শুনলেও এভাবে কাফেরদের ঘুম হারাম হয়ে যাবে। তাই ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম আমাদের যামানায় আসুক বা না আসুক, আমরা আমাদের যিন্দেগীকে সাহাবাওয়ালা যিন্দেগী বানাই, আমাদের সন্তানদেরকে সাহাবাওয়ালা যিন্দেগী গড়ে দেই, তারা তাদের সন্তানদেরকে শিখাবে, একসময় যখন হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম আসবেন তখন এই দুনিয়া থেকে বাতিলকে মিটানো কোনো বিষয়ই হবে না, আমাদেরকে অথবা আমাদের সন্তানদেরকে আল্লাহ তাআলা ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের সাথী বানিয়ে সারা বিশ্বে ইসলামী খিলাফত কায়েম করবেন, দাজ্জালকে প্রতিহত করবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এবং আমাদের সন্তানদেরকে কবুল করুন। আমীন।

কিছু ব্যথা

সাহাবায়ে কেরামের মাঝে পরিপূর্ণ ইসলাম ছিল, তবে এমন কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল, যেগুলো পরবর্তী উম্মতের মাঝে ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে পেতে বর্তমানে প্রায় 'নাই' পর্যায়ে চলে এসেছে, অথচ উম্মত এখনও নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, কুরআন কারীমের তিলাওয়াত, গবেষণা ইত্যাদি আমলগুলো করে থাকে। এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণেই পরবর্তী উম্মত যতই ইবাদত করুক না কেন সাহাবায়ে কেরামের ঘোড়ার পায়ের ধূলার সমানও হতে পারবে না। সাহাবায়ে কেরামের কাছে যে ইসলাম ছিল আজ তা আমাদের নিকট অপরিচিত (গরীব)। বর্তমানে একজন মানুষ ঈমান আনার পর কিছু ইবাদত বন্দেগী করলে যেমন তাহাজ্জুদ ও অন্যান্য নাওয়াফেলের এহ্তেমাম করলে, তাবলীগে কিছু সময় লাগালে, দাঁড়ি-টুপি, পাঞ্জাবী, পাগড়ি, জুব্বা ইত্যাদি সুন্নতি লেবাস ধরলে, নিজে খাস্ পর্দা করলে, স্ত্রীকে খাস্ পর্দায় রাখলে, মুআমালাত, মুআশারাত ঠিক করলে, আখলাক-চরিত্র ভালো করলে (যেমন, যে মানুষের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে না, অহংকার করে না, চোখের গুনাহ ও অন্যান্য প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য গোনাহ করে না) তাকেই পরিপূর্ণ দ্বীনদার মনে করা হয়, যামানার শ্রেষ্ঠ বুযুর্গ আখ্যায়িত করা হয়। হ্যাঁ, এই ব্যক্তি অবশ্যই বুযুর্গ-ওলী, আল্লাহ ﷻ চাইলে জান্নাতী মানুষ, সন্দেহ নেই, কিন্তু আমাদের কথা হলো, শুধু এতটুকু হলেই নবীওয়ালা/সাহাবাওয়ালা যিন্দেগী হলো না, এর জন্য চাই আরো কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও গুণ থাকা, যেগুলো না হলে একজন মানুষ যতই বুযুর্গ/ওলী হোক না কেন তার যিন্দেগী নবীওয়ালা/সাহাবাওয়ালা যিন্দেগী

নয়। যেই বৈশিষ্ট্যগুলোর উপর আমল করলে এই যামানায় একশ গলাকাটা শহীদ সাহাবীর মর্তবা লাভ হবে ইন্‌শাআল্লাহ।

কিন্তু অত্যন্ত আফসোস ও পরিতাপের বিষয় হলো, আমল তো পরে করব, সেই দ্বীনকেই তো আমরা চিনি না, আজ সত্যিকারের নবীওয়ালা ও সাহাবাওয়ালা দ্বীন আমাদের নিকট অপরিচিত। আমাদের সামনে দ্বীনের যে শেকেল আছে, তা কস্মিনকালেও নবীওয়ালা/সাহাবাওয়ালা দ্বীন নয়, হতেই পারেনা! দ্বীনের কিছু বাহ্যিকতা, রুসুম রেওয়াজ আর বাহিরের খোলস ব্যতীত আমাদের নিকট দ্বীনের কিছুই নেই। তার প্রমাণ- একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করলেন, সাহাবীদের সংখ্যা কেমন হয়েছে? সাহাবী বললেন, দেড় হাজারের মত। নবীজী ﷺ বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! (যথেষ্ট হয়েছে।)

পৃথিবীতে আল্লাহর দ্বীন ও মুসলমানদের নিরাপত্তা কায়েমের জন্য যদি দেড় হাজার সাহাবীই যথেষ্ট হয়, তাহলে বর্তমান বিশ্বে আড়াইশ কোটি মুসলমান গেল কোথায়?

লক্ষ লক্ষ হাফেয-আলেম-মুফতী, মাদরাসার ছাত্র, সালেকীন, দাঈ-মুবাল্লিগ, মুজাহিদ থাকা সত্ত্বেও কেন আজ মুসলমানদের এই হালত?

কেন আজ পশ্চিমা শক্তি মুসলিম বিশ্বের উপর অবিরত ক্রুসেড পরিচালনা করে যাচ্ছে?

কেন আজ মুসলমানদের ঘরে ঘরে কারবালার মাতম আর আহাজারি?

কেন আজ মায়ের বুক খালি হচ্ছে, ভাইয়ের বুক থেকে রক্ত ঝরছে?

কেন আজ গর্ভবতী মায়ের গর্ভের শিশুকে স্নাইপার দিয়ে হত্যা করা হচ্ছে?

কেন আজ দুধের অবুঝ শিশুর শাহাদাতের উপর মমতাময়ী মায়ের আর্তচিৎকার?

আজ কোন্ সাহসে একজন মাত্র খ্রিস্টান মসজিদে ঢুকে শতাধিক মুসলমানকে "ভিডিও গেম্স খেলা"র মতো হত্যা করছে?

আজ কেন বোমার আঘাতে মুসলমানের দেহ টুকরা টুকরা হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে?

আজ কেন মুসলমানদের জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে, হত্যা করে গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর বিরান করে দেয়া হচ্ছে?

আজ কেন মুসলমানদেরকে তাদের ভূমি থেকে বিতাড়িত করা হচ্ছে?

আজ কেন আফগান থেকে কাশ্মির পর্যন্ত, ইরাক থেকে ফিলিস্তিন পর্যন্ত, চেচনিয়া থেকে উইঘুর পর্যন্ত, মায়ানমার থেকে আসাম পর্যন্ত, ইয়েমেন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত অভিশপ্ত ইহুদী আর হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান মালাউনরা পানির মত সস্তা মনে করে মুসলমানদের রক্ত প্রবাহিত করছে?

আবু গারীব কারাগারের ফাতেমা নূর থেকে নিয়ে মুসলিম নারী ড. আফিয়া সিদ্দিকী পর্যন্ত কেন আজ তাদের বর্বরতার শিকার হচ্ছে?

আজ কেন আমার মা-বোনকে ধর্ষণ করে তাদের স্তন কাটা হচ্ছে? তাদের লজ্জাস্থান বিকৃত করা হচ্ছে?

আজ কেন আমার মা-বোনের গর্ভে কুকুর, শূকর আর হায়েনাদের ভ্রূণ প্রস্ফূটিত হচ্ছে?

আজ কেন বোরকা পরিহিতা আমার বোনকে হত্যা করে বুকের উপর পা রেখে জারজ হারামীর বাচ্চারা কফি খাচ্ছে?

কেন আজ মুসলমানদেরকে পতঙ্গের ন্যায় আগুনে পুড়িয়ে কুফ্ফাররা আনন্দ উল্লাস করছে?

গুয়ান্তানামু বে থেকে বাগরাম জেল পর্যন্ত, কেল্লায়ে জঙ্গী থেকে শিবারগান জেল পর্যন্ত এবং সিআইএ এর গোপন কারাগার থেকে নিয়ে মোসাদ আর 'র' এর বন্দীশালা পর্যন্ত, রিমান্ডের নামে কেন আজ হাজারো মুসলিম নওজোয়ান আমেরিকা ও তাদের সাঙ্গ-পাঙ্গদের জুলুমের চাকায় নিষ্পেষিত হচ্ছে?

কী সেই কারণ, যার জন্যে মুসলমানদের প্রথম কেবলা 'বাইতুল মুকাদ্দাস' নাপাক ইহুদীরা যেদিন দখল করে, সেদিন বুক ফুলিয়ে গর্বভরে বলছিল, "মুহাম্মাদ তো চলে গেছে, কিছু রমণী রেখে গেছে!"?

ইউরোপ-আমেরিকার গৃহপালিত জানোয়ার ইসরাঈল আজ কেন, কোন্ সাহসে ট্যাংক ও স্থলবাহিনী দিয়ে ঘেরাও করে গাজাকে এক কয়েদখানায় পরিণত করেছে?

আজ যুদ্ধ-বিধ্বস্ত মুসলিম এলাকাগুলোর বাসিন্দাদের নিকট কুফ্ফারদের বিমান থেকে বর্ষিত বোমা ছাড়া খাবার মতো কিছুই নেই, সেখানকার মুসলমানরা একবেলা আহারের জন্য হারাম কুকুর-বিড়ালও পাচ্ছেনা, কেন?

কিসের জন্য আজ মুসলমানরা বানে ভেসে আসা খরকুটোর মতো?

কী তার কারণ? কেন এমন হচ্ছে?.........

আজ পাশ্চাত্যের পা-চাটা গোলাম, ৫৭টি দেশের মুসলিম শাসকরা কোথায়?

কেন আজ তারা অসহায় মুসলমানদের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে না? কেন তারা মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধের পতাকা উত্তোলন করছে না?

ইসলামের শুরু হতে আজ পর্যন্ত আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা, হাকিম বিন জাবালাহ, আশতার মালিক, মুখতার ছাকাফী, হাসান বিন সাব্বাহ, ইবনে আলকমা, নাসীরুদ্দীন তুসী, ফাতেমী শিয়া, মীর জাফর, মীর সাদিক, ইয়াহিয়া খানের মতো মুনাফিকদের উত্তরসূরীদের খাতায় মুসলিম দেশের মুসলমান নামধারী শাসকবৃন্দ কেন আজ তাদের নাম লিখিয়েছে?

আজ পৃথিবীর কানায় কানায় মুসলমানদের লাশের উৎকট গন্ধ! দিকে দিকে মুসলমানদের বিভৎস লাশ আর জীবিতদের অর্ধমৃত-মানবেতর জীবন! এসব দেখেও কেন আজ বুক ফাটা কান্না আসে না?

এক মুসলমান মেয়ের ডাকে সিন্ধু বিজেতা মুসলিমের সন্তান পরিচয়দাতারা আজ ফাতেমা নূর, ড. আফিয়া সিদ্দিকী আর অন্যান্য শহীদানের ডাকে কেন ছটফট করে না?

এক খ্রিস্টান নারীর আহ্বানে স্পেন বিজয়ী মুসলমানের অনুসারীরা আজ ক্রুসেডীয় জুলুমের শিকার হাজারো বসতহীন মুসলিম বাচ্চাদের প্রতিরক্ষার জন্য কেন ময়দানে আসে না?

আজ কোথায় আড়াইশ কোটি মুসলমান? কোথায় তারা?...........

আজও কি জিহাদ 'ফরযে আঈন' হয়নি? এখনো কি প্রতিটি মুসলমানের বাচ্চার উপর জিহাদ ফরয হয়নি? আজও যদি না হয়, তাহলে আর কবে হবে?

আজ কোথায় দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের সাথী ভাইরা?

কেন তারা ময়দানে আসে না? কেন তারা আজ দাওয়াতকেই 'সবচেয়ে বড় নবীওয়ালা কাম' মনে করে? কেন তারা আজ ময়দানে না এসে মসজিদে বসে থেকে জিহাদের ফাযায়েল তালাশ করে? কেন আজ তারা মুসলমানদের রক্ত ঝরানোকেই জিহাদ মনে করে?

বাতিল নয়, কেন তাদের লাঠি আজ উম্মতেরই মাথা ফাটাচ্ছে? কেন আজ তাদের তরবারি মুসলিম মায়ের বুককেই খালি করছে? কেন তারা আজও প্রকৃত দাওয়াতের দিকে ফিরে আসছে না? কেন তারা আজও 'অসৎ কাজের নিষেধ' করছে না?

কেন তারা আজও মসজিদে জিহাদের এলান করে না? কেন তারা আজও তালিমের হালকায় "ফাযায়েলে জিহাদ" পড়ে না? আজও কেন আপসে 'কিতাল ও শাহাদাতের' মুজাকারা হয়না? কেন আজও মাশোয়ারা মজলিসে জিহাদের পরামর্শ হয় না? আজও কেন আমাদের মুরুব্বীরা তিন চিল্লার তশকিল বাদ দিয়ে "আজীবন চিল্লা"র (হিজরতের) তশকিল করে না?

তাদের 'খুরুজ' কবে জিহাদের জন্যে হবে? তাদের 'গাশত' কবে অভিযানের রূপ নিবে? 'আড়াই ঘণ্টার মেহনত' শেষ হয়ে তাদের যিন্দেগী কবে জিহাদের জন্য ওয়াক্‌ফ হবে? তাদের 'ঈমান গড়ার মেহনত' কবে

শেষ হবে? তাদের ঈমান তাদেরকে কবে জিহাদের উপযুক্ত করবে? ‘মারকাজের পাহারাদারি’ কবে ‘মুসলিম ভূমির সীমানার পাহারাদারি’তে রূপ নিবে? তাদের হীম-শীতল রক্ত কবে কাফেরের বিরুদ্ধে বারুদে পরিণত হবে? তাদের হাতের লাকড়ি কবে মেশিনগান হয়ে কথা বলবে? তাদের পিঠের গাট্টিগুলো কবে ‘মাইনে’ পরিণত হবে? তাদের ছামানাগুলো কবে বোমা হয়ে বিস্ফোরিত হবে? তাদের চুলা গুলো থেকে কবে ‘প্রতিশোধের আগুন’ উত্থিত হবে? আর কতকাল তাদের জন্য ময়দান অপেক্ষায় থাকবে? আর কতদিন?

কোথায় আজ হক্কানী পীর সাহেবরা এবং তাদের মুরীদানরা?

কোথায় আজ খানকাহ্ওয়ালারা? কেন আজ তারা ঘরে বসে থেকে, এক ফোঁটা ঘামও না ঝরিয়ে, নিজেদেরকে ‘মুজাহিদে আকবর’ মনে করে?

তারা কোন্ বৈরাগ্য অবলম্বন করছে? জিহাদের চেয়ে বড় কোনো বৈরাগ্য আছে কি? তারা কোন্ ‘নফসের কুরবানী ও মুজাহাদা’ করে? জিহাদের চেয়ে বড় ‘নফসের কুরবানী ও মুজাহাদা’ আছে কি? তারা কোন্ খালওয়াত (একাকীত্ব) অবলম্বন করে? পাহাড়ের অন্ধকার গুহার চেয়ে সুন্দর খালওয়াত আর কোথাও পাবে কি?

তাদের খানকাহ্গুলো কবে দুর্গে পরিণত হবে? তাদের নিঃশব্দ যিকিরগুলো কবে গগনবিদারী রণহুঙ্কার হয়ে বাজবে? তাদের তসবিহগুলো কবে শহীদের লাশ গণনা করবে? তাদের অশ্রুসিক্ত জায়নামাযগুলো কবে বুকের তাজা রক্তে রঞ্জিত হবে? কবে তারা জাগবে? আর কবে?

আজ কোথায় মুসলিম নামধারী রাজনৈতিক দলের কর্মী ভাইয়েরা?

জিহাদের নামে যারা রাজপথ কাঁপায়, তারা কেন প্রকৃত জিহাদের জন্য ময়দানে ছুটে না? মঞ্চে যারা 'গণতন্ত্রের জয়গান' গায়, তারা কেন ময়দানে এসে তাকবীরে তাকবীরে আকাশ বাতাস মুখরিত করে না? মিছিলে যারা বাতিলের বিপক্ষে স্লোগান দিয়ে গলা ফাটায়, ময়দানে এসে বাতিলের বিরুদ্ধে কেন তারা অস্ত্র ধরে না? তাদের সভাগুলো থেকে এখনো কেন জিহাদের আওয়াজ ভেসে আসে না? বাতিল 'ভোটযুদ্ধ' বাদ দিয়ে কেন তারা হক 'সশস্ত্র জিহাদ' করে না? নাকি তারা মনে করে, তারা যা করছে, সেটিই একমাত্র জিহাদ, পৃথিবীতে আর কোনো জিহাদ নেই? কবে তাদের বোধোদয় হবে? আর কবে?

আজ কোথায় মিম্বরওয়ালারা?

তাদের মিম্বরে আজও কেন জিহাদের আযান শুনা যায় না? আজও কেন তাদের মিম্বরে নবীওয়ালা ইসলামের আলোচনা হয়না? সেখানে আজও কেন দাজ্জালের 'তাযকিরা' হয় না? তাদের মিম্বর থেকে কেন আজ ঈমানী জযবা জাগ্রত হয় না? কেন?

কোথায় আজ উম্মতের ওয়ায়েজ-বক্তারা?

কোন্ ইসলামের বয়ান তাদেরকে "আন্তর্জাতিক খ্যাতি" এনে দিয়েছে? যখন তারা মাইক কাঁপায়, তখন কেন তারা উম্মতকে জাগায় না? কোন্ ইসলাম তাদেরকে "আলেমে হক্কানী, পীরে কামেল" বানিয়েছে? কোন্ ইসলাম?

কোথায় আজ উম্মতের রাহ্‌বার, উলামা সমাজ?

মাদরাসাওয়ালারা আজ কোথায়? আজও কেন তারা নিশ্চুপ?

আহ্! কী আর বলবো তাদের কথা! কষ্টে যেন আজ বুক ফেটে যাচ্ছে, কলিজা বেরিয়ে আসছে! মুখ দিয়ে যেন আর কথা বের হতে চাচ্ছে না?

আজ আলেম সমাজ কেন মূক, বধির ও অন্ধ হয়ে চার দেয়ালের মাঝে বসে আছে?

আজ উম্মতের এই অবস্থার জন্য তাদেরকেই সবচেয়ে বেশি জবাবদিহি করতে হবে! তাদেরকে কি সেই জিনিস দেয়া হয়নি, যা দেয়া হয়েছিল নবী-রাসূলদেরকে? তাদেরকে কি সেই জিনিস দেয়া হয়নি, যা দেয়া হয়েছিল, সাহাবায়ে কেরামদেরকে? উম্মতের নেতৃত্ব কি তাদেরই দেয়ার কথা ছিল না? উম্মতের দুর্দিনে তাদেরই কি প্রথম এগিয়ে আসার কথা ছিল না? উম্মতের ব্যথায়, উম্মতের কষ্টে তাদেরই কি প্রথম অশ্রুপাত করার কথা ছিল না? তাদেরই কি প্রথম ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা ছিল না? তাদেরই কি উম্মতের শ্রেষ্ঠ বীর হওয়ার কথা ছিল না?

উম্মতকে সঠিক ইসলামের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব কার? নবীওয়ালা এবং সাহাবাওয়ালা ইসলামের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব কার? উম্মতকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্ব কার?

আহ্! কী হলো আজ আলেম সমাজের!..............

যে কুরআন সাহাবাদেরকে “বীরত্বের মুকুট” পরিয়েছিল, সেই কুরআনের বাহকরা কেন আজ “নারীত্বের মালা” গলায় ধারণ করে আছে?

যে কুরআন সাহাবায়ে কেরামকে “আল্লাহর সিংহ”, “আল্লাহর বাঘ” আর “আল্লাহর তরবারি” বানিয়েছিল, সেই কুরআনের বাহকরা কেন আজ “অণ্ডকোষবিহীন প্রাণী” হয়ে গিয়েছে?

যে কুরআন সাহাবাদেরকে ঘরে থাকতে দিত না, ময়দানে তাড়িয়ে নিয়ে যেত, সেই কুরআনের বাহকরা কেন আজ ‘অবলা গৃহবধূ’ হয়ে গিয়েছে?

যে কুরআন সাহাবাদেরকে “পারমাণবিক বোমা” বানিয়েছিল, সে কুরআনের বাহকরা কেন আজ একটা “ককটেল”ও হতে পারছে না?

কেন আজ কুরআন তাদের গলার নীচে নামছে না?

আজ তারা যাঁদের বর্ণিত হাদীস পড়ে, সেই সকল সাহাবীদের যিন্দেগী কেন দেখেনা?

সাহাবাদের এলেম যদি তাঁদেরকে যোদ্ধা বানায়, তাহলে এ যামানার আলেমদের এলেম কেন তাদেরকে “ভীরু-কাপুরুষ”, “জিহাদ বিরোধী” বানায়?

তারা কি আজ নিজেদেরকে সাহাবীদের চেয়ে বেশি আলেম মনে করে, বেশি হেকমতওয়ালা মনে করে, নাকি তারা মনে করে, সাহাবারা আলেম ছিলেন না, দ্বীন বুঝতেন না? নাকি সাহাবায়ে কেরাম তালীম-তরবীয়তের কাজ করতেন না?

তাহলে, কেন আজ তারা সাহাবাদের মতো গর্জে উঠে না, কেন আজ তারা বাকরুদ্ধ? কেন আজ তাদের মাঝে পৌরুষত্ব জেগে উঠে না? কেন আজ বাতিল তাদেরকে 'মশা-মাছি তুল্য' মনে করে?

কী তার কারণ? কেন এমন হচ্ছে?............

হ্যাঁ, হতে পারি আমি 'আঁদার ব্যাপারী', কিন্তু 'জাহাজের সওদাগররা' আজ কোথায়?

কেন তারা আজ নিজেদের ঈমান সস্তায় বিক্রি করে দিচ্ছে?

আজ কেন তারা ত্বগুত সরকারের তাবেদারি করছে? কেন তারা বাতিলের গোলামী করছে?

আজ কেন 'ক্বওমী শিক্ষা'র সরকারি স্বীকৃতির প্রয়োজন হচ্ছে?

আজ যে সকল মরদে মুজাহিদ উম্মতের জন্য নিজের বুকের রক্ত ঢেলে দিচ্ছে, আজ তাদেরকে কেন আলেমরাও 'জঙ্গী', 'সন্ত্রাসী' বলে গালি দিচ্ছে?

আজ কেন তারা 'দারুল হারব' কে 'দারুল আমান' ফতোয়া দিচ্ছে? "জিহাদ ফরযে আঈন হয়ে গিয়েছে"- কেন তারা এই ফতোয়া দিচ্ছে না?

আলেম সমাজ কী উম্মতের অবস্থা দেখছে না? অসহায় নারী-শিশু-বৃদ্ধদের আহাজারি আর আর্তনাদ কি তাদের কানে পৌঁছ্‌ছে না?

তারা কিসের অপেক্ষা করছে? তারা কার অপেক্ষা করছে? তারা কোন্ দিনের অপেক্ষা করছে? তারা কি সেদিন "জিহাদ ফরযে আঈন" ফতোয়া দিবে, যেদিন তাদের চোখের সামনে তাদের স্ত্রীদেরকে গণধর্ষণ করা হবে?

নাকি, যেদিন তাদের চোখের সামনে তাদের কন্যাকে বে-ইজ্জতি করা হবে? যেদিন তাদের মায়েদের স্তন কাটা হবে? যেদিন তাদের কোলের শিশুকে পায়ের নিচে পিষ্ট করে হত্যা করা হবে? যেদিন তাদের দুধের শিশুকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে? যেদিন তাদের মাদরাসাগুলোকে তালাবদ্ধ করে দেয়া হবে? যেদিন তাদেরকে পাইকারী হারে হত্যা করা হবে? যেদিন তাদেরকে আবারো গাছে ঝুলানো হবে? সেদিন?

মাদরাসাগুলোকে কুফ্‌ফার সরকারের কাছে 'জঙ্গীমুক্ত' হিসেবে পরিচয় দিতে কেন আজ এত ব্যস্ততা? আজ কেন তারা জিহাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে? কেন আজ পৃথিবী থেকে জিহাদকে বিদায় জানানোর জন্য "জিহাদ বিরোধী" ফতোয়ায় লাখো মুফতী (?) সাক্ষর করছে? কেন আজ তারা এ.সি রুমে বসে, পোলাও-কোরমা-বিরিয়ানী খেয়ে, তপ্ত ময়দানের "না খেতে পাওয়া" আমার ক্ষুধার্ত জানবাজ মুজাহিদ ভাইদের বিরুদ্ধে ফতোয়াবাজী করছে? কিসে তাদেরকে এমনটি করতে বাধ্য করছে? কেন তারা ন্যাক্কারজনক এইসব ফতোয়া দিয়ে তৃপ্তিবোধ করছে?

এসব নষ্ট ফতোয়াবাজী করে আজ তারা কিসের দায়মুক্ত হতে চায়? এসব করে তারা কাকে সন্তুষ্ট করতে চায়? আল্লাহ, তাঁর রাসূল ﷺ এবং একনিষ্ঠ মুমিনগণ এই সব কুলাঙ্গারদের কক্ষনো মেনে নিবেন না! এদের উপর কক্ষনো সন্তুষ্ট হবেন না! কস্মিনকালেও না!

মুজাহিদরা কেন? কেন তাদের কলম আজ বাতিলের বিরুদ্ধে চলে না? আজ কেন তাদের কলম সরকারের বিরুদ্ধে মুখ খোলে না? নারী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কেন তারা কথা বলে না? তাদের পৌরুষত্ব কেন নারী নেতৃত্বের মসনদকে গুড়িয়ে দেয় না?

আজ কোন্ হেকমতের কারণে আলেমকুল শিরোমণি ‘হাজারো আলেমের রক্তে রঞ্জিত’ নারী নেত্রীর হাতে হাত মিলিয়ে মুসাফাহা করে?

আজ কেন ‘ত্বগুত কন্যা’কে ‘কওমী জননী’ উপাধি দেয়া হচ্ছে? এই শিক্ষা কোন্ ইসলামের? এই শিক্ষা কোন্ কুরআনের? এই শিক্ষা কোন্ হাদীসের?

আজ কেন মুশরিকদেরকেও ‘কাফের’ বলতে আলেম সমাজ লজ্জা (!) পাচ্ছে? নাস্তিককে নাস্তিক বলতে আলেম সমাজ ভয় (!) পাচ্ছে? কেন তারা সমাজে নাস্তিক-মুরতাদ খোঁজে পাচ্ছে না? তারা চোখে কোন্ চশমা পরে আছে? আজ কেন তারা হককে ‘বাতিল’ বলে সম্বোধন করছে? কেন? তারা কার অনুসরণ করছে? তারা কোন ইসলামকে আঁকড়ে ধরে আছে? তারা কোন্ রাসূলের ওয়ারিশ? তারা কোন্ নবীর নায়েব? তারা কোন্ খুলাফায়ে রাশেদার খলীফা?

তাহলে, এটাই কি সেই জামানা যার সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে, “তখন আলেমরা হবে আসমানের নীচে ও জমিনের উপরে সবচেয়ে নিকৃষ্ট”?

যদি তাই না হবে, ‘দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও ইসলামী রাজনীতি’র নামে আজ কেন ‘আলেম সমাজ’ জিহাদ বাদ দিয়ে কুফুরী ও ভ্রান্ত পন্থা অবলম্বন করছে? কেন তারা আজ ‘ইসলামী গণতন্ত্রের’ নামে পতিতা পশ্চিমা জাতির ‘নষ্ট দুধ’ গোগ্রাসে পান করছে? কেন? কেন?

আজ আমার মুখের লাগাম খুলে গিয়েছে! আজ কেউ আমার যবান ধরে রাখতে পারবে না! আজ আমি বিদ্রোহী! বাতিল ও তার গোলামদের জন্য আজ আমি অভিশাপ! আজ আমি সর্বত্র ‘দ্রোহের ঝাণ্ডা’ উড্ডয়ন করেছি!

আজ আমি তাদের মনগড়া, স্ব-রচিত, নব্য ইসলামের বিরদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছি! আজ আমি তাদের শান্তিপূর্ণ (!), ভ্রান্ত, আধুনিক ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছি!

যে ইসলাম বাতিলের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শিখায় না, যে ইসলাম 'দিগ্বিজয়ী সিপাহসালার' তৈরি করে না, পক্ষান্তরে যে ইসলাম ঘরকুনো 'কাপুরুষে'র জন্ম দেয়, উম্মতকে খোজা (Castrated) করে দেয়, আমার বিদ্রোহ আজ সে ইসলামের বিরুদ্ধে!

দিকে দিকে 'ঈমানের কেল্লাগুলোতে' আজ আমি সেই ইসলামের নিশান উত্তোলন করছি, যে ইসলাম সাহাবাদেরকে শিখিয়েছিলেন স্বয়ং নবীজী ﷺ! আজ আমি সেই ইসলামের গানই গাইব, যে ইসলামকে পরম মমতায় বুকে আগলে রেখেছিলেন সাহাবায়ে কেরামগণ!

না, আজ আমার যবান থেকে 'গীত' নয়, অনল বর্ষিত হবে। আজ আমার কলম 'তরবারি' হয়ে 'উন্মত্ত খুনের পয়গাম' রচনা করে যাবে! আজ আমার দেহের প্রতিটি শিরা-উপশিরায় রক্ত নয়, আগুন বইছে! আজ আমার অস্তিমজ্জা 'রক্তকণিকা' নয়, 'অগ্নিস্ফূলিঙ্গ' তৈরি করছে! আজ আমি লেলিহান অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলন করেছি, যা প্রতিশোধের দাবানল হয়ে সমস্ত বাতিল, তাবেদারদের শিবির জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিবে। আজ আমি আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করবো না, কারো শক্তি কিংবা ক্ষমতার পরোয়া করবো না, কারো রক্ত-চক্ষুকে তোয়াক্কা করবো না! আজ কেউ না আসুক, আমি একাই লড়ব! সারা দুনিয়ার ত্বগুতের বিরুদ্ধে আমি একাই জিহাদ করব! আমি জানাজা চাই না, কাফন-দাফন চাইনা, আজ আমি শাহাদাত চাই! ইসলাম মিটে যাওয়ার আগে আমিই মিটে যেতে চাই!.....

কী হবে এ জীবন দিয়ে, কী হবে আর বেঁচে থেকে! আজ কোনো আলেম কিংবা কোনো যালেম, কেউই আমাকে ফিরাতে পারবে না! আল্লাহ, তার রাসূল ﷺ এবং “উম্মতে মুহাম্মাদী”র জন্য আমার জান কুরবান! যেদিকে তাকাই সেদিকেই উম্মতের এ হালত দেখে, যেদিকেই কর্ণপাত করি, সেদিক হতেই উম্মতের আর্তনাদ শুনে, আজ আমি প্রচণ্ড ক্ষেপে গিয়েছি, তাই মুখে যা আসবে তাই বলে যাবো, কেউ বাধা দিবেন না! আজ কেউই আমার গলা টিপে ধরতে পারবেন না!.........

যারা প্রকৃতঅর্থে “আহলে হক” উলামায়ে কেরাম, যাদের যিন্দেগী আমার রাসূলের ﷺ যিন্দেগীর সাথে মিলে, যাদের যিন্দেগী সাহাবাদের যিন্দেগীর মতো, উম্মতের সেই সকল গোরাবা (অপরিচিত) আলেমদের জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক! আমি তাদের ক্রীতদাস, ইচ্ছা করলে তারা আমাকে গোলাম বানিয়ে রাখবে, নতুবা আযাদ করে দিবে। আমি তাদের জুতা বহন করে দিবো, তাদের জুতা সোজা করে দিবো। তাদের পায়ের জুতাকে আমার মাথার টুপি বানিয়ে রাখবো। তাদের জন্য আমার জীবন দিয়ে দিবো। আমাকে মাফ করবেন, এতক্ষণ আমি যা বলেছি তা আপনাদের উদ্দেশ্যে নয়।

কিন্তু আজ উম্মতের আলেম সমাজের অধিকাংশের অবস্থা দেখে ক্ষোভে, কষ্টে মনে হয় দেয়ালের সাথে মাথা ঠুকরে নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলি! এসব দেখার জন্যই কি আমার মা আমাকে জন্ম দিয়েছিল? এসব শুনার জন্যই কি আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল? আহ্! এসবের শেষ কবে হবে? আর কতদিন এসব দেখতে হবে? কবে উম্মত সঠিক পথে ফিরে আসবে? সঠিক দ্বীনের পতাকা উম্মত কবে উত্তোলন করবে?..........

না, আমি আজ মুসলমানদের উপর আক্রমণকারী অমুসলিমদের গালমন্দ করব না। কেননা, তারা তো অবুঝ! বরং আমি তাদের জন্য দুআ করব। তাদেরকে জাহান্নামে পাঠিয়ে আমি পৈশাচিক আনন্দ করতে ইচ্ছুক নই। দুনিয়া থেকে সকল কুফ্ফার শক্তিকে ধ্বংস করলেই আমার কাজ শেষ হয়ে গেল না।

আমার নবীর সামনে দিয়ে এক ইহুদীর লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তা দেখে আমার রহমতের নবী ﷺ চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হযরত! এ তো একজন ইহুদীর লাশ! দয়াল নবী ﷺ বললেন, আরে আমি বেঁচে আছি আর আমার সামনে দিয়ে একজন মানুষ চিরদিনের জন্য জাহান্নামে যাচ্ছে, আমি কিভাবে সহ্য করব?

আহ্! আজ আমাদের কী হলো! ওদেরকে পথ দেখানোর জন্যই তো আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। আমরা মুসলমানরাই গালমন্দ পাওয়ার অধিক উপযুক্ত। আজ যা আমাদের উপর ঘটছে, তা আমাদেরই দুই হাতের কামাই। আজ আমাদের উপর যা আযাব ও গযব বর্ষিত হচ্ছে তার কারণ একটাই। নবীওয়ালা দ্বীন আর সাহাবাওয়ালা যিন্দেগী আমাদের মাঝে না থাকা, দ্বীন ইসলামের রূহ আমাদের মাঝে না থাকা। আমাদের মন্দ আমলের কারণেই আজ আমাদের উপর আযাব নেমে এসেছে!!!

ব্যথার ঔষধ

যাই হোক, এখন আপনাদের সামনে এমন কিছু বিষয় তুলে ধরবো, যেগুলো মুমিনের হারানো সম্পদ। যেগুলোর আলোচনা ও চর্চা উম্মতের সাধারণ ও বিশেষ সকল শ্রেণির মাঝখান থেকে উঠে গেছে। অথচ এই ইল্‌ম্ই আসল ইল্‌ম, এই ঈমানী জযবাই আসল ঈমান, যা সাহাবায়ে কেরাম রদিয়াল্লহু আনহুম আযমাঈনগণ কালেমা পড়ে ঈমান আনার পর সর্বাগ্রে হাছিল করতেন।

সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লহু আনহুম আযমাঈনদের মাঝে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো থাকার কারণে অন্য সকল উম্মত থেকে তাঁরা ছিলেন আলাদা এবং অতি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। ***‘ইসলামের রূহ’*** বলতে মূলত এই গুণগুলোকেই বুঝায়।

গুণগুলো হলোঃ

১. আল্লাহ, তাঁর রাসূলকে এবং তাঁর রাহে জিহাদ করাকে সর্বাধিক মহব্বত করা
২. আল্লাহ তাআলার পর অন্য কাউকে ভয় বা তোয়াক্কা না করা
৩. দুনিয়ার শেষ অংশটুকুও আল্লাহ তাআলার জন্য ত্যাগ করা
৪. মৃত্যুকে কোনো অবস্থাতেই ভয় না পাওয়া
৫. গুনাহমুক্ত যিন্দেগী গঠন করা
৬. বিশেষ কয়েকটি আমলের বেশি বেশি এহতেমাম করা।

পরবর্তী আলোচনা হতে ইন্‌শাআল্লাহ একথা স্পষ্ট হবে যে, এই গুণগুলো যার মধ্যে পাওয়া যাবে তার যিন্দেগী নিঃসন্দেহে নবীওয়ালা/সাহাবাওয়ালা হবে। বর্তমানে আমাদের সমাজে ছয় নং গুণটিরই কেবল এহতেমাম করা হয়। অথচ, প্রথম পাঁচটি গুণই একজন মুসলমানের জন্য আসল গুণ। প্রথম পাঁচটি গুণ যার মধ্যে পাওয়া যাবে, তার জন্য পুরো ইসলামকে শতভাগ মান্য করা একদম সহজ হয়ে যাবে। একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায়, আজ এই গুণগুলোর অভাবেই উম্মত নেতৃত্বহীন, অভিভাবকহীন হয়ে সব জায়গায় কুফ্‌ফারদের মার খাচ্ছে, তাদের যুলুম অত্যাচারের শিকার হচ্ছে।

আজ উম্মত কেন অলসতার যিন্দেগী যাপন করছে? আজ উম্মত কেন জিহাদ পরিত্যাগ করেছে? যে উম্মত একসময় সারা বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছে, যে উম্মত একসময় সমস্ত বিজাতীয়দের রাহ্‌বারী করেছে, সে উম্মতকে কেন পিছনে ঠেলে অন্যরা তার জায়গা দখল করে নিয়েছে? একটু চিন্তা করুন, আর কোনো কারণ নেই। এই ছয়টি গুণ যেদিন থেকে উম্মতের মধ্য হতে বিদায় নিয়েছে, সেদিন থেকেই উম্মতের ধ্বংস শুরু হয়েছে। এটিই নবুয়তের যামানার সেই *"অপরিচিত ইসলাম"*, আমরা যাকে ভুলে গিয়েছি, আমরা যে ইসলামের চর্চা বাদ দিয়ে কিছু রুসুম-রেওয়াজী ইসলামের গোলক ধাঁধায় ঘুরপাক খাচ্ছি। যেই ইসলাম সম্পর্কে প্রিয় নবীজী রাসূলুল্লাহ এর একটি বিখ্যাত হাদীস, **"ইসলাম শুরুতে অপরিচিত (গরীব) ছিলো, আবার খুব শীঘ্রই অপরিচিত (গরীব) হয়ে যাবে যেমন শুরুতে ছিলো। সে সময় সুসংবাদ তাদের জন্য যারা অপরিচিত (গোরাবা) থাকবে।"** [সহীহ মুসলিম, ১/১৩০ (২৩২)]।

অর্থাৎ শেষ যামানায়ও কিছু মানুষ সেই অপরিচিত ইসলামকে চিনতে পারবে। সেই ইসলামকে আঁকড়ে ধরে রাখবে। সেই নবীওয়ালা এবং সাহাবাওয়ালা যিন্দেগীকে তারা নিজেদের যিন্দেগী বানাবে। আর তাদের জন্যই খোশখবরী!

আমি এ গুণগুলোকে নাম দিয়েছি 'নবুয়তের যামানার ছয় নম্বর বা ছয় ছীফত', মেহনত করে যেই গুণগুলোকে হাছিল করতে পারলে পরিপূর্ণ নবুয়তী যিন্দেগী বা সাহাবাওয়ালা যিন্দেগী হাছিল করা সহজ হবে।

যে মুমিনের মাঝে এই ছয়টি গুণ পাওয়া যাবে, সে দুনিয়ার তাবৎ কুফুরি শক্তির জন্য এক মহা আযাব এবং ভয়াবহ যমদূত হিসেবে আবির্ভূত হবে, সন্দেহ নেই। এই ছয়টি গুণ যার মধ্যে আছে, তার কাছে বাতিলের সমস্ত সামরিক ও আণবিক শক্তি মশা বা মাছির ডানার মতো মনে হবে। যার মধ্যে এই গুণগুলো নেই এমন মুসলমান দ্বারা যদি আসমান যমীন ভরেও যায়, তবুও ত্বগুতের মসনদ এতটুকুও নড়বে-চড়বে না। অন্যদিকে পৃথিবীর কোনো এক প্রান্তে যদি এমন একজন মুসলমানও পাওয়া যায় যার মাঝে এই ছয়টি গুণ আছে, সারা দুনিয়ার ত্বগুতী শক্তির ঘুম হারাম হয়ে যাবে, তাকে পাওয়ার জন্য, তাকে খুঁজে বের করার জন্য বা তাকে হত্যা করার জন্য হাজারো মুমিনকে বন্দী করবে, আরো লাখো মুসলিমের রক্ত ঝরাবে।

ওহে মুসলিম জাতি! তোমাদের চিন্তার কোনোই কারণ নেই। তোমরা শুধু একটু মেহনত করে এই গুণগুলোকে হাসিল কর। আল্লাহ তাআলার সাহায্য অতি নিকটবর্তী। আল্লাহ তাআলা আবারো তোমাদের হাতে দুনিয়ার নেতৃত্ব ও খিলাফত তুলে দিবেন। অপমান ও লাঞ্ছনার যিন্দেগী হতে তিনি তোমাদেরকে মুক্ত করবেন। কুফ্‌ফারদেরকে তোমাদের কদম-দাস বানাবেন। তোমাদের হাতে সারা দুনিয়ার বাতিলকে মিটিয়ে দিবেন। তাই দ্রুত কদম দাও। আগে বাড়। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে তাঁর দ্বীনের জন্য কবুল করুন। আমীন।

প্রথম গুণ

আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করাকে সর্বাধিক মহব্বত করা

০১. আল্লাহ, তাঁর রাসূল ﷺ ও তাঁর রাহে জিহাদ করাকে সর্বাধিক মহব্বত করা

কুরআন কারীমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, آمِنُواْ كَمَآ آمَنَ ٱلنَّاسُ অর্থাৎ "তোমরা সাহাবায়ে কেরামের মত ঈমান আন।" (২ সূরা বাকারা: ১৩)। একই সূরার আরেক জায়গায় আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, فَإِنْ آمَنُواْ بِمِثْلِ مَآ آمَنتُم بِهِ فَقَدِ ٱهْتَدَواْ অর্থাৎ "এরা (মানুষেরা) যদি তোমাদের (সাহাবাদের) মত ঈমান আনত, তাহলে তারা অবশ্যই সঠিক পথ পেতো।"(২ সূরা বাকারা: ১৩৭)। অন্যদিকে সাহাবায়ে কেরামও বলতেন, "আমরা আমাদের নবীজী ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তাই আমরা কুরআন শিখার আগে ঈমান শিখেছি। তারপর আমরা কুরআন শিখেছি। আর এভাবে আমাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।" এই আলোচনা হতে কয়েকটি প্রশ্নের উদ্ভব হয়, যথা-

- ক. ঈমান কী?
- খ. আমাদের ঈমান কতটুকু হলে আমরা বুঝব যে, আমাদের ঈমান সাহাবাদের ঈমানের স্ট্যান্ডার্ডের হয়েছে?
- গ. 'কুরআন' মানেই ঈমানের গ্রন্থ, কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম কুরআন শিখার আগে কোন্ ঈমান শিখেছেন?
- ঘ. কুরআন তিলাওয়াতের দ্বারা ঈমান বৃদ্ধি পায়, সন্দেহ নেই। কিন্তু কুরআনের দ্বারা ঈমান বৃদ্ধি পাওয়ার পূর্বশর্ত হিসেবে আমাদের কোন্ ঈমান হাসিল করতে হবে বা কতটুকু ঈমান হাসিল করতে

হবে, যা থাকলে কুরআন তিলাওয়াত আমার জন্য উপকারী হবে, ঈমান বৃদ্ধির কারণ হবে?

এবার চলুন প্রশ্নগুলোর উত্তরে যাওয়া যাক।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর:

ঈমান কী? ঈমান একটি ব্যাপক বিষয়। ঈমানের ৭৭টি শাখা রয়েছে। ঈমান মূলত এই ৭৭ টি শাখার সম্মিলিত রূপ। এগুলোর মাঝে ৩০টি কাজ এমন রয়েছে যা দীল দ্বারা সম্পন্ন হয়, ০৭ টি কাজ জবান দ্বারা সম্পন্ন হয় এবং ৪০টি কাজ এমন রয়েছে যা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা সম্পন্ন হয়। এগুলো সম্পর্কে আকাঈদের কিতাবসমূহে বিস্তারিত পাওয়া যাবে। যে মুমিন ৭৭টি কাজ সমাধা করবে সে পরিপূর্ণ ঈমানদার। আর যার মাঝে যতগুলো শাখা অনুপস্থিত সে তুলনামূলক তত দুর্বল ঈমানদার। সাহাবায়ে কেরামের মাঝে ৭৭ টি শাখাই পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল।

বাকী (খ-ঘ) সবগুলো প্রশ্নের উত্তর:

কালেমা পড়ে মুসলমান হওয়ার পর, সাহাবায়ে কেরাম কুরআন শিখার আগে যে ঈমান শিখেছেন, তা ঈমানের ৭৭টি শাখার মধ্যে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখাসমূহ, সেগুলো হলো-

ক. আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি মহব্বত করা

খ. আল্লাহ তাআলার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সবচেয়ে বেশি মহব্বত করা

গ. আল্লাহ তাআলাকে সবচেয়ে বেশি ভয় করা। আল্লাহ তাআলার পর অন্য কাউকে বা অন্য কিছুকে ভয় বা তোয়াক্কা না করা।

ঘ. মৃত্যুকে ভয় না পাওয়া, বরং মৃত্যুকে ভালোবাসতে শিখা। আখিরাতের স্মরণ দীলের মাঝে পয়দা করা।

ঙ. আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করাকে ভালোবাসা।

চ. দুনিয়াত্যাগী (যুহদ) যিন্দেগী গঠন করা।

অন্যান্য উম্মতের উপর সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্ব মূলত দুই কারণে,

ক. তাঁরা দুনিয়াকে পুরোপুরি ছাড়তে পেরেছিলেন

খ. তাঁদের অন্তরে আখিরাতের স্মরণ সর্বদা জাগরুক থাকতো

উপর্যুক্ত ছিফতগুলো অর্জিত হয়ে গেলে ঈমানের বাকি সকল শাখা এবং আমলসমূহ করা একদম সহজ হয়ে যায়।

এক কথায় সাহাবায়ে কেরাম কলেমা পড়ে ঈমান আনার পর, নবীজী ﷺ-কে দেখে দেখে নবীওয়ালা যিন্দেগী কিভাবে গড়তে হবে তা শিক্ষা করেছেন। সর্বপ্রথম নবীওয়ালা মেজাজ গড়েছেন। এরপর তারা কুরআন শিখেছেন, ইলম হাছিল করেছেন। এই ইলম তখন তাঁদের আরো উন্নতি সাধন করেছে। আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ করাকে সহজ করেছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহব্বতকে আরো বৃদ্ধি করেছে।

যাইহোক, একবার নবীজী ﷺ হযরত উমর রাযিয়াল্লহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করলেন, উমর! তুমি আমাকে কেমন ভালোবাস? হযরত উমর রাযিয়াল্লহু আনহু জবাব দিলেন, ‘আমি আপনাকে সবার চেয়ে ভালোবাসি, তবে নিজের চেয়ে নয়।’‘উহু হলো না, তুমি এখনো প্রকৃত মুমিন হতে পারোনি।’ এরপর উমর রাযিয়াল্লহু আনহু সময় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে জওয়াব দিলেন, ‘আমি আপনাকে আমার জীবনের চেয়েও বেশি

ভালোবাসি।' তখন নবীজী ﷺ বললেন, উমর, এইবার (ঠিক আছে, তুমি প্রকৃত অর্থে মুমিন হলে।)!

নবীজী ﷺ ইরশাদ করেন,"মানুষ যে পর্যন্ত আল্লাহ ও রাসূলকে অপরাপর সকল কিছু থেকে অধিক ভালোবাসতে না পারবে, সে পর্যন্ত তার ঈমান দৃঢ় হবে না।"

তিনি আরো ইরশাদ করেন,"আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সব থেকে বেশি ভালোবাসার নামই হচ্ছে ঈমান।"

সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লহু আনহুমদের দীলের মাঝে আল্লাহ ও তাঁর হাবীবের মহব্বত এই পরিমাণ ছিল যে, তাঁরা নিজের সমস্ত কিছুর চেয়ে এমনকি নিজের জীবনের চেয়েও লক্ষ কোটি গুণ মহব্বত করতেন, নিজের স্ত্রী-সন্তানসন্ততি, দুনিয়ার ভোগ বিলাস এগুলোতো বহু দূরের কথা!

একবার এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, হুযুর! কিয়ামত কবে হবে? নবীজী ﷺ বললেন, কিয়ামতের জন্য তুমি কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ যে কিয়ামতের জন্য তাড়াহুড়া করছ? ঐ সাহাবী রাযিয়াল্লহু আনহু বললেন, আমিতো (নফল) নামায-রোযা তেমন কিছু করি নাই, তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি। তখন নবীজী ﷺ ইরশাদ করেন, 'তাহলে তুমি কিয়ামতের দিন তার সাথেই থাকবে, যাকে তুমি সবচেয়ে বেশি মহব্বত করবে।'

একথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম যেই পরিমান খুশি হয়েছিলেন, অন্য কোনো হাদীস শুনে তারা এতটা খুশী হননি। কেননা তাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে এতটাই মহব্বত করতেন যে, তাঁরা আল্লাহর রাসূল ﷺ -কে এক মুহূর্ত না দেখলে অস্থির হয়ে যেতেন, তাঁদের কাছে সবচেয়ে দামী আমল

ছিল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহব্বত। ক্ষুধার্ত অবস্থায় সাক্ষাৎ করলে মহব্বতের আতিশয্যে তাদের ক্ষুধা নিবারিত হয়ে যেত। এত মহব্বতের কারণে তাঁদের মাঝে একটি ভয় কাজ করছিল। নবীজী ﷺ-তো জান্নাতের সর্বোচ্চ মাকামে থাকবেন। অন্যদিকে কোনো উম্মততো এই মাকাম হাসিল করতে পারবে না। তার মানে, মৃত্যুর পর কি আর আমরা আল্লাহর হাবীবের ﷺ সাহচর্যে থাকতে পারবো না? এখনতো যখন ইচ্ছা হয় দৌঁড়ে দরবারে নববীতে চলে যেতে পারি! হায়, মৃত্যুর পর এই বিচ্ছেদ আমরা কিভাবে সইব? তাই যখন তাঁরা শুনলেন, যার সাথে সবচেয়ে বেশি মহব্বত রাখা হবে, তার সাথেই হাশরের ময়দানে ও জান্নাতে অবস্থান হবে, তখন সাহাবায়ে কেরামের মাঝে যেন নতুন জীবন ফিরে এলো। কেননা তাঁরা জানতেন, আল্লাহ ও তার হাবীবের তুলনায় অধিক মহব্বত তাঁরা অন্য কোনো কিছুকে বা কাউকেই করতেন না। সুতরাং মৃত্যুর পর আল্লাহ ও তাঁর হাবীবই হবেন আমাদের চিরসঙ্গী! যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে মহব্বত করতে শিখবে, তাঁর দিলে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই আল্লাহর পরিচয়, মহব্বত এবং ভয় পয়দা হবে। আর আল্লাহ ﷻ ও তার হাবীবের ﷺ মহব্বত দীলের মাঝে উৎপন্ন হওয়ার একইসাথে কারণ ও ফলাফল হলো- "আল্লাহর রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য তথা সুন্নতের পরিপূর্ণ অনুসরণ, আল্লাহর রাসূলের যিন্দেগীকে সামনে রেখে আগে বাড়া, গুনাহমুক্ত হয়ে আল্লাহর হুকুমের সামনে নিজেকে সপে দেয়া এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মারেফাত তথা পরিচয় লাভ করা।"

হযরত ইমাম গায্যালি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, অন্তরে আল্লাহ তাআলার মহব্বত বৃদ্ধির উপায় তিনটি:

১. দুনিয়াকে ছাড়া তথা, দুনিয়ার মহব্বত দীল হতে বের করা।
২. আল্লাহ তাআলার গুণাবলি নিয়ে বেশি বেশি চিন্তা করা।
৩. ইবাদত বন্দেগী যেমন: নামায, তিলাওয়াত ও যিকির ইত্যাদি বেশি বেশি করা। (কিমিয়ায়ে সাআদাত, খ. ৪, পৃ. ৩৭৫)

প্রিয় নবীজী ﷺ-এর মহব্বত দীলের মাঝে উৎপন্ন হওয়ার উপায়ও মূলত তিনটি:

১. বেশি বেশি সীরাত পাঠ করা
২. বেশি বেশি দরূদ শরীফ পড়া
৩. বেশি বেশি সুন্নতের অনুসরণ করা

সাহাবায়ে কেরামের মাঝে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মারেফাত ও মহব্বত এবং আল্লাহর ভয় যেরকম থাকার দরকার ছিল সেরকমই ছিল বিধায়, তাঁদের ছোট্ট একটি আমলের ওজন আমাদের যিন্দেগীর সকল বড় বড় আমলগুলোকে একত্র করলেও তার চেয়ে বেশি হবে।

এখন প্রশ্ন হলো, আমার হৃদয়ে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলের মহব্বত সকল কিছুর চেয়ে বেশি, এমনকি নিজের জীবনের চেয়েও বেশি আছে কিনা বুঝব কিভাবে? এর জন্য কোনো মাপকাঠি আছে কি? আমি অনেক আমল করতে পারি, সারারাত তাহাজ্জুদ, সারা বছর রোযা রাখতে পারি, আমি অনেক বড় আবেদ বা আলেম, এটাই কি মহব্বত বেশি

হওয়ার আলামত? এটাই কি আল্লাহর ভয় থাকা, প্রকৃত মুত্তাকী হওয়ার দলীল?

না, কক্ষনো নয়।

“নিজের জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাসার” অর্থই হচ্ছে “আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ যখনই আমার জীবন চাইবেন, তখনই আমি আমার জীবন দিতে প্রস্তুত আছি।” সুতরাং এই ভালোবাসা প্রমাণের একমাত্র মাপকাঠি হচ্ছে, “আমি আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাসূলের ﷺ জন্য এখনি এই মুহূর্তে জীবন দিতে তৈয়ার আছি কিনা। আল্লাহ ﷻ ও তাঁর হাবীবের ﷺ দরবারে আমার জীবনকে কুরবানি করতে সর্বদা প্রস্তুত আছি কিনা। আমার দেহের লোমকূপ সংখ্যক যদি জীবন থাকত, তার সবগুলোকেই আল্লাহ ﷻ, তাঁর রাসূল ﷺ ও তাঁর দ্বীন কায়েমের জন্য আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দিতে পরিপূর্ণ প্রস্তুত কিনা। আমার মাঝে আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যু তথা শাহাদাতের সত্য তামান্না আছে কিনা। আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাসূলের জন্য এই মুহূর্তে আমার আপনজন, দুনিয়া ও দুনিয়ার সব কিছু ছাড়তে রাজী আছি কিনা। ঘরে আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে রেখে আমার সবকিছু আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করতে প্রস্তুত আছি কিনা। জিহাদের জন্য আমি সত্যিকার অর্থে প্রস্তুতি নিচ্ছি কিনা। ‘কাবার রবের কসম! যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার দেহের রক্ত আল্লাহর জন্য প্রবাহিত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি সফল হবনা।’ ‘দ্বীন মিটে যাবে আর আমি জীবিত থাকব, তা হবে না!’ এ ধরনের মানসিকতা আমার মাঝে আছে কিনা”।

যদি আমার মাঝে এ মানসিকতা ও এসব প্রস্তুতি না থাকে, তাহলে আমি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সবচেয়ে বেশি মহব্বতকারী

নই। আচ্ছা! আপনিই বলুন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে আমার জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাসি, কিন্তু তাদের জন্য জীবন দিতে পারবো না।" একথাটি কতটুকু যুক্তিসঙ্গত? জীবনই যদি না দিতে পারি তাহলে জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাসা হলো কী করে? এই ভালোবাসার অর্থ কী? তাই- আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ব্যতীত খোদাপ্রেম কিংবা নবীপ্রেম প্রকাশের আর কোনো চূড়ান্ত জায়গা নেই। প্রেমের এই চূড়ান্ত পরীক্ষা পাশ না করা পর্যন্ত প্রকৃত আশেকের সার্টিফিকেট মিলবে না, কস্মিনকালেও না।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

"বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা (ক্ষতি বা) বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর, এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ কর- ***আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা*** থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত (দেখ, তোমাদের পরিণতি কি হতে যাচ্ছে), আর আল্লাহ তাআলা ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।" (০৯ সূরা তাওবাহ: ২৪)

আল্লাহ তাআলাকে কেন সবচেয়ে বেশি ভালোবাসব না!!!

আল্লাহ তাআলা আমাদের পরম বন্ধু, আমাদের মাওলা, আমাদের অভিভাবক দুনিয়া ও আখিরাতে। তিনিই আমাদের রব, আমাদের প্রতিপালক।

তিনি তো এমন এক সত্ত্বা, যার স্তুতগীতি লিখতে গিয়ে সমুদ্রের কালি শেষ হয়ে গিয়েছে, তবুও তার স্তুতি-গান লিখা শেষ হয়নি।

তাঁর প্রশংসা করতে গিয়ে আকল ও বুদ্ধি হয়রান হয়ে গিয়েছে, কোনো কূল-কিনারা পায়নি।

তাঁর মাহাত্ম্য ভাবতে গিয়ে জ্ঞানীরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে, কোনো সীমা-পরিসীমা পায়নি।

অনন্তকাল যাবৎ যদি তাঁর প্রশংসা করা হয়, তবুও তা হবে তাঁর শানে নিতান্তই অপ্রতুল, নেহায়েত কম।

একসমুদ্র নয়, সাতসমুদ্রের নীর হতে এক ফোটা পানি তুললে তার উপমা যেমন হবে, অনাদি কাল হতে আরশের অধিপতির যত প্রশংসা করা হয়েছে, তার সমুদয়কে একত্রিত করলেও সেই মহান প্রভুর শানের সামনে তার তুলনা ততটুকুও হবে না।

কে আছে, তাঁর শাহানশাহী অনুপাতে স্তবক রচনা করবে, কে আছে তাঁর বাদশাহী অনুপাতে তাঁর গোলামী করবে? কে আছে তাঁর নেয়ামতসমূহ গণনা করবে? কে আছে তাঁর দয়া ও উদারতা পরিমাপ করবে? কে আছে তাঁর ক্ষমতা ও প্রতাপ উপলব্ধি করবে?

এমন কেউ আছে কি, তাঁকে ভালোবেসে কোনোদিন শেষ করতে পারবে? তাঁর প্রেমের অকুল দরিয়ার গভীরতা পরিমাপ করবে, এমন কে আছে?

তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকুল যতবার তাঁর নাম জপেছে, যতবার তাঁকে সিজদা করেছে, যতবার তাঁর হাম্‌দ গেয়েছে, যতবার তাঁর সামনে আপনাকে মিটিয়েছে, সকলে মিলে যতই তার বড়ত্ব বয়ান করেছে, আর সম্মিলিতভাবে এগুলো তাঁর অসীম মর্যাদায়, তাঁর অসীম রাজত্বে, তাঁর অসীম প্রভুত্বে, তাঁর সীমাহীন কুদরতে বিন্দুমাত্র কোনো বৃদ্ধি করেছে কি?

আবার দেখ! আসমান-যমীনে যত অকৃতজ্ঞ ও অবাধ্য শয়তান, জীন ও ইনসান বিচরণ করছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত করবে, তারা সকলে যত নাফরমানী করেছে এবং করবে, পরম মহিমাময় প্রভুর বিরোধিতা করছে এবং করবে, তাতে কী হয়েছে? আল্লাহ তাআলার অসীম রাজত্বে কিছুটা কম হয়েছে কী?

তিনিই আমাদের আল্লাহ, এক, অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়। তাঁর রাজত্ব, ক্ষমতা কিংবা অস্তিত্বে কোনো প্রকার শরীক বা অংশীদার বা অংশ নেই। তাঁর কোনো অভাব নেই। তিনিই কি সকলের অভাব পূরণকারী নন?

তিনি কারও পিতা নন, পুত্রও নন, তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

একমাত্র তিনিই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও পালনকর্তা।

কোনো জ্ঞান বা চক্ষু আল্লাহ তা'আলাকে আয়ত্ত করতে পারে না।

তিনি চিরকাল আছেন এবং থাকবেন। তিনি অনাদি ও অনন্ত। তাঁর মতো আর কেউ আছে কি?

তিনিই আমাদের মাওলা, আল্লাহ তাআলা, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ বা উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র ইবাদত পাওয়ার যোগ্য। তারা আল্লাহ তাআলার সাথে যা শরীক করে, আমাদের রব তা হতে অকল্পনীয়রূপে পবিত্র, তাঁর শান অতি উচ্চে। আল্লাহ তাআলা কি তাদের অন্তরের খবরও রাখেন না? সৃষ্টজীবের সাথে তাঁর কোনো তুলনা চলে কি?

তিনি সকল কিছু দেখেন, সকল কিছু শুনেন, সকল কিছু জানেন। তাঁর সকল সৃষ্টির খবর তিনি একবারে রাখেন, সকলের কথা, মনের ব্যথা তিনি একবারে শুনেন, সকলের ভাষা তিনি একবারে বুঝেন, বরং সকলকে তিনিই ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন।

তিনিই আমাদের মাওলা, আল্লাহ তাআলা, তিনি সব দোষ-ত্রুটি হতে পবিত্র। তাঁর মাঝে আদৌ কোনো রকমের দোষ-ত্রুটি নেই। তাঁর ক্রিয়া-কর্ম, আদেশ-নিষেধ সবই ভালো ও মঙ্গলময়, কোনো একটিতেও বিন্দুমাত্র অন্যায় বা দোষ নেই। তিনিই বিপদ আপদ দেন, তিনিই বিপদ আপদ হতে উদ্ধার করেন, অন্য কেউ কোনো প্রকার বিপদ আপদ হতে মুক্তি দিতে পারে না। অসুস্থতায় কে আমাদের সুস্থতা দান করেন? তিনি ছাড়া আর কোনো শিফাদান কারী আছে কি? বিপদাপদ দূর করনেওয়ালা আরো কেউ আছে কি?

প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদা তাঁরই। তিনিই সকল সম্মান ও মর্যাদার অধিপতি। তিনিই প্রকৃত মহান। একমাত্র তিনিই নিজেকে নিজে বড় বলতে পারেন। এতদ্ব্যতীত অন্য কারো এ রকম বলার ক্ষমতা ও অধিকার নেই।

তিনিই আমাদের মাওলা, যিনি আসমান যমীনের সকল মাখলূক সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন সর্বোত্তম উপায়ে। তিনি

আমাদেরকে দেখার জন্য চোখ দিয়েছেন, শুনার জন্য কান দিয়েছেন, কথা বলার জন্য স্বরতন্ত্র দিয়েছেন, স্বাদ নেয়ার জন্য জিহ্বা দিয়েছেন, ঘ্রাণ নেয়ার জন্য নাক দিয়েছেন, ধরা ও লিখার জন্য হাত ও আঙ্গুলি দিয়েছেন, চলার জন্য পা দিয়েছেন, স্পর্শ বা ব্যথা অনুভূতির জন্য ত্বক দিয়েছেন, খাদ্য গ্রহণ, হজম ইত্যাদি কাজের জন্য পৌষ্টিকতন্ত্র (মুখ, খাদ্যনালী, পাকস্থলি, নাড়ি-ভূড়ি, যকৃত, অগ্ন্যাশয় ইত্যাদি) দিয়েছেন, শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য শ্বসনতন্ত্র (নাক, শ্বাসনালী, ফুসফুস ইত্যাদি) দিয়েছেন, খাদ্যের পুষ্টিকণা শোষণ, বিভিন্ন প্রাণরস ও বাতাস থেকে অক্সিজেন শরীরের প্রতিটি কোষে পৌঁছানোর কাজে রক্ত পরিবহনতন্ত্র (হৃদপিণ্ড, রক্তনালী ইত্যাদি) দিয়েছেন, শরীর থেকে ক্ষতিকর পদার্থ বের করে দেয়ার জন্য রেচনতন্ত্র (কিডনী, মূত্রনালি, মূত্রথলি ইত্যাদি) দিয়েছেন, চলাচল করার জন্য শরীরের কাঠামো ঠিক রাখতে তিনি আমাদেরকে কঙ্কালতন্ত্র (২০৬ টি অস্থি, তরুণাস্থি, মাংসপেশী ইত্যাদি) দিয়েছেন এবং এগুলোকে সবল করেছেন, সারা দেহের সকল কার্যক্রমকে বিদ্যুতের গতিতে নিয়ন্ত্রণ করতে আল্লাহ তাআলা স্নায়ুতন্ত্র (মস্তিষ্ক, মেরুরজ্জু, স্নায়ু ইত্যাদি) দিয়েছেন, এগুলোর কিছু অংশ আমাদের ইচ্ছাধীন, অধিকাংশই আমাদের ইচ্ছায় চলে না, যেমন আমরা ইচ্ছা করলে হাত-পা নাড়াতে পারি, কথা বলতে পারি, কিন্তু আমরা ইচ্ছা করলে আমাদের হৃদপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ করতে বা চালু করতে পারিনা। চিন্তা করার জন্য, সুখ, দুঃখ, ভালোবাসা, দয়া ইত্যাদি আবেগ-অনুভূতির জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অন্তর (কল্‌ব) দিয়েছেন, মুমিনের কল্‌বকে তিনি তাঁর আরশ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, এছাড়াও আমাদেরকে দিয়েছেন রূহ (আত্মা), নফস (প্রবৃত্তি) ইত্যাদি। মানবজাতির ধারা ঠিক রাখার জন্য তিনি প্রজননতন্ত্র দিয়েছেন,

আশ্চর্য উপায়ে তিনি এক ফোঁটা শুক্রবিন্দু থেকে নর-নারী রূপে মানুষ সৃষ্টি করেন। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মহব্বত সৃষ্টি করেছেন। পারিবারিক বন্ধন সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এভাবে আল্লাহ তাআলাই আমাদেরকে অসংখ্য অগণিত নিয়ামত দিয়েছেন, যা বলে বা হিসেব করে কোনোদিন আমরা শেষ করতে পারবো না।

তিনিই আমাদের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী, আল্লাহ তাআলা! তিনিই আমাদের জন্য জমিনকে বিছানা স্বরূপ বানিয়েছেন, তাতে রাস্তাঘাট বানিয়েছেন, যান-বাহন বানিয়েছেন, রঙ-বেরঙের গাছপালা, ঘাস, লতাপাতা সৃষ্টি করেছেন, জীব-জন্তু, পোকা-মাকড়, ইতরপ্রাণি বানিয়েছেন, তাদেরকে তাদের জীবনপদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন, রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি জমিনে আমাদের জন্য রিযিক উৎপন্ন করেন, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, বীজ হতে অঙ্কুরোদগম করেন, সুপেয় পানি দান করেছেন। তিনি ইচ্ছা করলেই তাকে তিক্ত/লবণাক্ত করতে পারতেন কিংবা মাটির নিচের পানির স্তরকে আরো গভীরে নিয়ে যেতে পারতেন, তখন আমরা পানযোগ্য পানি পেতাম না।

তিনিই সাগর-মহাসাগর, তাতে বাহারী সামুদ্রিক জীব-জন্তু, শামুক, ঝিনুক, মাছ, গাছ, লবণাক্ত পানি সৃষ্টি করেছেন। তাতে বিচরণশীল পর্বতসদৃশ জাহাজসমূহ তাঁরই নিয়ন্ত্রানাধীন। আল্লাহ তাআলা পানির এমন ধর্ম দিয়েছেন যে, ৪° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় পানি সবচেয়ে ঘন ও ভারী থাকে, সমুদ্রের নীচের পানি এর চেয়ে ঠান্ডা হলে হালকা হয়ে উপরে উঠে যায়, সমুদ্রের তলদেশে বরফ তৈরি হতে পারে না। তাছাড়া বরফ পানিতে ভাসে,

তাই শীত প্রধান দেশগুলোতে সমুদ্রের নীচে পানি থাকে, উপরে থাকে বরফ। ফলে সেখানকার সামুদ্রিক মাখলূকগুলো বেঁচে থাকতে পারে।

তিনিই বাতাস ও বায়ুমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। বাতাসে অক্সিজেন না দিলে আমরা শ্বাস নিতে পারতাম না, ফলে মৃত্যু অবধারিত ছিল। বাতাসে নাইট্রোজেন না দিলে, কোথাও আগুন লাগলে তা কখনোই নিভতো না, সব পুড়ে ছাই হয়ে যেতো। গাছ পালা বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ না করলে তার পরিমাণ বাতাসে বেড়ে যেত। ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যেত, মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যেত, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেত, স্থলভূমি সাগরের তলায় নিমজ্জিত হয়ে যেত।

তিনিই আমাদের মাওলা, আল্লাহ তাআলা, তিনিই মহাবিস্ফোরণ (বিগব্যাঙ) ঘটিয়ে তাঁর ইচ্ছামতো মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, তিনিই মহাবিশ্বকে সম্প্রসারিত করছেন। তিনি আকাশে নক্ষত্ররাজি সৃষ্টি করেছেন, আরো সৃষ্টি করেছেন গ্রহ-উপগ্রহ, নেবুলা, গ্যালাক্সি, ব্ল্যাক-হোল। তাদের প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ তাআলা নির্দিষ্ট গতিপথ তথা কক্ষপথ নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যার হের ফের তারা কখনো করে না। তিনি আমাদের জন্য চাঁদ-সূর্য সৃষ্টি করেছেন। দিন-রাত্রির আবর্তন তাঁর অসীম কুদরতের দৃষ্টান্ত। সূর্য পৃথিবীর তুলনায় তের লক্ষ গুণ বড় এবং প্রতিদিন সূর্যের আলো ও তাপের দুইশত কোটি ভাগের মাত্র এক ভাগ পৃথিবীতে এসে পৌঁছে। চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ-এগুলোও আল্লাহ তাআলার নিদর্শন। সমগ্র সৃষ্টিজগতই তাঁর নিদর্শন, তাঁর নামের তাসবীহ জপে, তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে, কিন্তু আমরা তা অনুধাবন করতে পারি না। কত নিখুঁত স্রষ্টা তিনি!

চারদিকে দৃষ্টি দাও! রহমানের সৃষ্টিতে কোনো খুঁত বা ত্রুটি পাও কি? তোমার দৃষ্টি তোমার দিকেই ফিরে আসবে ব্যর্থ, ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে!!!

তিনিই জান্নাত, জাহান্নাম, আরশ, কুরসীর মালিক। মহাবিশ্বের মহান অধিপতি, মহা রাজাধিরাজ, তিনিই আমাদের মাওলা, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

তিনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী। তাঁর প্রভাব ও প্রভুত্ব সকলের ওপর; তাঁর ওপর কারো প্রভাব বা প্রভুত্ব চলে না।

তিনি বড়ই দাতা। সমস্ত জীবের ও যাবতীয় চেতন-অচেতন পদার্থের আহার তিনি দান করেন। তিনিই রুযীর মালিক। রুযী কমানো-বাড়ানো তাঁরই হাতে। তিনি যার রুযী কমাতে ইচ্ছা করেন, তার রুযী কম করে দেন। যার রুযী বাড়াতে ইচ্ছা করেন, বাড়িয়ে দেন। তিনি যদি আমাদের রিযিক প্রদান করা বন্ধ করে দেন, তাহলে তিনি ছাড়া কে আছে যে আমাদেরকে রিযিক পৌঁছাবে?

তিনিই আমাদের পরওয়ারদেগার, আল্লাহ তাআলা, তিনি ন্যায়পরায়ণ, তাঁর কোনো কাজেই অন্যায় বা অত্যাচারের লেশমাত্র নেই। তিনি বড়ই সহিষ্ণু, অনেক কিছু সহ্য করেন। কত পাপিষ্ঠ তাঁর নাফরমানী করছে, তাঁর ওপর কত রকম দোষারোপ এবং তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে, এমনকি তাঁর একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলামকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে, তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছে , তবুও তিনি এই অভাগাদের রিযিক বন্ধ করছেন না।

তিনি এমনই মেহেরবান ও দয়ালু যে, তাঁর নিকট দু’আ করলে তিনি তা মঞ্জুর করেন। তাঁর ভাণ্ডারে কোনো কিছুরই অভাব নেই, তিনি অভাবমুক্ত, তাঁর রহমতের ভান্ডার অপরিসীম। যদি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষ ও জ্বীন খোলা এক ময়দানে একত্রিত হয়ে আল্লাহ তাআলা-র কাছে চায়, আর তিনি প্রত্যেককে তার চাহিদা অনুপাতে দান করেন, তবুও তাঁর ভান্ডারসমূহে এই পরিমান কম হবে না যে পরিমাণ সমুদ্রে সুঁই ডুবিয়ে উঠালে পানি কম হয়ে যায়।

তিনি এমন দয়ালু যে, দয়া করে অনেকের গুণাহ তিনি মাফ করে দেন। তিনি ক্ষমাশীল। মানুষ পাপ করে যদি খাঁটিভাবে তাওবা করে, তবে তিনি তা কবুল করেন। যে শাস্তির উপযুক্ত, তাকে তিনি শাস্তি দেন। যাকে ইচ্ছা তাকে মাফ করে দেন। তিনিই হিদায়াত দেন। তিনি কখনো কোনো কিছু ভুলে যান না। মৃত্যুর পর সকলকে তাদের কৃত আমল সম্পর্কে তিনি অবহিত করবেন।

তিনিই আমাদের প্রভু, আল্লাহ তাআলা, তিনি এমনই গুণগ্রাহী এবং উদার যে, তাঁর আদৌ কোনো প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও মানুষ তাঁর ইবাদত-বন্দেগী করলে এবং তাঁর আদেশ পালন করলে, তিনি তার বড়ই কদর করেন এবং সন্তুষ্ট হয়ে আশাতীতরূপে পুরস্কার দান করেন। আমাদের জন্য তিনি অনন্তকাল বসবাসের জান্নাত তৈরি করেছেন। হায়! আমরা কত অযোগ্য, কত নাদান, তারপরেও তিনি মুমিনদের ‘নামমাত্র’ চেষ্টার বদলে এত বিশাল বিশাল নেয়ামত দান করবেন। তাঁর চেয়ে বড় দাতা ও দয়ালু আরো কেউ আছে কি?

তিনিই বিধানদাতা। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিধান দেওয়ার ক্ষমতা ও এখতিয়ার একমাত্র ও কেবলমাত্র তাঁরই। যে বা যারা তাঁর বিধান অনুযায়ী বিধান দেয় না, তাদেরকে তিনি কাফের, মুনাফেক ও ফাসেক আখ্যায়িত করেছেন।

তিনি জীবন দান করেন, ধন-সম্পদ দান করেন, বিদ্যা-বুদ্ধি দান করেন। এগুলোর কোনোটাই আমাদের নিজস্ব ক্ষমতা ও মেধায় অর্জিত নয়। বরং আমাদের মেধা ও ক্ষমতার সবটুকু তাঁরই দান।

তিনিই সব কর্ম সমাধানকারী। বান্দা চেষ্টা করবে, কিন্তু সেই কর্ম সমাধানের ভার তাঁরই কুদরতী হাতে ন্যস্ত।

তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং কিয়ামতের দিন পুনর্বার সকলকে জীবিত করবেন। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দেন। কে কখন মৃত্যুবরণ করবে এবং কি অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে তা কেবল তিনিই জানেন।

তিনিই আমাদের পরম বন্ধু, আল্লাহ তাআলা, তিনি আমাদেরকে পথ দেখাতে কুরআন কারীম নাযিল করেছেন। জীবন বিধান ইসলাম দিয়েছেন। এমন কেউ কি আছে, কুরআনের অনুরূপ কোনো গ্রন্থ রচনা করতে পারবে? না, না, একটি সূরা কি কেউ রচনা করে দেখাতে পারবে? হোক না সমগ্র জ্বীনজাতি এবং মানবজাতি একত্রিত, একে অন্যের সহকারী! তবুও তারা পারবে কি? কক্ষনো পারবে না।

তিনিই আমাদের মাওলা, আল্লাহ তাআলা, তাঁর নিদ্রা নেই, ক্লান্তি নেই। সমস্ত বিশ্বজগতের রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানে তিনি বিন্দুমাত্রও ক্লান্ত হন না। তিনিই সমস্ত বিশ্বের রক্ষক, রাজাধিরাজ, একচ্ছত্র মহান অধিপতি।

সৎ ও মহৎ যত গুণ আছে, অনাদিকাল যাবৎ সে সব গুণ আল্লাহ তা'আলার মধ্যে আছে এবং চিরকাল থাকবে। কিন্তু কোনো দোষ-ত্রুটির লেশমাত্রও তাঁর মধ্যে নেই। তাঁর মাহাত্ম্য ও প্রশংসা বর্ণনা করার জন্য যদি পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষকে কলম বানানো হয়, সাত সমুদ্রের সাথে আরো সমুদ্র যোগ করে তার পানিকে যদি কালি বানানো হয়, তবুও তাঁর মাহাত্ম্য ও প্রশংসা বর্ণনা কোনোদিন শেষ হবে না।

বল, তাহলে আমরা কেন তাঁকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসবো না!!!

আমরা যাকে বা যাদেরকে ভালোবাসি তাদের মধ্যে কি এমন কোনো গুণ বিদ্যমান রয়েছে, যা আমাদের মহান রবের মাঝে আছে?

তারা কি অনন্ত, অসীম সৌন্দর্য ও গুণের অধিকারী? তারা কি আল্লাহ তাআলার মতো আমাকে ভালোবাসতে পারবে?

আমাদের কল্যাণ পৌঁছানোর কিংবা ক্ষতি সাধনের ব্যাপারে তাদের কোনো ক্ষমতা আছে কি?

যাদেরকে আমি ভালোবাসি, তাদের সাথে আমার বিচ্ছেদের জন্য মৃত্যুই কি যথেষ্ট নয়? মৃত্যুর পর আমি কার কাছে যাব? কে আমার বন্ধু হবে? কে আমার সাথী হবে? তিনি কি আমার আল্লাহ নন?

কবরের যিন্দেগীতে কে হবে আমার সাথী? হাশরের ময়দানে কে হবে আমার সঙ্গী? আমার প্রিয়জনেরা সেদিন কোথায় থাকবে? তারা কি আমা হতে পালাবে না? সেদিন কে আমাকে মনে রাখবে, আপন করে নিবে? যেদিন সূর্য আমার মাথার উপর থাকবে, সেদিন কে আমাকে আরশের নিচে স্থান দিবে? সেই কঠিন মুসীবতের সময় কে হবে আমার একমাত্র প্রিয়তম? তিনি কি আমার আল্লাহ নন?

পুলসিরাতে কে হবে আমার আপনজন? জান্নাতে কে হবে আমার পরম বন্ধু, রফীকে আ'লা? কে আমাকে জান্নাতুল ফিরদাউসে এমন নিয়ামত দিবেন, যা কোনো চোখ কোনোদিন দেখেনি, কোনো কান কোনোদিন শুনে নি, কোনো অন্তর কোনো দিন চিন্তাও করেনি? কার দীদারের স্বাদ ও মজার সামনে জান্নাতের অপরাপর সকল নেয়ামত ম্লান হয়ে যাবে? যার স্বত্ত্বার দীদারের মতো আনন্দময় ও উপভোগ্য আর কিছুই হতে পারে না?

দুনিয়ার যিন্দেগীতেও তো আল্লাহ তাআলাই আমার সবচেয়ে পরম বন্ধু, কেননা সুখে দুখে আমি তাঁকেই কাছে পাই। তাঁর কাছেই আমার মনের আকুতি জানাই। কে আছে আমার আনন্দ ও গৌরব পরিমাপ করে? আমি তো 'ছুরাইয়া' তারকাও ভেদ করে উঠে যেতে চাই! ওগো আল্লাহ! তুমি যে ডেকেছ "ইয়া ইবাদী" (হে আমার বান্দা!) বলে! আর বানিয়েছো "আহমাদ ﷺ"-কে আমার নবী! আর আমিও যে বলতে পারি "রাব্বানা"(ওগো আমাদের রব!), আর বলি "আমার রাসূল"!

আমার মতো তৃপ্তি কার আছে এ ধরার বুকে! কে আছে আমার মতো এতো সুখী! সুখে-সংকটে যার অনুভব জুড়ে তিনি, যার অন্তরে তাঁর সান্নিধ্যের অনুভূতি তার মতো নির্ভার এই পৃথিবীতে আর কে আছে?

ওহে কাফেরের দল! শুনে রাখ্! আল্লাহ আমাদের মাওলা; কিন্তু তোদের তো কোনো মাওলা নেই!

তোদের কি সেই হৃদয় আছে উপলব্ধি করার- কী আছে, আর কী নেই! যার মাওলা আছে তার তো সব আছে। আমারতো মালিক আছে, অভিভাবক আছে; অশ্রু ফেলার জায়গা আছে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষেত্র আছে। আমার তো এমন একজন আছে যাঁকে নিবেদন করা যায় সর্বোচ্চ ভক্তি, ভালোবাসা ও চূড়ান্ত আনুগত্য। সুখে-দুঃখে যাঁকে সর্বাবস্থায় ডাকা যায়, যাঁর নাম দিবানিশি জপা যায়, যাকে সিজদা করা যায়, যাঁর জন্য জীবনের বাজি লাগানো যায়; অশ্রু ও ঘাম, রক্ত ও প্রাণ বিসর্জন দেয়া যায়। যাকে পাবার জন্য কামান আর বোমার সামনে বুক টান করে দাঁড়ানো যায়। এ যার আছে তার তো সব আছে। আর যার নেই- হায়! তার তো কিছুই নেই। তার তো জীবনজুড়ে এক সর্বব্যাপী শূন্যতার হাহাকার! সে কোথায় যাবে? কার কাছে যাবে? কী করবে? কেন করবে? কেন তার জীবন? আর কেনই বা মৃত্যু? জীবনের অথৈ সাগরে তার অবলম্বনহীন যাত্রা!

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ اَحَبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُّقَرِّبُنِىْ اِلٰى حُبِّكَ وَاجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَيَّ مِنَ الْمَآءِ الْبَارِدِ

"হে আল্লাহ! আপনাকে ভালোবাসার তাওফীক আমাকে দান করুন এবং আপনি যাদেরকে মহব্বত করেন, তাদেরকেও ভালোবাসার তাওফীক দিন। যে বস্তু বা ব্যক্তি আমাকে আপনার মহব্বতের নিকটবর্তী করে দেয়, সে বস্তুর মহব্বত আমাকে দান করুন। আর তৃষ্ণায় সুশীতল পানি অপেক্ষা আপনার মহব্বতকে আমার জন্য অধিক প্রিয় করুন।" (আল্লহুম্মা আমীন।)

অন্তরে আল্লাহ তাআলার মহব্বত বৃদ্ধির উপায় তিনটি:

১. দুনিয়াকে ছাড়া তথা, দুনিয়ার মহব্বত দীল হতে বের করা।
২. আল্লাহ তাআলার গুণাবলি নিয়ে বেশি বেশি চিন্তা করা।
৩. ইবাদত বন্দেগী যেমন: নামায, তিলাওয়াত ও যিকির ইত্যাদি বেশি বেশি করা। (কিমিয়ায়ে সাআদাত, খ. ৪, পৃ. ৩৭৫)

প্রিয় নবীজী ﷺ -কে কেন সবচেয়ে বেশি ভালোবাসব না!!!

- সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তিনি! সর্বোত্তম আখলাকের অধিকারী তিনি! আল্লাহর কাছে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি তিনি!
- হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম-এর অস্তিত্ব যখন মাটি, পানি ও কাদায় নিমগ্ন, তখনো তিনি নবী।
- তুমি তোমার কোনো দিনকে যদি ঈদে পরিণত করতে চাও, তাহলে তা যেন হয় মুহাম্মাদ ﷺ-এর সঙ্গে।
- তাঁর সীরাত লিখতে লিখতে কলম ক্লান্ত হয়ে গেছে। কলম যা লিখেছে তা অত্যন্ত মুগ্ধকর। কিন্তু বাস্তবার সমুদ্রে তা এক ফোঁটার বেশি নয়।
- তিনি তাঁর যিন্দেগীকে রাঙিয়েছিলেন 'যুহদ' ও 'জিহাদের' রঙতুলি দিয়ে।
- তিনিই জগদ্বাসীর জন্য সর্বশেষ আসমানী পয়গামকে স্বাগত জানিয়েছেন।
- তাঁর যিন্দেগী ছিল কুরআন কারীমের বাস্তব নমুনা।
- নবীজী ﷺ-এর প্রশংসা করে ইতিহাস তাঁকে ধন্য করেনি, বরং তাঁর আলোচনায় ইতিহাস ধন্য হয়েছে।

মানুষের মাঝে সবচেয়ে উত্তম তিনি। বিভিন্ন উম্মতের মাঝে যে রাসূল প্রেরিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে সর্বোত্তম; যারা ইনসাফ করেছেন; তাঁদের মধ্যেও তিনি উত্তম। কঙ্কর তাঁর পবিত্র হাতে তাসবীহ পাঠ করেছে। পাথর তাঁকে সালাম জানিয়েছে। উট তাঁর কাছে অভিযোগ করেছে। বকরি তাঁর বিচ্ছেদে কেঁদেছে। তাঁর আঙুল থেকে পানি প্রবাহিত হয়েছে। বাঘ

তাঁর রিসালাতের সাক্ষ্য দিয়েছে। তাঁর বরকতে খাবার বৃদ্ধি পেয়েছে। বিষমাখা বকরির গোশত তাঁকে বিষের ব্যাপারে সতর্ক করেছে। মেঘ তাঁকে ছায়া দিয়েছে। পাখিরা তাঁর সঙ্গে কথা বলেছে। দোলনায় চাঁদ তাঁর সাথে খেলেছে। তাঁর আঙুলের ইশারায় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। তিনিই পৃথিবীর একমাত্র মানব যিনি এক রাতে সাত আসমান পরিভ্রমণ করেছেন, জান্নাত-জাহান্নাম দেখেছেন, পরম বন্ধু আল্লাহ তাআলার মেহমান হয়ে আরশে আযীমে গমন করেছেন।

তিনিতো সেরাদের সেরা, অভাবী ও দরিদ্রদের বন্ধু, আল্লাহ তাঁর বক্ষ উন্মুক্ত করেছেন। তাঁর আলোচনা সমুন্নত করেছেন। তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।

তিনি গরীব-মিসকিনদের সাথে মিসকিন হয়ে উঠাবসা করতেন। নবীদের ইমাম। শ্রেষ্ঠতম দানশীল। সত্যবাদী। তাঁকে দূর থেকে দেখে মানুষ সমীহ করত। যে কাছ থেকে অবলোকন করত, সে ভালোবাসত। কোমল স্বভাবের ছিলেন। রুঢ় ও নির্দয় ছিলেন না। সরলমনা ছিলেন। সর্বদা প্রফুল্ল থাকতেন। কোনো কিছুর সমালোচনা করতেন না। পরনিন্দায় লিপ্ত হতেন না। কল্যাণ ছিল তাঁর প্রতীক। খোদাভীতি ছিল তাঁর ভূষণ। উভয় কাঁধের মাঝে ছিল নবুওয়তের মোহর।

আল্লাহ তাআলা তাঁকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন সমস্ত নবীর উপর। তাঁকে নবীদের মধ্যে সর্বোত্তম বানিয়েছেন। বানিয়েছেন ‘ইমামুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালীন’। তিনি হলেন ‘রাহমাতুল্লিল আ’লামীন’। তাঁকে বানিয়েছেন গোত্রের মধ্যে সর্বোত্তম। তারপর বানিয়েছেন ঘরের মধ্যে সর্বোত্তম। অবশেষে বানিয়েছেন অন্তরের দিক দিয়ে সর্বোত্তম। সবশেষে তাঁকে

পাঠিয়েছেন কেয়ামত অবধি সকল মানুষের নিকট। তাঁকে পাঠিয়েছেন সুসমৃদ্ধ ও সুসংক্ষিপ্ত বাণী দিয়ে। তাঁর জন্যে গনিমত হালাল করেছেন। জমিনকে তাঁর জন্য মসজিদ বানিয়েছেন। মাটিকে তাঁর জন্যে পবিত্র ঘোষণা করেছেন।

তিনি জীবনের কোমল বাতাস পেয়েছেন এতীম অবস্থায়। দুনিয়ায় আসার পূর্বেই বাবাকে হারিয়েছেন। পিতৃহীনতার কালো চাদর তাঁর ভবিষ্যতের মুচকি হাসি ঢাকতে দেয়নি।

তাঁর জন্ম ছিল মানবতার পুনর্জন্ম। তিনি এমন ভোর নিয়ে এসেছেন, যা শিরকের কালরাতকে আলোয় উদ্ভাসিত করেছে। তাঁর শৈশব নিয়ে এসেছিল চারিত্রিক শিষ্টতা, পবিত্রতা ও নিষ্পাপতা।

যৌবনে পদার্পণ করেছেন মূর্তিপূজা থেকে দূরে থেকে। তাঁর আগমন নবুওয়তের গ্রহণযোগ্যতাকে ইতিহাসের অন্ধকার থেকে তুলে এনেছে। তাঁর রিসালাত প্রতিবন্ধক হয়েছে মানুষ ও মন্দ চরিত্রের মাঝে।

আপন সম্প্রদায়ের নিকট সত্যবাণী পেশ করেছেন। ফলে কুরাইশদের মূঢ়তার চূড়ান্ত রূপ তাঁর উপর প্রকাশ পেল। তারা উত্তেজিত হলো। তাঁর উপর ধেয়ে এল বিপদ-আপদ ও ঝড়-ঝাপটা । সবর করলেন। হিজরত করলেন। নবুওয়তের দায়িত্ব পালন করলেন।

দোলনা হতে ওফাত পর্যন্ত তাঁর যিন্দেগী সুস্পষ্ট। তাঁর গুনাবলি যেন প্রতিদিন নতুন নতুন আঙ্গিকে প্রকাশ পেত। মদীনায় স্থাপন করেন সবচেয়ে বড় রাষ্ট্রের ভিত্তি। যার ঘটনা ইতিহাসে জাজ্বল্যমান।

আল্লাহ তাআলা তাঁর রিযিক রেখেছেন বর্শা, ফলা আর তরবারির নীচে। তাঁকে প্রেরণ করেছেন বাতিল ও মিথ্যাকে জবাই করার জন্যে। আল্লাহ তাঁর বিরোধীদের করেছেন লাঞ্ছিত। তাঁর হাতে অর্পণ করেছেন জমিনের ধন-ভাণ্ডারের চাবি। তাঁর দেহে দিয়েছেন চল্লিশ জন জান্নাতী পুরুষের শক্তি।

ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য, মানুষকে সত্য প্রভুর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য, মিথ্যাকে ধ্বংস করার জন্য কতই না কষ্ট সহ্য করেছেন তিনি। বরং তাঁকে যত কষ্ট দেয়া হয়েছে, তত কষ্ট অন্য কোনো নবী রাসূলকেও দেয়া হয়নি। তুমি কি দেখনি, মক্কার কুরাইশরা তাঁকে গালমন্দ করেছে, অপবাদ দিয়েছে, রক্তাক্ত করেছে, তাঁর উপর উটের ভুঁড়ি নিক্ষেপ করেছে? তায়েফে কি দেখনি, তাঁকে কিভাবে ক্ষত-বিক্ষত করা হয়েছে প্রস্তারাঘাতে? তাঁর দু'পা রক্তাক্ত হয়ে তাঁর জুতো রক্তে পূর্ণ হয়ে গেল। তুমি কি দেখনি, পাথরের আঘাতে তিনি কিভাবে পড়ে যাচ্ছিলেন, আর দুর্বৃত্তরা তাকে উঠিয়ে পুনরায় পাথর নিক্ষেপ করছিল, তবুও তিনি বলে যাচ্ছিলেন "প্রভু হে! ক্ষমা করো আমার জাতিকে, ওরা যে বুঝে না"?। আর ওহুদের যুদ্ধে? আহ! কুফ্ফারদের আঘাতে তাঁর ডান দিকের নীচের দাঁত ভেঙ্গে যায়, নীচের ঠোঁট আহত হয়। কপালে জখম হয়। তাঁর শিরস্ত্রাণের দুটো অংশ ভেঙ্গে তাঁর চোয়ালের ভেতরে ঢুকে যায়। অতঃপর মুসলমানদেরকে তাদের অজান্তে ফেলে মারার জন্য কুফ্ফাররা যে গর্ত খুড়ে রেখেছিল, তার একটিতে পড়ে যান তিনি। দ্বীনের জন্য তাঁর মতো কষ্ট ও ত্যাগ কে স্বীকার করেছে?

তাঁর নেতৃত্বে বহুসংখ্যক (ষাটোর্ধ) বৃহৎ ও ক্ষুদ্র, প্রত্যক্ষ (গায্ওয়া) ও পরোক্ষ (সারিয়্যা) অভিযান পরিচালিত হয়েছে। বড় বড় যুদ্ধের মধ্যে রয়েছে বদর, ওহুদ, খন্দক, মুতা, মক্কা বিজয়, হুনাইন, তবুক ইত্যাদি। তিনি ছিলেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সফল সমরনায়ক। তাঁর দক্ষতা, সমর কুশলতা ও সাহসিকতা ছিল অনন্য! সৈন্য সমাবেশ, যুদ্ধ পরিকল্পনা, অবস্থান নির্ণয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁকে কেউ অতিক্রম করে যেতে পারেনি। পরিবেশ-পরিস্থিতি, পটভূমি প্রাসঙ্গিক লক্ষণসমূহ এবং পরিণতি ইত্যাদি বিবেচনায় তিনি ছিলেন তুলনাহীন মেধাশক্তির অধিকারী। তাঁর বুদ্ধি বিবেচনা ছিল নির্ভুল এবং বিবেকের জাগ্রতাবস্থা ছিল গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত।

তিনি নিজ হাতে গড়ে তোলেন মুসলিম সেনাপতিদের এক অপরাজেয় শক্তি, পরবর্তীতে যারা বিজয় করেছেন ইরাক, সিরিয়া, পারস্য ও রোম। যুদ্ধের মাধ্যমে মুশরিক ও কুফ্ফারদের শক্তি-সামর্থ্য ও অহংকার নস্যাৎ করেছেন। আল্লাহর দুশমনদের তাদের ভূ-খণ্ড, ধন-সম্পদ, ক্ষেত-খামার, বাগান, জলাশয় ইত্যাদি থেকে বহিষ্কার করেছেন। ফেতনা ফাসাদের মূল উৎপাটন করেছেন। আল্লাহর জমিনকে খেয়ানত, যুলুম-অত্যাচার, পাপাচার থেকে মুক্ত করে তার স্থলে শান্তি-নিরাপত্তা, দয়াশীলতা ও মানবতা প্রতিষ্ঠা করেছেন ।

অন্ধকার যুগে যেসব কারণে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠত, তিনি সেসব কারণও বদলে দিয়েছেন। তখন যুদ্ধ মানে ছিল লুটতরাজ, হত্যা-ধ্বংস, যুলুম-অত্যাচার, অবিশ্বাস্য রকমের বাড়াবাড়ি, প্রতিশোধ গ্রহণ, দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার, জনপদ বিরান করা, বাড়ীঘর-অট্টালিকা ধ্বংস করা, নারীদের সম্মান ও সম্ভ্রম হানী করা, শিশু ও বৃদ্ধদের সাথে নিষ্ঠুর ও

নৃশংস আচরণ করা। এছাড়াও ক্ষেত-খামার ধ্বংস করা এবং পশুপাল হত্যা করা। তিনি যুদ্ধের এসব কার্যকলাপ বন্ধ করে যুদ্ধকে পরিণত করেন এক পবিত্র জিহাদে, যার ফলাফল হয় সর্বকালের মানুষের জন্য কল্যাণকর। তিনি অমুসলিমদেরও অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন, ঘোষণা করেছেন,"কোনো মুসলমান যদি অনর্থক কোনো অমুসলমানকে হত্যা করে, তাহলে সে জান্নাতের গন্ধও পাবে না, অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ চল্লিশ বছরের দূরত্ব হতেও পাওয়া যাবে।"

তাঁর বন্দেগী (ইবাদত) আর যিন্দেগী (জীবন যাপন পদ্ধতি) ছিল সকলের জন্য "উস্ওয়াতুন হাসানাহ" (সর্বোত্তম আদর্শ)। তিনি যেমন ছিলেন 'মুজাহিদ'দের উস্তাদ, তেমনি ছিলেন 'যাহিদ'দের (দুনিয়াত্যাগীদের) প্রধান শিক্ষক। তিনি একক ব্যক্তিত্ব, যিনি সীরাত ও চরিত্রের চিত্র এঁকেছেন ওহীর কলম দিয়ে। যিনি তাঁর যিন্দেগী সাজিয়েছেন জিহাদ ও যুহদ (দুনিয়াত্যাগ) দিয়ে। দুনিয়া থেকে যৎ সামান্য গ্রহণের নিয়ম-নীতি তিনিই প্রথম রচনা করেন। তাঁর বাণী অন্তরকে স্বচ্ছ করে। জ্ঞানীদের বিনম্র করে।

যদি আমাকে জিজ্ঞেস করো তাঁর নামায সম্পর্কে-

নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাঁর কদম মোবারক ফুলে যেত।

তাঁর যুহদ?	এক্ষেত্রে তাঁর কোনো উপমা নেই।
তাঁর দান?	তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দানশীল।
তাঁর চরিত্র?	মহৎ! অতি মহৎ!
তাঁর ঘাম?	সুরভিত মেশকাম্বর!
তাঁর চেহারা?	উজ্জ্বল চাঁদও কিছু না!

তাঁর চোখ?	কাজল কালো!
তাঁর চুল?	রেশম যেন!
তাঁর পা?	সুকোমল, দুই পায়ে দীর্ঘসময় নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতেন!
তাঁর কথা?	নূর ও মুক্তার মালা!
তাঁর মাজলিস?	যিকির ও তাসবীহ!
তাঁর নীরবতা?	ভাবনা ও ধ্যান-মগ্নতা!
তাঁর সহনশীলতা?	অত্যন্ত দয়ালু!
তাঁর বীরত্ব?	সাহসী বীর্যবান!
তাঁর নাম?	মুহাম্মাদ- চির প্রশংসিত!

যদি আমায় জিজ্ঞেস করো, তোমরা তাঁর সম্পর্কে কী বলো? আগে তোমরা নবীর জন্যে রহমতের দুআ করো এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ করো!

واكرم منك لم ترقط عينى - واجمل منك لم تلد النساء

خلقت مبرأً من كل عيب - كأنك قد خلقت كما تشاء

আমার চোখ কখনো আপনার মতো সম্ভ্রান্ত কাউকে দেখেনি
কোনো মা আপনার চাইতে সুন্দর কোনো সন্তান জন্ম দেয়নি
আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সব ধরণের দোষ থেকে মুক্ত করে
যেন আপনি সৃষ্টি হয়েছেন আপনারই ইচ্ছানুসারে।

প্রকৃতি কখনো তাঁর মহত্ত্বের গান গেয়ে উঠে। সকলে জেঁকে বসে যেন নির্জীব, আপন স্থান-চ্যুত হবে না। আর কেনই বা এমন হবে না, আল্লাহ

তাআলাই তো তাঁর প্রশংসা করেছেন নিজ কিতাবে। আল্লাহ তাঁর মন-মস্তিষ্কের প্রশংসা করেছেন।

তিনি বলেছেন,

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ

"তোমাদের সাথী পথভ্রষ্ট হননি এবং বিপথগামীও হননি।" (৫৩ সূরা নজম:২)

তাঁর যবানের প্রশংসা করেছেন,

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ

"তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না"। (৫৩ সূরা নজম:৩)

তাঁর সঙ্গী জিবরাঈলের প্রশংসা করেছেন,

عَلَّمَهُ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ

"তাঁকে শিক্ষা দান করে এক বিশ্বস্ত শক্তিশালী ফেরেশতা।"(৫৩ সূরা নজম: ৫)

তাঁর অন্তরের প্রশংসা করেছেন,

مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ

"রাসূল যা দেখেছেন সে ব্যাপারে তাঁর অন্তর মিথ্যা বলেনি।"
(৫৩ সূরা নজম: ১১)

তাঁর চোখের প্রশংসা করেছেন,

مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ

"তাঁর দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি এবং সীমালঙ্ঘনও করেনি।" (৫৩ সূরা নজম: ১৭)

তাঁর সিনার প্রশংসা করেছেন,

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ

"আমি কি আপনার সিনাকে প্রশস্ত করে দেই নি?" (৯৪ সূরা ইনশিরাহ: ১)

তাঁর সাহাবীদের প্রশংসা করেছেন,

وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ

"তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল।" (৪৮ সূরা আল-ফাত্হ: ২৯)

তাঁর সবকিছুরই প্রশংসা করেছেন,

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

"নিশ্চয় তিনি মহান চরিত্রের অধিকারী।" (৬৮ সূরা কলম:৪)

مبرأ من ريب ودنس - وكيف وهو بماء الخلد مغسول

সন্দেহ, সংশয় ও মালিন্যমুক্ত হৃদয়ের অধিকারী
এমন হবে না কেন?
তিনি তো আবে হায়াত বিধৌত!

তিনি এমন এক সত্ত্বা, যাঁর উপর স্বয়ং আল্লাহ পাক দরূদ ও সালাম প্রেরণ করে থাকেন, সকল ফেরেশতাগণও তার প্রতি দরূদ পাঠ করেন, আর আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকেও তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করতে হুকুম করেছেন।

যে তাঁর প্রতি একবার দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি দশটি রহমত নাযিল করেন।

অন্যদিকে যে তাঁকে একটি কটুক্তি করেছে, আল্লাহ তাআলা তাকে দশটি গালি দিয়েছেন। তাকে জারজ আখ্যায়িত করেছেন, শূকরের সাথে তুলনা করেছেন। তাকে আযাবের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। (৬৮ সূরা কলম)

রাসূল ﷺ-এর মাঝে সমাবেশ ঘটেছিল সব নবী-রাসূলের গুণাবলি। আল্লাহ তাআলা তাঁকে দিয়েছেন হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের শ্রেষ্ঠাংশ। শীস আলাইহিস্ সালামের জন্ম। নূহ আলাইহিস্ সালাম-এর বাহাদুরি। ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম-এর সহনশীলতা। হযরত ইসমাঈল আলাইহিস্ সালামের ভাষা। ইসহাক আলাইহিস্ সালামের সন্তুষ্টি। সালেহ আলাইহিস্ সালামের বাকপটুতা। লুকমান আলাইহিস্ সালামের হিকমত। ইয়াকুব আলাইহিস সালামের সুসংবাদ। ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের সৌন্দর্য। আইয়ূব আলাইহিস্ সালামের ধৈর্য। মূসা আলাইহিস্ সালামের শক্তি। ইউনুস আলাইহিস্ সালাম-এর তাসবীহ। ইউশা আলাইহিস্ সালাম-এর জিহাদ। দাউদ আলাইহিস্ সালাম-এর নেয়ামত। সুলাইমান আলাইহিস্ সালাম-এর দান। ইলিয়াস আলাইহিস্ সালাম-এর গাম্ভীর্য। খিযির আলাইহিস্ সালাম-এর ইল্‌ম। ইয়াহ্ইয়া আলাইহিস্ সালাম-এর পরহেযগারী। ঈসা আলাইহিস্ সালাম-এর যুহদ। তাঁর মর্যাদা সকলের মর্যাদা ছাড়িয়ে গেছে। তাঁর নূর সব নূরকে ছাড়িয়ে গেছে।

আল্লাহ তাআলা তাঁর উম্মতের কাতারকে ফেরেশতাদের কাতারের সমতুল্য করেছেন। তাঁর মুজিযা হলো- আল্লাহর কালাম। তাঁকে

দিয়েছেন বারবার পঠিত হয় এমন সাতটি আয়াত। আল্লাহ তাআলা তাঁর দ্বারা নবীদের ধারা সমাপ্ত করেছেন।

فاق النبيين في خلق وفي خلق - ولم يدا نوه في علم ولا كرم

নবীদের ছাড়িয়ে গেছেন সুন্দর গুণাগুণে ও জন-মানবে
জ্ঞান-গরিমা ও শান-মানে কেউ নেই তাঁর ধারে কাছে।

জান্নাতে সকলকে যার যার নামে ডাকা হবে, আর আদম আলাইহিস্ সালামকে ডাকা হবে আবু মুহাম্মাদ (মুহাম্মাদ ﷺ-এর পিতা) নামে। নবীজী ﷺ-এর সবকিছু সর্বোত্তম এবং তাঁর সাথে সম্পর্কিত সবকিছু সর্বোত্তম। তিনি নিজে শ্রেষ্ঠ নবী, রাসূলদের সর্দার তিনি, আম্বিয়াদের ইমাম তিনি। তাঁর কিতাব কুরআন কিতাবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাঁর বংশ দুনিয়াতে সর্বশ্রেষ্ঠ, আদম আলাইহিস্ সালাম থেকে তাঁর পিতা পর্যন্ত কেউ কখনো ব্যভিচার করেননি, কুরাইশ সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি, তাঁর দাদা ও পিতা সর্বশ্রেষ্ঠ আরব, তাঁর ভাষা আরবি কবর, হাশর, জান্নাতের ভাষা, তাঁর জন্মভূমি মক্কা দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ শহর, সেখানে রয়েছে বাইতুল্লাহ, কোটি কোটি মানুষ সেখানে হজ্জ ও ওমরা পালন করে। তাঁর হিজরতের স্থান মদীনা সর্বশ্রেষ্ঠ নগরী, যার হাওয়া রোগের নিরাময়, যেখানে তাঁর রওযা মুবারক অবস্থিত, কোটি মানুষ অশ্রুসিক্ত অবস্থায় সেখানে হাযির হয়, তাঁর রওযায় প্রতিদিন কোটি কোটি দরূদ ও সালাম পৌঁছানো হয়। তাঁর উম্মত সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত, তাঁর গুহার সাথী উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ হযরত আবু বকর রদিয়াল্লহু আনহু, সকল জান্নাতের আকাঙ্ক্ষার পাত্র। তাঁর ঘনিষ্ঠ সাথী হযরত ওমর বিন খাত্তাব রদিয়াল্লহু আনহু, আল্লাহর হুকুমের ব্যাপারে সবচেয়ে কঠোর, জমিনের বুকে সর্বশ্রেষ্ঠ ইনসান, যার যোগ্যতা নবীদের মতো। তাঁর

সেনাপতি হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লহু ছিলেন ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ বীর, সেনাপতি, তাঁর উপাধি ছিল "সাইফুল্লাহ" (আল্লাহর তরবারি), যাঁর হাতে আল্লাহ তাআলা পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটান। তাঁর সাহাবীরা নবীদের পর মানবজাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাঁদের কপালে সিজদার চিহ্ন শোভা পেত। তাঁর স্ত্রীরা নারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পুতপবিত্রা, তাঁর স্ত্রী আম্মাজান খাদিজা রদিয়াল্লহু আনহা জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ নারী, তাঁর কন্যা ফাতিমা রদিয়াল্লহু আনহা জান্নাতি মহিলাদের সর্দারনি, তাঁর স্ত্রী আম্মাজান আইশা রদিয়াল্লহু আনহা দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও উম্মতের পথপ্রদর্শক। তাঁর বংশধারা সর্বশ্রেষ্ঠ, তাঁরা হলেন আহলে বাইত, লাখো দরূদ ও সালাম প্রতিদিন তাদের জন্য, যেখান থেকে শেষ যামানায় ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম-এর জন্ম হবে, যার হাতে দুনিয়ার তামাম বাতিল শক্তি ধ্বংস হবে, দাজ্জাল ও কুফ্ফারদের মূলোৎপাটন হবে।

কেয়ামতের দিন তাঁকে সুউচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করা হবে। তিনি হবেন সকল আদম সন্তানের সর্দার। কবর হতে উত্থিত সর্বপ্রথম ব্যক্তি। কেয়ামতের দিন মানুষ একত্রিত হলে তিনি হবেন তাদের মুখপাত্র। হাশরের ময়দানের শোভাবর্ধনকারি। তাদের নৈরাশ্যের সময় সুসংবাদদাতা। তাঁর অনুসারী উম্মতের সংখ্যা হবে সর্বাধিক। তিনি হবেন সুপারিশের অধিকারী। দাঁড়াবেন আরশের ডানে। প্রথম সুপারিশকারী। প্রথম সুপারিশ কবুলকৃত ব্যক্তি। সেদিন তাঁর সুপারিশ যে লাভ করবে না, সে নিশ্চিত ধ্বংস হবে। বিদআতী ব্যতীত সেদিন সকল নেককার ও গুনাহগার মুমিন তাঁর শাফায়াতের দ্বারা উপকৃত হবে। সকল মানুষ যখন ভয়ে বিচলিত হয়ে নিজের যান বাঁচানোর জন্য আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া

করতে থাকবে, ইয়া রব! নাফসী! ইয়া রব! নাফসী! (অর্থাৎ হে রব! আমার জান বাঁচাও।) সকল আম্বিয়ায়ে কেরামও যখন নিজের জানের জন্য দোয়া করতে থাকবেন,"ইয়া রব! নাফসী!", তখন কেবল তিনি উম্মতের জন্য দোয়া করতে থাকবেন, "ইয়া রব! উম্মাতী! উম্মাতী!" (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার উম্মতকে বাঁচাও।) তাঁকে আল্লাহ তাআলা হাশরের ময়দানে হাউযে কাউসার দান করবেন। তাঁর হাউযে সবচেয়ে বেশি মানুষের সমাগম হবে। তিনিই সর্বপ্রথম জান্নাতের কড়া নাড়বেন। তাঁর হাতে থাকবে আল্লাহ পাকের ঝাণ্ডা ও জান্নাতের চাবি। নবীগণ থাকবেন তাঁর পতাকাতলে। তাঁর পিছে পিছে সকলে জান্নাতের দিকে চলবে, তাঁর জন্যই প্রথম জান্নাতের দরজা খোলা হবে। জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান ওয়াসিলা হবে তাঁর জন্য, যা আল্লাহ পাকের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী হবে।

তিনিই হচ্ছেন দুজাহানের সরদার। সাইয়্যেদুল কাউনাইন। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব আল-হাশেমী ﷺ। আমাদের প্রাণপ্রিয় নবীজী ﷺ। তাঁর শানে লাখো কোটি দরূদ ও সালাম। এমন ব্যক্তিত্ব যিনি, এমন এক সত্ত্বা যিনি, তাঁকে কে না মহব্বত করবে! তাঁকে কে না ভালোবাসবে? তাঁর জন্য কে না নিজের জান বাজি ধরবে? নিজের পিতা-মাতা, স্ত্রী, সন্তান সন্ততি, এমনকি নিজের জীবনের চেয়েও বেশি কে না ভালোবাসবে!

সুতরাং,

যে নিজেকে ভালোবাসে, সে যেন নবীজী ﷺ-কে আগে ভালোবাসে!

যে নিজের শুভ পরিণতি আশা করে, সে যেন নবীজী ﷺ-এর সাথে মহব্বতের সম্পর্ক করে নেয়!

যার ভালোবাসার মতো একটি হৃদয় আছে, সে যেন তা আল্লাহর হাবীব ﷺ-কে সর্বাগ্রে প্রদান করে!

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য, তাঁর আহ্‌লে বাইতের জন্য আমার (লেখকের) জান, আমার পিতা-মাতা ও আমার খান্দানের সকলের জান কুরবান হোক! আল্লহুম্মা আমীন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মহব্বত বাড়ানোর উপায়:

১. বেশি বেশি সীরাত পাঠ করা
২. বেশি বেশি দরূদ শরীফ পাঠ করা
৩. বেশি বেশি সুন্নতের উপর আমল করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "যে কোনো বান্দা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে মহব্বত রাখবে, তার দিকে দারিদ্রতা নিম্নমুখী পানির স্রোত অপেক্ষা অধিক দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসবে। অতএব যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মহব্বত করবে, সে যেন পেরেশানির জন্য ঢাল (সবর) নিয়ে প্রস্তুত থাকে।"

আল্লাহর রাহে জিহাদ করাকে কেন সবচেয়ে বেশি ভালোবাসব না!!!

জিহাদ একটি ফরয আমলঃ

✓আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। হতে পারে একটা বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তো বা কোনো একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দীয়, অথচ তোমাদের জন্য তা অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহ তাআলাই জানেন, তোমরা জান না। " (২ সূরা বাকারাঃ ২১৬)

✓আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ

"আর তোমরা তাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই করতে থাকো, যে পর্যন্ত না (পৃথিবীর সকল) ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।" (২ সূরা বাকারাঃ ১৯৩)

যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে একজন কাফের অবশিষ্ট থাকবে, ততদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে ফেতনা অবশিষ্ট থাকবে, যার কারণে কেয়ামত পর্যন্ত জিহাদ একটি ফরয হুকুম হিসেবে অবশিষ্ট থাকবে।

শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, দুই কারণে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা তোমাদের উপর ফরয-

ক. আল্লাহর দ্বীনকে বুলন্দ করা। (আক্রমনাত্মক বা Offensive জিহাদ)

খ. কাফেরদের হাতে নির্যাতিত মুসলমানদের মুক্ত করা। (প্রতিরক্ষামূলক বা আত্মরক্ষামূলক বা প্রতিরোধমূলক বা Defensive জিহাদ)

(তাফসীরে উসমানী, পৃ. ২৪৪)

মুসলিম সাম্রাজ্যের বা খিলাফতের কোন নির্দিষ্ট বর্ডার বা সীমানা নেই, সবটাই ফ্রন্টলাইন বা যুদ্ধক্ষেত্র। ততদিন পর্যন্ত জিহাদ চলবে যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীর এক ইঞ্চি মাটিও আল্লাহ তাআলার বিধান প্রতিষ্ঠা থেকে খালি থাকবে এবং একজন মানুষও আল্লাহর দ্বীনের আওতার বহির্ভূত থাকবে।

সাধারণভাবে মুসলিম সাম্রাজ্যে যদি শান্তি বিরাজ করে তখন জিহাদ ফরযে কিফায়া থাকে, অর্থাৎ উম্মতের কিছু মানুষ জিহাদ করলে সকলের পক্ষে জিহাদ আদায় হয়ে যায়। এ জিহাদের মাধ্যমে কোনো কুফর রাষ্ট্রকে প্রথমে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়, তা কবুল না করলে ‘জিযিয়া কর’ দাবী করা হয়, যদি এতে তারা সম্মত হয় তবে তাদের নিরাপত্তার ভার মুসলিমদের হাতে। মুসলমানরা নিজের রক্ত দিয়ে সেসকল অমুসলিমদের জান ও মালের হেফাযত করবে, বহিঃশত্রু থেকে তাদের রক্ষা করবে। আর কোনো অমুসলিম সম্প্রদায় কর দিতে সম্মত না হলে তরবারি দ্বারা

ফয়সালা করা হয়, যারা তরবারি দ্বারা মুজাহিদদের পথ রোধ করবে সেসব সৈন্যদেরকে হত্যা বা বন্দী করা হয়, তাদের নারীদেরকে দাসী-বাঁদী বানানো হয়। সেই ভূমি জয় করে তাতে আল্লাহর বিধান/আইন প্রতিষ্ঠা করা হয়, আর সামর্থ্যবান অমুসলিমদের কাছ থেকে কর আদায় করা হয়। এটি হলো "আল্লাহর দ্বীনকে বুলন্দ করা"র জিহাদ বা আক্রমনাত্মক (Offensive) জিহাদ। এই জিহাদ ফরযে কিফায়া।

কিন্তু পৃথিবীর কোনো এক প্রান্তে যদি একজন মুসলিমও কুফ্ফার কর্তৃক আক্রান্ত হয়, কোনো একজন মুসলমানের উপর ক্রুসেডার কর্তৃক শুধু তরবারি উত্তোলন করা হয়, মুসলিম ভূমির এক বিগত মাটিও যদি কুফ্ফাররা দখল করে নেয়, তখন সকল মুসলিম জাতির উপর জিহাদ সাধারণভাবে 'ফরযে আইন' হয়ে যায়। তখন আর কারো ঘরে বসে থাকার উপায় নেই। সক্ষম সকল যুবক, বৃদ্ধ, পুরুষ ও নারীর উপর হিজরত ও জিহাদ করা ফরযে আইন হয়ে যায়। **বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে অবশ্যই জিহাদ "ফরযে আইন" তথা সকলের উপর ফরয।**

এটি হলো "প্রতিরক্ষামূলক বা প্রতিরোধমূলক" (Defensive) জিহাদ।

ইমাম কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন-

"ইবনে আতিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একথার উপর ইজমা চলে আসছে যে, উম্মতে মুহাম্মাদির প্রতিটি ব্যক্তির উপর জিহাদ ফরযে কিফায়া। যদি মুসলমানদের একাংশ তা আদায় করে, অন্যদের থেকে এর দায়িত্ব-ভার সরে যাবে। তবে শত্রু যদি কোনো ইসলামী ভূ-খন্ডে আগ্রাসন চালায়, তখন তা ফরযে আইন হয়ে যায়।" (তাফসীরে কুরতুবী, খ. ৩, পৃ. ৩৮)

ইবনুল হুমাম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "নফীরে আম- এর সময় জিহাদ ফরজে আইন হওয়াটা ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত।" (ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৪৪০)

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

"প্রতিরোধমূলক (Defensive) যুদ্ধ মুসলমানদের দ্বীন ও সম্মানের উপর আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর, যা সর্বসম্মতিক্রমে ফরয (ফরযে আইন)। যে আগ্রাসী শক্তি মুসলমানদের দ্বীন-দুনিয়া ধ্বংস করে, ঈমানের পর তাকে প্রতিরোধের চেয়ে গুরুতর ফরয দ্বিতীয় আরেকটি নেই। এই ক্ষেত্রে কোনো শর্ত প্রযোজ্য নয়, বরং সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতিরোধ করতে হবে। আমাদের ও অন্যান্য (মাযহাবের) ফুকাহায়ে কেরাম সকলেই তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।" (ফাতাওয়া আল কুবরা, খ. ৪, পৃ. ৬০৮)

শহীদ ড. আব্দুল্লাহ আযযাম রাহিমাহুল্লাহ তাঁর লিখিত **DEFENSE OF THE MUSLIM LANDS** (মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষা) কিতাবে লিখেন, "ঈমান আনার পর প্রথম ফরয হচ্ছে, মুসলিমদের ভূমিকে প্রতিরক্ষা করা। যদি মুসলিমদের ভূমির এক বিঘত পরিমাণের জায়গাও কুফ্ফাররা দখল করে নেয়, তখন প্রত্যেক মুসলিম নর ও নারীর উপর জিহাদ ফরযে আঈন হয়ে যায় (সবার উপর ফরয হয়ে যায়)। ঐ মুহূর্তে জিহাদে বের হওয়ার জন্য পিতা-মাতার কাছ থেকে তার সন্তানের অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন হয় না এবং স্বামীর কাছ থেকে তার স্ত্রীরও অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন পড়ে না।"

মুফতী শফী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "এমনিভাবে আল্লাহ না করুন, কখনো যদি কাফেররা কোনো ইসলামী রাষ্ট্রে আক্রমণ করে এবং প্রতিরোধের জন্য নির্ধারিত বাহিনী তাদের প্রতিরোধে যথেষ্ট না হয়, তখন উক্ত ফরয তাদের অতিক্রম করে পার্শ্ববর্তী সকল মুসলমানের উপর আরোপিত হয়। তারাও যদি সক্ষম না হয়, তাহলে তাদের পার্শ্ববর্তীদের উপর এবং এভাবে ক্রমান্বয়ে সমগ্র বিশ্বের প্রত্যেক মুসলমানের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়। তবে স্বাভাবিক অবস্থায় (যখন কুফ্ফারদের কোনো আগ্রাসন থাকে না, তখন) জিহাদ ফরযে কিফায়া।" (তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন, খ. ৪, পৃ. ৩৩৫-৩৩৬, রদ্দুল মুহতার, খ.৩, পৃ. ২৩৮)

বর্তমান যামানাই সেই যামানা, যখন পৃথিবীর প্রতিটি মুসলমানের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গিয়েছে। সারা পৃথিবী জুড়ে আজ মুসলমানরা কুফ্ফার কর্তৃক আক্রান্ত। যেই সকল মর্দে মুজাহিদ জিহাদ করছেন, তারা এই সকল কুফ্ফারদের প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হচ্ছেন। কারণ হচ্ছে- মুজাহিদদের সংখ্যার অপ্রতুলতা, শক্তি সামর্থ্যের ঘাটতি, অন্যদিকে ক্রুসেডাররা মুসলিম মুজাহিদদের থেকে সংখ্যায় অনেক বেশি, তারা অনেক বেশি সশস্ত্র, তাদের অস্ত্রগুলো অনেক বেশি উন্নত ও আধুনিকতাসম্পন্ন। এক কথায়, বর্তমানে পৃথিবীতে যেখানে যেখানে মুজাহিদ বাহিনী আছে, তা কুফ্ফারদের প্রতিরোধের জন্য যথেষ্ট নয়। এসকল কারণে, এই ফরজ হুকুম বিশ্বের অপরাপর সকল মুসলমানের উপর বর্তিয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত ক্রুসেডারদের আগ্রাসন বন্ধ না হবে, পৃথিবীর কোনো মুসলমান এই ফরয হুকুম থেকে বাঁচতে পারবে না।

"যখন মুসলমানদের পক্ষ থেকে শত্রু প্রতিরোধের প্রয়োজন তীব্র হয়, তখন নিঃসন্দেহে জিহাদ সকল ইবাদত থেকে উত্তম। যেমন খন্দকের যুদ্ধে রাসূলে কারীম ﷺ-এর চার ওয়াক্ত নামায কাযা হওয়ার ঘটনা থেকে বিষয়টি পরিষ্কার।" (তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন, খ.৪, পৃ. ৩৩৫-৩৩৬)

তাহলে একটু চিন্তা করুন, জিহাদ ফরযে আইন অবস্থায় যদি জিহাদ করতে গিয়ে আল্লাহর রাসূলের ﷺ চার ওয়াক্ত নামায কাযা হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে মাদরাসা, খানকাহ, তাবলীগ, রাজনীতি, কিতাবাদি রচনা, চাকুরী, ব্যবসা ইত্যাদি অন্যান্য সকল কাজে ব্যস্ত থাকাটা কতটুকু শরীয়ত সম্পন্ন হবে? জিহাদ বাদ দিয়ে এসব দ্বীনী খেদমত কিংবা দুনিয়াবী কাজে ব্যস্ত থাকাটা কি নবীওয়ালা দ্বীন? নবীওয়ালা মেজাজ (প্রকৃত দ্বীন) তো এটাই যে, জিহাদের প্রয়োজনে একান্ত অপারগতায় নামায ছোটে যেতে পারে, কিন্তু জিহাদের ব্যাপারে কোনো গাফলতী চলবে না, কেননা নামায যে শরীয়তের বিধান, খোদ সেই শরীয়ত এবং পাশাপাশি গোটা উম্মতের অস্তিত্ব নির্ভর করে এই জিহাদের উপর ।

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে, জিহাদ এমন ভাবে ফরয হয়ে গিয়েছে যে, যদি জিহাদ করার মতো একজন উম্মতও থাকে, তবে তাকেও জিহাদ করতে হবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَقَاتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ

“(হে নবী!) আপনি (একা হলেও) আল্লাহর পথে কিতাল (যুদ্ধ) করুন; আপনার আপন সত্তা ব্যতীত অন্য কারো দায় আপনার উপর বর্তাবে না (আপনার ডাকে অন্য কেউ যদি জিহাদ না করে তাহলে এজন্য আপনি দায়ী নন)।” (৪ সূরা নিসা: ৮৪)

ইবনে আতিয়্যাহ আন্দালুসি রাহিমাহুল্লাহ উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন,

“বাহ্যত দেখা যায়, এ আয়াতের আদেশ শুধু রাসূল ﷺ-এর একার জন্য। তবে কোনো হাদীসেই আমরা এ কথা পাইনি যে, কোনো যামানায় জিহাদ উম্মত বাদে শুধু রাসূলের উপর ফরয ছিল। (কাজেই) ওয়াল্লাহু আ’লাম-(আয়াতে) বাহ্যত রাসূল ﷺ-কে সম্বোধন করা হলেও এটি পৃথক পৃথক সকলকে বলাই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! আপনি এবং আপনার উম্মতের সকলের প্রতিই নির্দেশ হলো, “তুমি (একা হলেও) আল্লাহর রাস্তায় কিতাল (যুদ্ধ) কর। তোমার উপর তোমার নিজের ছাড়া অন্য কারো দায়ভার বর্তাবে না।” এজন্য প্রতিটি মুমিনের এই অনুভূতি রাখা উচিত যে, সে একা হলেও জিহাদ করবে।

একই অর্থ বহন করছে রাসূল ﷺ-এর এ বাণী, "আল্লাহর কসম! আমার গর্দান পৃথক হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অথবা আমি একা হয়ে গেলেও তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে যাবো।"

একই অর্থ বহন করছে হযরত আবু বকর রদিয়াল্লাহু আনহুর এ বাণী, "আর এ যুদ্ধে আমার ডান হস্ত আমার সঙ্গ না দিলে বাম হস্ত দিয়েই (অর্থাৎ কেউ আমার সাথে না থাকলে) আমি (একাই) তাদের (অর্থাৎ মুর্তাদদের) বিরুদ্ধে জিহাদ করে যাবো।"

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَـٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَلْ لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيّاً وَٱجْعَلْ لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيراً

"আর তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে যালেম, অত্যাচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষালম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।" (৪ সূরা নিসা: ৭৫)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন,

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ

"যুদ্ধ কর তাদের সাথে, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দিবেন। তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন।" (৯ সূরা তাওবা: ১৪)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "তুমি আল্লাহ তাআলার রাস্তায় অবশ্যই হিজরত করতে থাক। কেননা হিজরতের ন্যায় কোনো আমল নেই। অর্থাৎ হিজরত সবচেয়ে উত্তম আমল।" (নাসাঈ)

একজন জিহাদ প্রেমিকের ঐতিহাসিক চিঠি:

'ইমামুল জিহাদ' হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহিমাহুল্লাহর নাম শুনেনি এমন কোনো মুজাহিদ পৃথিবীতে আছে কিনা আমার জানা নেই। যদি থেকে থাকে, তবে এটি মুজাহিদ হিসেবে বড় অন্যায়। তাঁর ছিল অসাধারণ মেধা, অতলান্ত জ্ঞান, সীমাহীন খোদাভীতির পাশাপাশি উন্নত রুচি, শানিত ব্যক্তিত্ব, প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও জিহাদের ময়দানে অসাধারণ বীরত্ব। এছাড়া তিনি ছিলেন ইলম ও আহলে ইলমের পৃষ্ঠপোষক, গরীব মিসকীনের দরদী বন্ধু, ওলী আল্লাহ, যাহিদ, আবিদগণের চোখের মনি। নির্যাতিত, নিপীড়িত, অসহায় মুসলমানদের জন্য তার ধমনীতে তপ্ত শোনিত ধারা প্রবাহিত হতো।

তিনি ছিলেন যুগের শ্রেষ্ঠ আলেম। তিনি নিজেই বলেন,"আমি চার হাজার শাইখ থেকে ইলম অর্জন করেছি।" ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লহ বলেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের যুগে তাঁর চেয়ে অধিক ইলম অন্বেষণকারী আর কেউ ছিল না।' ইলম হাছিলের উদ্দেশ্যে তিনি তৎকালীন বিশ্বের বড় বড় কেন্দ্র যথা: মক্কা, মদীনা, শাম, মিশর, ইয়ামান, কুফা, বসরা, জাযীরা প্রভৃতি এলাকা ভ্রমণ করেন।

তিনি ছিলেন হাদীস শাস্ত্রেরও ইমাম। ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহর উস্তাদ ইমাম আলী ইবনে মাদীনী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইলম দুই ব্যক্তি পর্যন্ত গিয়ে সমাপ্ত হয়েছে। একজন হলেন আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক। দ্বিতীয় জন ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন।"

তিনি ফিকাহ শাস্ত্রেরও ইমাম ছিলেন। ইয়াহহিয়া বিন আদম বলেন, "আমি যখন সূক্ষ্ম মাসআলাসমূহ তালাশ করি এবং তা ইবনুল মুবারকের

রচনাবলীতে না পাই, তখন আমি তা অন্য কোথাও পাওয়ার ব্যাপারে হতাশ হয়ে যাই।" এই ছিল ফিক্‌হ শাস্ত্রে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহিমাহুল্লাহর স্থান। কিন্তু তাঁর এই পর্যায়ে পৌঁছা কোন্ মহান ব্যক্তিত্বের অনুগ্রহের ফসল ছিল তা তাঁর মুখ থেকেই শুনুন। তিনি বলেন,"আমি ফিক্‌হ ইমাম আবু হানীফা থেকে অর্জন করেছি।"

এই মহান ব্যক্তিত্বের জীবনের একটি উজ্জ্বল দিক হলো তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পাশাপাশি একজন অসম সাহসী বীরপুরুষও ছিলেন। জীবনের বিপুল সময় তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী এলাকাসমূহে কাফিরদের সাথে জিহাদ করে কাটিয়েছেন। তাঁর জীবনীতে পাওয়া যায় তিনি "ত্বরাসূস" নগরীতে বহুবার জিহাদের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। জিহাদের ময়দানে তিনি ছিলেন একজন পরীক্ষিত বীর সেনানী। তাঁর সহযোদ্ধাগণ জিহাদের ময়দানে তাঁর অসাধারণ বীরত্বের চমকপ্রদ ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন।

আবদাহ বিন সুলায়মান মারওয়াঝী বলেন, আমরা রোমের ভূ-খণ্ডে ইবনে মুবারকের সাথে এক বাহিনীতে ছিলাম। এক সময় আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মুখোমুখি হলাম। উভয়পক্ষ সারিবদ্ধ হল। এমন সময় শত্রু সৈন্যের এক ব্যক্তি বের হয়ে এসে আমাদেরকে দ্বৈতযুদ্ধের আহ্বান করল। তখন আমাদের সারি থেকে এক ব্যক্তি বের হলেন এবং লোকটিকে হত্যা করলেন। শত্রু সারি থেকে দ্বিতীয় আরেকজন বের হয়ে আসল। তিনি তাকেও হত্যা করলেন। তৃতীয় জন আসলে তাকেও হত্যা করলেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে মোকাবেলার জন্য আহ্বান করতে লাগলেন। শত্রু সারি থেকে চতুর্থ এক ব্যক্তি বের হয়ে আসল। তিনি তার সাথে

কিছুক্ষণ লড়াই করার পর তাকেও হত্যা করলেন। তখন লোকেরা তাঁকে দেখবার জন্য ভীড় করতে লাগল কিন্তু তিনি তার পরিধেয় বস্ত্রের প্রান্ত দ্বারা তার মুখ ঢেকে রাখছিলেন। আমি তার কাপড়ের প্রান্ত ধরে টান দিলাম, ফলে তার মুখ অনাবৃত হয়ে গেল। দেখলাম, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক। এজাতীয় বীরত্বের ঘটনা আরো বহু আছে। এক ময়দানে তিনি এরূপ দ্বৈতযুদ্ধে একের পর এক ছয়জন রোমান বীরকে হত্যা করেন।

যাইহোক, একবার বিখ্যাত আবেদ হযরত ফুযাইল বিন ইয়াজ রাহিমাহুল্লাহ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ কে বাইতুল্লায় এসে রমযান মাসে নফল উমরাহ, সুন্নত ইতিকাফ করার পরামর্শ দিয়ে চিঠি লিখেন। কেননা বাইতুল্লায় এক রাকাত নামায আদায় করলে এক লক্ষ রাকাতের সওয়াব হয়। কাবাঘরের দিকে তাকালে প্রতি পলকে এক লক্ষ নেকী। সেখানে গেলে ঈমান চাঙ্গা হয়। সারা দুনিয়ার আল্লাহর ওলীরা এখানে আসেন, তাঁদের সোহবত মিলবে। রমযান মাসে তো সওয়াবের কোনো হিসাবই নেই। তাছাড়া মদীনা শরীফে এক ওয়াক্ত নামাযে পঞ্চাশ হাজার রাকাতের সাওয়াব মিলবে। আল্লাহর রাসূল ﷺ এখানে আছেন। তাঁর সোহবতে থাকা যাবে। তাই এত লাভের আমল ছেড়ে এত কষ্ট করে জিহাদের ময়দানে থাকার কী দরকার!

জবাবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ এক ঐতিহাসিক চিঠি লিখেন। তিনি লিখেন,

ওহে হারামাইনের আবেদ ব্যক্তি!

যদি তুমি আমাদের অবস্থা দেখতে তবে বুঝতে যে, তুমি ইবাদতের ব্যাপারে খেল তামাশায় নিমজ্জিত আছো।

যদি কারো গলদেশ চোখের পানিতে সিক্ত হয়, তবে আমাদের বুক রক্তে রঞ্জিত হয়।

কেউ যদি কল্পনার রাজ্যে তার ভাবনার ঘোড়াকে ক্লান্ত করে, তবে আমাদের ঘোড়াসমূহ যুদ্ধের দিনে পরিশ্রান্ত হয়।

তোমাদের জন্য রয়েছে "আবীরের" সুবাস আর আমাদের আবীর হলো 'ঘোড়ার খুরের আঘাতে উত্থিত সুবাসিত ধূলা।

(খোদার কসম!) আমাদের নিকটে আমাদের নবীর সত্য ও সঠিক বাণী পৌঁছেছে যে, আল্লাহর পথের ধূলা ও জাহান্নামের আগুন কখনো মুজাহিদের নাসারন্ধ্রে একত্রিত হবেনা।

আল্লাহর কিতাব আমাদের মাঝে সত্যকথা বলে, আল্লাহর পথের শহীদ কখনো মৃত নয়।

চিঠিটি হাতে পেয়ে হযরত ফুযাইল রাহিমাহুল্লাহ কান্না শুরু করে দেন এবং বলেন, ইবনুল মুবারক আমাকে অনেক নসীহত করেছে! সে সত্য বলেছে।

এই চিঠিটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষতঃ চিঠিটির প্রথম স্তবকটি আবেদ ব্যক্তিদের জন্য অনেক বড় একটি নসীহত। মক্কা-মদীনার হেরেম শরীফে ইবাদত করা, সেখানে ইতিকাফ করা, আল্লাহর

রাসূলের রওযা মুবারকে জীবনে একবার অন্ততঃ সালাম দিতে পারা কতই না সৌভাগ্যের বিষয়! কিন্তু যে সকল লোক জিহাদ ত্যাগ করে "হারামাইন শরীফাইন"-এ সওয়াবের আশায় যিন্দেগী কাটায় তাদের ব্যাপারে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহিমাহুল্লাহ কেন বললেন যে, "এরা ইবাদতের নামে আল্লাহ তাআলার সামনে মূলতঃ খেল-তামাশায় লিপ্ত", বিষয়টি আমাকে খুব ভাবিয়ে তুলে। বিষয়টি নিয়ে আমি (লেখক) অনেক চিন্তা ভাবনা করি- কেন আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহিমাহুল্লাহ একথা বললেন, আর তাঁর বন্ধু ফুযাইল রাহিমাহুল্লাহ কী বুঝে কাঁদলেন! আপনারা কি কিছু বুঝতে পেরেছেন???

বিষয়টি বুঝার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে খুব দুআ করতে থাকলাম, অবশেষে আল্লাহ তাআলার অশেষ অনুগ্রহে কিছু কথা বুঝে আসে। আল্হামদুলিল্লাহ!

তাই এই বিষয়ে কিছু লিখা প্রয়োজন মনে করছি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মোবারক রাহিমাহুল্লাহ হয়তো তাঁর বন্ধুকে এই কথাগুলোই বুঝাতে চেয়েছিলেন-

ইবাদত নিয়ে খেল-তামাশা!!!

❖ **ওহে ইবাদতকারী! ওহে 'আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি' অন্বেষণকারী!**

তোমার ইবাদতের লক্ষ্য কি? তোমার ইবাদতের লক্ষ্য যদি হয়ে থাকে "আল্লাহর সন্তুষ্টি", তাহলে তো তুমি ময়দানের ইবাদত করতে, কেননা, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো "তাঁর রাহে জিহাদ করা"।

দলীল: হযরত আবু সালেহ রদিয়াল্লহু আনহু বলেন, তাঁরা (কয়েকজন সাহাবী) আলোচনা করছিলেন, "যদি আমরা জানতে পারতাম, কোন্ আমলটি সর্বোত্তম বা আল্লাহ তাআলার নিকট অধিক পছন্দনীয়!" তখন নাযিল হলো..... يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ (৬১ সূরা ছফ:১০) আয়াতটি। (কিতাবুল জিহাদ, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ., পৃ. ৮১)

যদি তুমি সত্যিই ইবাদত করাকে ভালোবেসে থাক আর তুমি যদি এমন একটি ইবাদতের সন্ধানকারী হও, যেটিতে আল্লাহপাক তোমার উপর সর্বাধিক সন্তুষ্ট হবেন, এমন আমলের সন্ধান পেলে তুমি আমৃত্যু তা করে যেতে, তাহলে সে তো 'জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্'। কেননা, একবার কয়েকজন আনসারী সাহাবী, যাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রদিয়াল্লহু আনহুও ছিলেন, তাঁরা এমন একটি আমল তালাশ করছিলেন। তখন তাদের ব্যাপারেও যে আয়াতসমূহ নাযিল হয়, তা হলো সূরা ছফের আয়াতসমূহ। অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রদিয়াল্লহু আনহু শাহাদাত লাভের আগ পর্যন্ত জিহাদে লিপ্ত ছিলেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ

"নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ভালোবাসেন, যারা তাঁর পথে এমনভাবে সারিবদ্ধ হয়ে লড়াই করে, যেন তারা এক শিশাঢালা সুদৃঢ় প্রাচীর।" (৬১ সূরা ছফ: ০৪)

এক হাদীসে জীব্রীলে বর্ণিত আছে, "আল্লাহ তাআলা বান্দাদের তিনটি কাজ অত্যন্ত পছন্দ করেন, **এক.** জান-মাল খরচ করে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা, **দুই.** গোনাহের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ক্রন্দন করা এবং **তিন.** ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করতঃ ছবর করা।" (মুনাব্বেহাত, হাফেয ইবনে হজর রহ.)

❖ ওহে সওয়াব প্রত্যাশী!

তুমি যদি ইবাদত করে থাক অধিক সওয়াবের আশায়, তাহলে তোমার জানা উচিত ছিল, জিহাদই হলো সর্বোত্তম, লাভজনক ব্যবসা, অল্প পরিশ্রমে অনেক বেশি মুনাফা লাভ হয়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا۟ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ

"মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে উত্তম ব্যবসার সন্ধান দিব না....।"

(৬১সূরা ছফ:১০)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, আল্লাহর পথে একদিন সীমান্ত প্রহরা দেয়া হাজার দিন রোযা রাখা এবং হাজার রাত্রি ইবাদত করার চেয়ে উত্তম।

(তিরমিযী, নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ)

তিনি আরো ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি সীমান্ত প্রহরারত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, সে কবরের আযাব থেকে মুক্তি পাবে এবং তার সকল আমল সে যেভাবে করত, তার চেয়ে উত্তমভাবে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকবে।" (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,"যে আল্লাহর পথে (জিহাদের ময়দানে) একটি তাকবীর দিবে, কিয়ামত দিবসে তা মীযানে এমন পাথরের আকার ধারণ করবে, যা আসমান, যমীন ও তার মাঝের সবকিছুর চেয়ে বেশি ভারী হবে। আর যে আল্লাহর পথে উচ্চস্বরে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার" বলবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য 'মহাসন্তুষ্টি' লিখে দিবেন, তাকে মুহাম্মাদ ﷺ, ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম ও সকল নবীর সাথে একত্রিত করবেন।" (তানবীহুশ শরীয়াহ, খ. ২, পৃ. ১৭৮)

ফকীহ আবুল লাইস সমরখন্দী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "মহাসন্তুষ্টি"-এর ব্যাখ্যায় মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, তা আল্লাহ তাআলার দীদার। আবার কেউ বলেন, তা আল্লাহর এমন সন্তুষ্টি, যার পর তিনি অসন্তুষ্ট হবেন না।

একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি আমার সম্পদ দান করি, তাহলে কি আল্লাহর পথে মুজাহিদদের আমলে পৌঁছতে পারব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার সম্পদের পরিমাণ কত? লোকটি বলল, ছয় হাজার দিরহাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "যদি তুমি তা (সবটুকু) দান করে দাও, তবে তা আল্লাহর পথে মুজাহিদের ঘুমের সমানও হবে না।" (তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃ. ৪৩৮)

এক ব্যক্তি আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রদিয়াল্লহু আনহুর সাথে তাঁর বাগানে প্রবেশ করল। বাগানে প্রবেশ করে আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রদিয়াল্লহু আনহু ত্রিশটি গোলাম আযাদ করে দিলেন। লোকটি তা দেখে দারুন বিস্মিত হলো। তখন হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রদিয়াল্লহু আনহু বললেন, আচ্ছা, তাহলে কি আমি তোমাকে এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আমলের কথা বলে দিব? লোকটি বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, "যখন কেউ তার বাহন জন্তুতে আরোহন করে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য চলতে থাকে আর তার চাবুকটি আঙ্গুলে ঝুলানো থাকে। এমনি অবস্থায় ঝিমুনিতে তার চাবুকটি পড়ে যায়। তার চাবুকটি পড়ে যাওয়ার কারণে তাঁর যে কষ্ট হলো এবং তার পরিবর্তে সে যে সওয়াব পেল, তা আমি যা দান করেছি, তার চেয়ে অনেক বেশি।" (তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃ. ৪৩৮)

❖ ওহে হেরেম শরীফের আবাদকারী!

যদি তুমি প্রতি রাকাতে এক লক্ষ রাকাতের সওয়াবের প্রত্যাশায় কাবার আঙিনায় নামায আদায় করে থাকো, তাহলে জেনে নাও, আমি অন্ধকার গুহায় নামায আদায় করে প্রতি রাকাতে দুই লক্ষ রাকাতের সাওয়াব লাভ করছি। কেননা, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "মসজিদে হারামে নামায আদায় করা এক লক্ষ বার নামায আদায় করার চেয়ে উত্তম। আর আল্লাহর পথে (জিহাদে) একবার নামায আদায় করা দুই লক্ষ বার নামায আদায়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।" (তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃ. ৪৩২)

হযরত আবু হুরাইরা রদিয়াল্লহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কোন্ কাজটি সবচেয়ে উত্তম? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনা।" (আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে সবচেয়ে বেশি মহব্বত করা এর মাঝে অন্তর্ভূক্ত)। আবারো জিজ্ঞাসা করা হলো, এরপর কোন্ কাজটি উত্তম? নবীজী ﷺ উত্তর দিলেন, "এরপরে উত্তম হচ্ছে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।" পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হলো, এরপর কোন্টি উত্তম? প্রিয় নবীজী ﷺ উত্তর দিলেন, "এরপর হচ্ছে, মাবরূর (মকবুল) হজ্জ।" (বুখারী-২৬, মুসলিম-৮৩)

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاجِّ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَجَاهَدَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لاَ يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لاَ يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ

"তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো ও কাবা ঘর আবাদ করাকে সে ব্যক্তির কাজের সমপর্যায়ের মনে করো- যে ঈমান আনে আল্লাহ তাআলার উপর, পরকালের উপর এবং জিহাদ করেছে আল্লাহ তাআলার রাস্তায়; এরা কখনো আল্লাহর কাছে সমান নয়; আল্লাহ তায়ালা কখনো যালেমদের সঠিক পথ দেখান না।" (৯ সূরা তাওবা: ১৯)

অতএব, বন্ধু! কাবাঘর আবাদ করেও যদি একজন মুজাহিদের সমান না হতে পার, তাহলে পৃথিবীর কোথায় ইবাদত করে তুমি তার সমান হতে পারবে?

❖ ওহে আল্লাহর ভয়ে ভীত পরহেযগার ব্যক্তি!

যদি তুমি আল্লাহ তাআলার শাস্তির ভয়ে ইবাদত করে থাক, তাহলে জেনে নাও, শাস্তি থেকে বাঁচার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। আবার আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ধমকি শুনে রাখ! যেই আযাব থেকে তুমি পালাতে চাচ্ছ, জিহাদ ত্যাগ করার কারণে সেই আযাবই তোমাকে গেপ্তার করবে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَارَةٖ تُنجِيكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ- تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡ

"হে মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে উত্তম ব্যবসার সন্ধান দিব না, যা তোমাদেরকে রক্ষা করবে মর্মন্তুদ শাস্তি হতে, উহা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে।"(৬১ সূরা সফ: ১০-১১)

إِلاَّ تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴿٣٩﴾

"তোমরা যদি (তাঁর পথে জিহাদের জন্য) বের না হও, তাহলে (এ জন্যে) তিনি তোমাদের কঠিন শাস্তি দিবেন এবং তোমাদের অন্য এক জাতি দ্বারা বদল করে দিবেন, তোমরা তার কোনই অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না, আল্লাহ তাআলা সব কিছুর উপর ক্ষমতাশীল।" (০৯ সূরা তাওবা: ৩৯)

❖ ওহে ইবাদতে কল্যাণ প্রত্যাশী!

যদি তুমি কামনা করে থাক, ইবাদতের দ্বারা দ্রুত কল্যাণ লাভ হোক, তাহলে জিহাদই সবচেয়ে দ্রুত কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসে।

ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

"এটা (জিহাদ) তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা বুঝতে।" (৬১ সূরা সফ:১১)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

"তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। হতে পারে একটা বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা কোনো একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দীয়, অথচ তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহ তাআলাই জানেন, তোমরা জান না। " (২ সূরা বাকারা: ২১)

❖ ওহে আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী!

যদি তুমি চাও, ইবাদতের দ্বারা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি হাসিল করে তোমার গুনাহ মাফ করাবে, তাহলে তোমার জন্য জিহাদই ছিল গুনাহ মাফের সবচেয়ে সহজ উপায়।

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

"(যদি তোমরা জিহাদ কর) তাহলে তিনি তোমাদেরকে মাফ করে দিবেন।" (৬১ সূরা সফ:১০)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহ তাআলা শহীদকে ছয়টি পুরস্কার দান করবেন। ১. রক্তের প্রথম ফোটাটি মাটিতে পড়ার সাথে সাথে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়......." (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ শরীফ)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,"ঋণ ব্যতীত আল্লাহ তাআলা শহীদের সব কিছু (পাপ) মাফ করে দিবেন।" (মুসলিম- ১৮৮৬)

❖ ওহে জান্নাতের আকাঙ্ক্ষাকারী!

যদি তুমি ইবাদতের দ্বারা জান্নাত প্রত্যাশী হও, তাহলে জেনে রাখ, জান্নাতে যাওয়া এতো সহজ নয়, আল্লাহ তাআলা বান্দাকে জান্নাতে দেয়ার আগে অবশ্যই জেনে নিবেন, কে জিহাদ করেছে, আর কে জিহাদ করেনি। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তোমার আমল তোমার কোনো কাজে আসবে না।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جاهَدُواْ مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِرِينَ

"তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ তাআলা এখনও দেখেননি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্য্যশীল।" (৩ সূরা আলে ইমরান: ১৪২)

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ أَلآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ

"তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, অথচ সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করনি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের উপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। আর এমনিভাবে শিহরিত হতে হয়েছে যাতে নবী ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তাঁদেরকে পর্যন্ত একথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য? তোমরা শুনে নাও, আল্লাহর সাহায্য একান্তই নিকটবর্তী। (২ সূরা বাকারা: ২১৪)

وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنَّاتِ عَدْنٍ ذٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

"(যদি তোমরা জিহাদ কর তাহলে) তোমাদেরকে দাখিল করবেন এমন এক জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং বসবাসের জান্নাতে উত্তম বাসগৃহে। এটাই মহাসাফল্য।" (৬১ সূরা সফ: ১২)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

اِنَّ اَبْوَابَ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ

"নিঃসন্দেহে জান্নাতের দরজাসমূহ তরবারীর ছায়াতলে অবস্থিত।"

তিনি ﷺ আরো ইরশাদ করেন, "যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে তাদের জন্য জান্নাতে একশতটি স্তর রয়েছে, প্রতিটি স্তরের পার্থক্য আসমান-যমীনের সমান। সুতরাং তোমরা যখন আল্লাহ তাআলার কাছে চাইবে, জান্নাতুল ফিরদাউস চাইবে।" (বুখারী)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "মুসলিম মিল্লাতের অন্তর্ভূক্ত যে কোনো ব্যক্তি ক্ষণকালের জন্যও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে।" (আবু দাউদ-২২১৬/২৫৪১, তিরমিযী-১৬৫৭)

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো ইরশাদ করেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা এক তীর দ্বারা তিনজনকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

১. তীর নিক্ষেপকারীকে।
২. সওয়াবের প্রত্যাশায় তীর প্রস্তুতকারীকে।
৩. যুদ্ধের সময় যে তীর পরিচালনাকারীর নিকট তীর এগিয়ে দেয়, তাকে। (তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃ.৪৪০)

❖ **ওহে আল্লাহর বান্দা!** তুমি যে জান্নাত কামনা করছ, তুমি কি এখন পর্যন্ত তোমার জানকে আল্লাহ তাআলার কাছে বিক্রয় করতে পেরেছ?

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِى ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلْإِنْجِيلِ وَٱلْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

"আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে, অতঃপর মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক (সত্যবাদী)? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেনদেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হল মহান সাফল্য।"

(৯ সূরা তাওবা: ১১১)

❖ **ওহে আবেদ ব্যক্তি!**

বন্ধু! তাহলে তুমি জান্নাত থেকে কত পিছনে পড়ছ? একটু চিন্তা কর। রাসূলুল্লাহ ﷺ মূতার যুদ্ধের জন্য তিনজন সেনাপতি ঠিক করে দেন। যদি হযরত যায়েদ রদিয়াল্লহু আনহু শহীদ হন, তাহলে পতাকা তুলে নিবেন হযরত জাফর রাদিয়াল্লহু আনহু, যদি তিনিও শহীদ হন তাহলে পতাকা তুলে নিবেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রদিয়াল্লহু আনহু, যদি তিনিও

শহীদ হন তাহলে মুসলমানরা একজনকে ঠিক করে নিবে কে প্রধান সেনাপতি হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই উক্তি শুনে সবাই বুঝে গেলেন, এই তিনজনই যুদ্ধে শহীদ হবেন। যেদিন সকালে জামাত যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে গেল, সেদিন ছিল শুক্রবার, জুমুআর দিন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রদিয়াল্লহু আনহু চিন্তা করলেন, এই যুদ্ধে যদি শহীদ হয়ে যাই, তাহলে তো আল্লাহর রাসূলের ﷺ চেহারা মুবারক আর কখনো দেখা হবে না, তাঁর পিছনে আর কোনোদিন নামায আদায় করতে পারবো না, তাহলে এক কাজ করি, জুমুআর নামায আল্লাহর রাসূলের পিছনে আদায় করে, পরে বেরিয়ে পড়ব। আর যেহেতু আমার ঘোড়া অনেক দ্রুতগামী, তাই অন্যদের সাথে সহজেই জুড়তে পারব।

আল্লাহর রাসূল ﷺ জুমুআর নামাযের সালাম ফিরানোর পর দেখলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রদিয়াল্লহু আনহু এখনো বের হননি। ফলে তিনি মনঃক্ষুণ্ন হলেন এবং তাঁর পিছনে পড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রদিয়াল্লহু আনহু বললেন, আমি চেয়েছিলাম, আমি আমার জীবনের শেষ আরেকটি ওয়াক্ত নামায আপনার পিছনে পড়তে, আপনাকে তো আর কখনো দেখতে পারবো না, তাই ভাবলাম আমার ঘোড়া তো অনেক দ্রুতগামী, আপনার পিছনে জুমুআর নামায আদায় করে যারা সকালে বেরিয়েছে তাদের ধরে ফেলতে পারবো। তখন নবীজী ﷺ আফসোস করে বললেন, "যারা সকালে বের হয়েছে, তারা তোমার চেয়ে পাঁচশত বছর আগে জান্নাতে চলে গেল। তুমি দুনিয়ার সব কিছু ব্যয় করলেও তাদের সকালে বের হয়ে যাওয়ার সমান ফযীলত পাবে না।" (তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ)

আরেকবার রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "আল্লাহর রাস্তায় এক সকাল বা এক বিকাল কাটানো দুনিয়া ও দুনিয়ার সমুদয় বস্তু হতে শ্রেষ্ঠ। আর জিহাদের সারিতে (কিছুক্ষণের জন্য হলেও) কারো অবস্থান করা ষাট বছর ইবাদতে কাটানোর চেয়ে উত্তম।" (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ)

❖ ওহে ঘরে উপবিষ্ট মিসকিন!

আল্লাহর রাসূলের পিছনে মসজিদে নববীতে জুমুআর নামায আদায় করে, তাঁর চেহারা মোবারক দর্শন করেও যদি আল্লাহর রাস্তায় এক সকাল দেরী করার কারণে পাঁচশত বছর পিছিয়ে পড়তে হয়, সারা দুনিয়ার সকল সম্পদ দান করেও তার সমান ফযীলত হাছিল করতে না পারা যায়, তাহলে চিন্তা করে তুমিই বল, তুমি তো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বেরই হওনি, তাহলে তুমি ঘরে বসে থেকে তোমার স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পতি দান করে দিলেও কি একজন মুজাহিদের এক সকাল কিংবা এক বিকালের ফযীলত হাছিল করতে পারবে? জান্নাত থেকে তুমি কত হাজার বছর পিছিয়ে পড়ছো, তা কি একবার চিন্তা করে দেখেছো?

❖ ওহে, স্ত্রীর আচলের ছায়ায় আশ্রয়গ্রহণকারী ব্যক্তি!

বন্ধু! তুমি যদি কাবা ঘরের ছাদের ছায়ায় দাঁড়িয়েও কেয়ামত পর্যন্ত নামায আদায় কর, তাহলেও তুমি 'ঘরে উপবিষ্ট' ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত হবে। হও না তুমি কাবাঘরের ইমাম, হও না তুমি মসজিদে নববীর ইমাম, হও না তুমি 'হারামাইন শরীফাইন'-এর দরস্ দানকারী মুহাদ্দিস, মুফাস্সির কিংবা গ্র্যান্ড মুফতী!

জিহাদ 'ফরযে আইন' হওয়ার পরও যদি তুমি ঘরে বসে থাক, তাহলে কুরআনের ভাষায় তুমি 'ক্বয়ীদূন' (গৃহে উপবিষ্ট মুসলমান)! আর এ ধরণের ব্যক্তিরা কখনোই আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীদের সমকক্ষ হবে না।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

لاَّ يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِى ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَاهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَاهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً- دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً

"৯৫. গৃহে উপবিষ্ট মুসলমান- যাদের কোনো সঙ্গত ওযর নেই এবং ঐ সব মুসলমান যারা জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে, তারা সমান নয়। যারা জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে, আল্লাহ তাদের পদমর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন গৃহে উপবিষ্টদের তুলনায় এবং প্রত্যেকের সাথেই আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ মুজাহেদীনকে উপবিষ্টদের উপর মহান প্রতিদানে শ্রেষ্ঠ করেছেন।

৯৬. এগুলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে পদমর্যাদা, ক্ষমা ও করুণা; আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।" (৪ সূরা নিসা :৯৫-৯৬)

❖ ওহে, দুনিয়ার গোলাম!

বন্ধু! কষ্ট পেয়ো না! বাস্তব কথা! আমরা আল্লাহর জন্য দুনিয়ার সব ত্যাগ করেছি। স্নেহের মা-বাবা, প্রাণপ্রিয়া স্ত্রী, কলিজার টুকরা সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোন, ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা, বাড়ি-গাড়ি, চাকুরী-ব্যবসা, সব। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দুনিয়ার গোলামী থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আমরা বান্দার দাসত্ব-শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে এক আল্লাহর হুকুম পালন করছি, তাঁর গোলামী করছি, তাঁর জন্য বুকের রক্ত ঢেলে দিচ্ছি। আর জিহাদ 'ফরযে আইন' হওয়া সত্ত্বেও তুমি ঘরের মহব্বত, পরিবারের মহব্বত, মালের মহব্বত, চাকুরী-ব্যবসার (পেশার) মহব্বত ছাড়তে পারছ না। দুনিয়ার গোলামী থেকে 'আযাদ' হতে পারছ না। বল, তুমি আসলে কার গোলামী করছ, আল্লাহ তাআলার, নাকি নফ্‌স ও দুনিয়ার?

❖ ওহে আবেদ ব্যক্তি!

শুনে নাও, আল্লাহর রাস্তার ধূলাবালিও তো ঘরে বসে ইবাদত করা অপেক্ষা অধিক মূল্যবান। কেননা, তা জাহান্নামের আগুনকে নিভিয়ে দিবে। আর তোমার ঘরের ইবাদত তোমার জন্য জাহান্নামের আগুনকে নিভাতে পারবে কিনা তার তো কোনো নিশ্চয়তা নেই। আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন,"কোনো বান্দার মাঝে কখনো আল্লাহর পথের ধূলি ও জাহান্নামের ধোঁয়া একত্রিত হবে না।" (তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ)

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো ইরশাদ করেন, "আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) বান্দার দুটি পা ধূলি ধূসরিত হবে এবং আবার তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে, এমনটি কখনো হতে পারে না।" (বুখারী-২৮১১)

নবী করীম ﷺ আরো বলেন, "আল্লাহ তাআলার রাস্তার ধূলাবালি ও জাহান্নামের ধোঁয়া কখনও কোনো মুসলমানের নাকের ছিদ্রে একত্র হতে পারে না।" (নাসাঈ)

❖ ওহে বৃদ্ধ! ওহে অক্ষম! ওহে যৌবনের আড়ালে যার বার্ধক্যের কঙ্কাল!

তোমার ঘরের ইবাদত আল্লাহর কাছে ততটা মূল্যবান নয়, যতটা একজন মুজাহিদের ক্রীড়া-কৌতুক আল্লাহর কাছে মূল্যবান।

নবী করীম ﷺ বলেছেন, "তোমরা তীর চালনা ও অশ্বারোহন প্রশিক্ষণ নাও। আর আমার নিকট অশ্বারোহনের চেয়ে তীর চালনার প্রশিক্ষণ নেয়া অধিক প্রিয় ও উত্তম। আর মুমিনের তিনটি বিষয় ছাড়া সকল ক্রীড়া-কৌতুকই বাতিল, অসার।

১. স্বজাতি রক্ষার উদ্দেশ্যে তীর প্রশিক্ষণ দেয়া।

২. যুদ্ধের জন্য অশ্বকে প্রশিক্ষণ দেয়া।

৩. স্ত্রীর সাথে ক্রীড়া-কৌতুক ও স্ফূর্তি করা।

আর নিশ্চয় এগুলো সত্য ও চির বাস্তব। (তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ, দারিমী)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,"শুনে নাও! তীর নিক্ষেপই শক্তি। তীর নিক্ষেপই শক্তি। তীর নিক্ষেপই শক্তি।" (মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ, দারিমী)

হযরত মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লহু আনহুকে এক কাপড় পরিহিত অবস্থায় দুটি লক্ষ্যবস্তুর মাঝে দৌড় প্রশিক্ষণ নিতে দেখেছি।

হযরত হুযাইফা রাদিয়াল্লহু আনহু এক কাপড় পরিহিত অবস্থায় দুটি লক্ষ্যবস্তুর মাঝে দৌড় প্রশিক্ষণ নিতেন। (তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃ. ৪৪১)

❖ ওহে যার যৌবনরস ফুরিয়ে গেছে! যার শৌর্য-বীর্য শুকিয়ে গেছে! আমাদের আছে ইয্যতের যিন্দেগী আর তোমাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা!

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "উট তার মালিকের জন্য সম্মানের বিষয়। বকরী বরকতময়। আর ঘোড়ার কপালে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত কল্যাণ বেঁধে দেয়া হয়েছে।" (বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী, নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ, দারিমী।)

তিনি ﷺ আরো ইরশাদ ফরমান, "ঘোড়ার ললাটে ইয্যত রয়েছে। আর গরুর লেজে রয়েছে লাঞ্ছনা।"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রদিয়াল্লহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "যখন তোমরা ক্রয় বিক্রয় এবং ব্যবসা বাণিজ্যে পুরাপুরি মশগুল হয়ে যাবে এবং গরুর লেজ ধরে খেত খামারে মগ্ন হয়ে যাবে আর জিহাদ করা ছেড়ে দিবে তখন আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর এমন অপমান চাপিয়ে দিবেন, যা ততক্ষণ পর্যন্ত দূর হবে না যতক্ষণ না তোমরা আপন দ্বীনের দিকে ফিরে আসবে।" (আবু দাউদ)

অর্থাৎ মানুষ যখন জিহাদে লিপ্ত হবে, তখন তাতে ইসলাম ও মুসলমানদের ইয্যত ও মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে, বিশ্বের নেতৃত্বের আসনে তারা সমাসীন থাকবে। আর যখন জিহাদ পরিত্যাগ করে গরুর লেজের অনুসরণ করবে, লাঙ্গল-জোয়াল নিয়ে ক্ষেত-খামারে লিপ্ত হবে, তখন মুসলমান জাতি হবে লাঞ্ছিত, অপদস্থ। যেমনটি হচ্ছে বর্তমান বিশ্বে, পৃথিবীর প্রতিটি আনাচে কানাচে।

❖ বন্ধু হে! তুমি কি তোমার নিজের অস্তিত্বকে ভালোবাস না?

তোমরা মৃত্যুবরণ করলে মাটি তোমাদের দেহকে শেষ করে ফেলবে, তোমার সুন্দর চেহারা, শুভ্র ত্বক, কাজল কালো চোখ, সুউচ্চ নাসিকা, বলিষ্ঠ দেহ, এগুলো তো হবে কীট আর পোকা-মাকড়ের আহার্য? কিন্তু আমরা? আমাদের দয়াবান প্রভু আমাদের দেহকে কবরের মাটি আর পোকা-মাকড়ের জন্য হারাম করেছেন। একটি পশমও তারা স্পর্শ করবে না। তাছাড়া আমরা কবরে অনন্ত জীবন লাভ করবো, তোমরা কি মৃত্যুর সাথে সাথে ফানী (ধ্বংস) হয়ে যাবে না?

❖ **ওহে! শুনে রাখ!** তোমরা মরলে তোমাদের লাশগুলো পঁচে যায়, দুর্গন্ধময় হয়ে যায়, আর আমাদের রক্ত থেকে মেশক-আম্বর নয়, বরং এক অপার্থিব সুবাস বেরিয়ে আসে।

❖ **ওহে তুমি কি মনে করছো, এখনতো আমরা দুর্বল, শারীরিক সক্ষমতা নেই, অর্থ সম্পদ নেই, অস্ত্র-শস্ত্র নেই, জিহাদ করবো কিভাবে?**

আল্লাহ তাআলা কি বলেননি যে,

ٱنْفِرُواْ خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

"তোমরা বের হয়ে পড়, হালকা বা ভারী সরঞ্জামের সাথে এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে, এটি তোমাদের জন্যে অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার।" (০৯ সূরা তাওবা: ৪১)

ইমাম কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ 'হালকা বা ভারী' এর দশটি অর্থ করেছেন।

১. জ্ঞান-বুদ্ধিতে পরিপক্ক হও/যুদ্ধের ট্রেনিং থাকুক (হালকা) কিংবা অপরিপক্ক/যুদ্ধের ট্রেনিং না থাকুক (ভারী)।
২. যুবক হও (হালকা) কিংবা বৃদ্ধ (ভারী)।
৩. আগ্রহ থাকুক (হালকা) বা না থাকুক (ভারী)।
৪. ধনী হও (হালকা) কিংবা গরীব (ভারী)।
৫. ব্যস্ত হও (ভারী) কিংবা অবসরে থাক (হালকা)।
৬. কোনো কাজ থাকুক (যা ত্যাগ করতে তুমি অনিচ্ছুক) (ভারী) বা না থাকুক (হালকা)।
৭. পরিবার-পরিজন থাকুক (ভারী) বা না থাকুক (হালকা)।
৮. পদাতিক (ভারী) কিংবা অশ্বারোহী (হালকা)।
৯. যুদ্ধে সামনে কাতারে থাক (ভারী) কিংবা পিছনের কাতারে (হালকা)।
১০. সাহসী বীরপুরুষ হও (হালকা) কিংবা ভীরু কাপুরুষ (ভারী)।

ওহে! তুমি এগুলোর বাহিরে কোন্ দলে আছ? তোমার পালানোর কোনো সুযোগ আছে কি?

قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُوْلِى بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْراً حَسَناً وَإِن تَتَوَلَّوْاْ كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً ﴿١٦﴾ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَاباً أَلِيماً ﴿١٧﴾

“১৬। গৃহে অবস্থানকারী মরুবাসীদেরকে বলে দিন: আগামীতে তোমরা এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধ করতে আহুত হবে। তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা মুসলমান হয়ে যায়। তখন যদি তোমরা নির্দেশ পালন কর, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দিবেন। আর যদি পৃষ্ঠপ্রদর্শন কর যেমন ইতিপূর্বে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছ, তবে তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন। ১৭। (কেবল) অন্ধের জন্যে, খঞ্জের জন্যে ও রুগ্নের জন্যে (জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের না হলে) কোনো অপরাধ নেই, এবং যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে তাকে তিনি জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে, তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন।” (৪৮ সূরা ফাত্‌হ)

❖ ওহে আবেদ ব্যক্তি! তুমি ফরয বাদ দিয়ে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতে মগ্ন হয়ে আছো না তো? এতো ইবাদতের পরও তুমি ফরয তরককারী ফাসেক হয়ে যাচ্ছ নাতো?

শয়তান বিভিন্ন সুরতে মানুষকে ধোকা দিয়ে থাকে। সে আলেমকে ইলমের জালে, আবেদকে ইবাদতের জালে, জাহেলকে জাহেলিয়াতের জালে, গুনাহগারদের গুনাহের জালে, মেহনতের সাথীদেরকে মেহনতের ধোকায় এবং নেককারদেরকে নেক সুরতে ধোকায় ফেলে।

কোন্ ইল্ম অধিক গুরুত্বপূর্ণ, সর্বাগ্রে অর্জন করা প্রয়োজন, ইলম অনুযায়ী আমলের গুরুত্ব- এসব বিষয়ে শয়তান একজন আলেমকে গাফেল রাখে। একজন আলেমের সামনে শয়তান শুধু ইলম অর্জনের ফায়দা সম্বলিত হাদীসসমূহ তুলে ধরে, ফলে ঐ আলেম ব্যক্তিকে শয়তান বুঝাতে সক্ষম হয়, 'আমি তো আল্লাহর রাসূলের ওয়ারিশ', ফলে তার অর্জিত ইলমের উপর সন্তুষ্টি চলে আসে, তখন সে তার নিজের যিন্দেগী নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ পায়না। যতটুকু ইলম হাছিল হলো তাতেই তার আত্মতৃপ্তি চলে আসে।

ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে দুটি বিষয় মনে রাখতে হবে, তা হলো-

এক. যে ইলম অর্জন করা অন্য সকল প্রকার ইলম হাছিলের উদ্দেশ্য (মাক্সাদ), যেমনঃ আল্লাহ তাআলার মারেফাত, তাঁর মহব্বত, আল্লাহর রাসূলের মহব্বত, আখিরাতের স্মরণ অন্তরে সৃষ্টি করা এবং আল্লাহর রাসূলের যিন্দেগীর পরিপূর্ণ অনুসরণ করে নিজের যিন্দেগীকে গড়া- এগুলো হলো সকল ইলম হাসিলের মূল মাক্সাদ।

দুই. মূল মাক্সাদে পৌঁছার জন্য সহকারী ইল্ম হাসিল করা, যেমনঃ আরবী ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণ, নাহু-ছরফ, ফিকাহ, তাফসীর, হাদীসশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে ইল্ম অর্জন করা।

এক্ষেত্রে শয়তান যে কাজটি করে তা হলো, একজন তালীবুল ইলমকে (ছাত্রকে) কিংবা একজন আলেমকে মূল মাকসাদের কথা ভুলিয়ে মাক্সাদ হাছিলের ইলমের পিছনেই আজীবন লাগিয়ে রাখে। যার ফলে সে ইল্মের জাহাজ হওয়া সত্ত্বেও তার যিন্দেগীর সাথে আল্লাহর রাসূলের যিন্দেগীর কোনো মিল পাওয়া যায় না। শাইখুল হাদীস, শাইখুল কুরআন কিংবা শাইখুল ইসলাম হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর রাসূলের কিংবা সাহাবাদের মেজাজের সাথে তার মেজাজের কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। মানুষের কাছে অনেক বড় আলেম হিসেবে পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার মহব্বত আর মৃত্যুর ভয় তার দীল থেকে দূর হয় না, যার কারণে আল্লাহ তাআলার কাছে তার ইলমের কোনো মূল্য থাকে না। কেননা যে ইল্মের দ্বারা দীল থেকে দুনিয়া দূর হয় না, মৃত্যুর মহব্বত পয়দা হয় না, আল্লাহকে পাওয়া যায় না, সে ইল্ম তো ইল্ম নয়, জাহেলিয়াত! আল্লাহর রাসূলের

যিন্দেগী ও মেজাজের সাথে মিল না থাকায়, দীনের সর্বত্র তার বিচরণ থাকে না। আল্লাহ তাআলা আমাদের পথ দেখান।

শয়তান জাহেলদের অন্তরে অজ্ঞতার মহব্বত পয়দা করে দেয়। ফলে দীনের ইলম হাসিল করা তাদের নিকট অসম্ভব বিতৃষ্ণার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। যার কারণে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ইলম হাছিল করার জন্যও তার সময় হয়ে উঠে না। দুনিয়ার নানা ব্যস্ততা দেখিয়ে সে অন্ধ থাকতেই পছন্দ করে।

শয়তান গুনাহগারদেরকে যে ধোকা দেয়া হয় তা তো স্পষ্ট, শয়তান মানুষের অন্তরে "অমুক গুনাহ কর্!" "তমুক গুনাহ কর্", "ঐ গুনাহটা মনে হয় আরো আনন্দদায়ক, উপভোগ্য", এই ধরণের ওস্ওয়াসা দিতেই থাকে। ফলে সে একটা গুনাহ করে কখনো পরিতৃপ্ত হতে পারে না, বরং একটি গুনাহ করার পর আরো বড় গুনাহ করার প্রতি তার আগ্রহ ও লোভ পয়দা হয়। একটি গুনাহের কারণে অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। এভাবে গুনাহ করতে করতে তার দীল অন্ধকার রাত্রির ন্যায় কালো হয়ে যায়। ফলে ইবাদত বন্দেগী তার কাছে হলাহল বিষতুল্য বোধ হয়। তাই তার কপালে তাওবা নসীব হয়না।

কিন্তু যাদের ব্যাপারে শয়তান জানে যে, এই লোকগুলোকে দিয়ে কোনোভাবেই গুনাহের কাজ করানো সম্ভব নয়, যারা পরহেযগার 'আবেদ' শ্রেণি, তাদেরকে কী শয়তান হতাশ হয়ে ছেড়ে দেয়? কোনো ওস্ওয়াসা দেয় না? শয়তান জানে যে, এদেরকে যদি বলা হয়, জিনা (ব্যভিচার) কর্, এরা জীবন চলে যাবে কিন্তু জিনা করবে না, যদি বলা হয়, 'সুদ খা, ঘুষ খা', এরা না খেয়ে মরবে কিন্তু সুদ-ঘোষের ধারে কাছেও যাবে না। তাহলে

এদের কী করা? শয়তান এদেরকে যে কাজটি করে তা হলো, "ইবাদত-ই যখন করবে, কম সওয়াবের ইবাদতে লিপ্ত থাক, অধিক দামী ইবাদত না করে কম সওয়াবের ইবাদতে লিপ্ত থেকে যিন্দেগী পার করে দাও।" কম সওয়াবের আমলের ফায়দা ও ফাযায়েল সম্বলিত হাদীসগুলোকে শয়তান তার সামনে তুলে ধরে। ফলে অধিক ফাযায়েলের আমলগুলো থেকে সে গাফেল থাকে।

এটি এমন এক রোগ, যার দ্বারা বর্তমান যামানার সকল দ্বীনদাররাই কম-বেশি আক্রান্ত। আমলের গুরুত্ব না বুঝে, যখন যেটা মনে চায়, যখন যেটা করতে ভালো লাগে, সেই আমলেই ঝাঁপ দেয়। এক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার চাহিদা অপেক্ষা নিজের দীলের চাহিদা ও ভালো লাগাটাই অধিক প্রাধান্য পায়। অথচ "এই মুহূর্তে আল্লাহ তাআলার কী হুকুম, কী চাহিদা, সেটা পালন করাই" হচ্ছে প্রকৃত দ্বীন। ইবাদতের ক্ষেত্রে নিজের খাহেশ পুরা করাটাই দ্বীন নয়।

আহ্! এই বিষয়টা আমরা কেন যে বুঝি না! কয়েকদিন আগে সংবাদপত্রে একটি খবর প্রকাশ পেল, এক ব্যক্তি ২০১৯ সালে তার জীবনের সাড়ে তিন হাজার তম উমরা পালন করেছে। একজন সাধারণ মানুষ তো শুনা মাত্রই বলতে শুরু করবে, সুব্হানাল্লাহ! লোকটার কী সৌভাগ্য! জীবনে এতবার উমরাহ করার সৌভাগ্য তার হয়েছে! কতবার আল্লাহর ঘরকে দেখার সৌভাগ্য তার হয়েছে! জীবনে কত হাজার বার আল্লাহর ঘর তাওয়াফের সৌভাগ্য তার কপালে জুটেছে! আল্লাহর রাসূলের রওযা মুবারকে কতবার সে সালাম দিয়েছে! আহ্! এই ব্যক্তির মতো সৌভাগ্যবান আরো কেউ কি দুনিয়াতে আছে!

একটু থামুন!...........

নিঃসন্দেহে এই ব্যক্তি সৌভাগ্যবান। যে কোনো ছোট্ট থেকে ছোট্ট একটি (মোস্তাহাব) আমলের তাওফীক পাওয়াটাও অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়, এতে কোনোই সন্দেহ নেই। কিন্তু ব্যাপারটা এখানে নয়। এই লোকটি সাড়ে তিন হাজার বার উমরাহ করেছে, কিন্তু কেন? কিসের আশায়? আমরা লোকটি সম্পর্কে নেক ধারণা পোষণ করছি, ধরে নিচ্ছি, তার মাঝে লোক দেখানোর কোনো প্রবণতা ছিল না, অর্থাৎ সে সওয়াবের নিয়তে, আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার মানসেই সে এতগুলো উমরাহ করেছে! এবার চিন্তা করুন, ঐ আবেদ লোকটি কী করেছেন? লোকটির যিন্দেগীতে একবার উমরাহ করা ওয়াজিব ছিল, যা তিনি যখন জীবনের প্রথম বার উমরাহ করেছিলেন, তখনই আদায় হয়ে গিয়েছে। তাহলে বাকীগুলো হলো নফল উমরাহ।

আপনাদের কি জানা আছে, এক ব্যক্তি সারা জীবন যত নফল ইবাদত করে, সেগুলোকে একত্রিত করলেও তার যিন্দেগীর একটি সুন্নতের সমান হবে না, এভাবে জীবনের সকল সুন্নতকে একত্রিত করলেও একটি ওয়াজিবের সমান হবেনা, ঠিক একই রকমভাবে, যিন্দেগীর সকল ওয়াজিবকে একত্রিত করলেও (গুরুত্ব ও সওয়াবের দিক থেকে) একটি ছোট্ট ফরযের সমান হবে না?

এবার আপনি সাড়ে তিন হাজার নফল উমরাহকে এক পাল্লায় রাখুন, আর ‘ডান পায়ে মসজিদে প্রবেশ করা’ এই একটি ছোট্ট সুন্নতকে আরেক পাল্লায় রাখুন, কোনটা ভারী হবে? নিঃসন্দেহে ‘ডান পায়ে মসজিদে প্রবেশ করা’র সুন্নতটি। বুঝতে পেরেছেন, এই লোকটি যদি বুদ্ধিমান হতেন, এত টাকা আর সময় ব্যয় না করে তিনি অবশ্যই এমন কোনো আমল খুঁজতেন যাতে অল্প সময়ে, অল্প খরচে অধিক সওয়াব লাভ হয়।

তাই যদি সওয়াবই উদ্দেশ্য হতো এবং তিনি আমলের গুরুত্ব বুঝতেন, তাহলে ঐ লোকটি সাড়ে তিন হাজার বার উমরাহ না করে এক সকাল বা এক বিকাল জিহাদের ময়দানে কাটিয়ে আসতেন।

তাছাড়া জিহাদ বর্তমানে ফরযে কিফায়া নয়, ফরযে আইন হয়ে গিয়েছে। নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ, আলেম, জাহেল, দীনদার, দুনিয়াদার, নেককার, ফাসেক-ফুজ্জার, সকল তবকার মুসলমানের উপর ফরয হয়ে গিয়েছে। কেউই এই ফরয হুকুমের আওতার বহির্ভূত নয়। তাই এই একটি ফরয হুকুমের সামনে, কেয়ামত পর্যন্ত এক ব্যক্তি যদি প্রতিদিন একশ করে উমরাহ করে, কিংবা কেয়ামত পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন কাবাঘরে ইতিকাফ করে, কিংবা যিন্দেগীর সকল নামায হারামাইন শরীফাইনে আদায় করে (পৃথিবীর যে কোনো মসজিদে জামাতে নামায আদায় করা ওয়াজিব হুকুম), কিংবা কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিবছর একটি করে হজ্জ করে (জীবনে একবার হজ্জ করা ফরয, আর বাকীগুলো হবে নফল), যদি কোনো ব্যক্তি এমন থাকে যে একাই কিয়ামত পর্যন্ত সকল নফল, সুন্নত, ওয়াজিব আমল করতে সক্ষম, তার এত সওয়াব এক পাল্লায় রাখা হলো আর আল্লাহর রাহে একটি মুহুর্ত জিহাদের ময়দানে কাটানোর সওয়াব এক পাল্লায় রাখা হলো, বলুন এবার, কোন্ পাল্লা ভারী হবে?

তাছাড়া ঐ ব্যক্তির সকল আমলের সাথে কি সেই ছয়টি পুরস্কারের ওয়াদা রয়েছে, যা একজন শহীদ প্রাপ্ত হবে, একজন শহীদ কবরে রিযিক প্রাপ্ত হবে, সে ব্যক্তি কি তা প্রাপ্ত হবে, একজন শহীদের দেহ কবরের মাটির জন্য হারাম করা হয়েছে, সেই ব্যক্তি কি সেই মরতবা লাভ করবে, শহীদকে এমন প্রতিদান দেয়া হবে যে, সে দুনিয়াতে বারবার ফিরে আসতে

চাইবে এবং বারবার শহীদ হতে চাইবে, কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি জান্নাত লাভ করেনও তিনি কি আবার পৃথিবীতে ফিরে আসতে চাইবেন?

আপনারা কি বুঝতে পেরেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহিমাহুল্লাহ কেন তার প্রিয় বন্ধুকে বলেছিলেন, ওহে হারামাইনের আবেদ ব্যক্তি! তুমি যদি আমাদেরকে জিহাদের ময়দানে দেখতে আর আমলের গুরুত্ব বুঝতে, তাহলে তুমি বুঝতে পারতে যে, তুমি আমলের নামে আল্লাহ তাআলার হুকুমের সাথে তামাশা করছ! পিচ্চি বাচ্চারা যেভাবে অনর্থক খেলা করে, তুমিও আমলের নামে ক্রীড়া-কৌতুক করছ! নিজেকে সওয়াবের আশা দেখিয়ে নিজেকে নিজেই ধোকা দিচ্ছ! আল্লাহকে পাওয়া আর আল্লাহ তাআলার হুকুম বাস্তবায়ন করাই যদি তোমার যিন্দেগীর মাকসাদ হত, তাহলে তো তুমি ঘরে বসে থাকতে না, কিংবা হারামাইন শরীফে অবস্থান করতে না, আমাদের সাথে জিহাদের তপ্ত ময়দানে নিজের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিতে, শহীদের মর্যাদা লাভ করতে, যেমনটি আমরা লাভ করছি! আমরা তো আল্লাহর ওয়াদাকে বাস্তবায়িত হতে দেখছি, তাঁর গাইবী মদদ নুসরত দেখে আমাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ না, তোমাদের ঈমানও আমাদের ঈমানের মতো হতে পারবে না, কক্ষনো না, কস্মিনকালেও না! এর চেয়েও খারাপ কথা হলো, তুমি ফরয তরক করার দায়ে আল্লাহ তাআলার কাছে "ফাসেক" সাব্যস্ত হচ্ছ, যদিও তুমি হারামাইনে বসে মক্কা-মদীনা আবাদ করছ। অথচ তুমি মনে করছ তুমি তো অনেক ইবাদত করছ, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করছ। তাই আর ঘরে বসে না থেকে চলে আস ময়দানে।......

আমাদের সমাজেও অনেক সাধারণ দ্বীনদার, আলেম রয়েছেন যারা প্রতি বছরই হজ্জ বা উমরা করেন। জিহাদ পরিত্যাগ করে প্রতিবছর হজ্জ বা উমরা করে এই সব লোক "আমলের নামে নিছক খেল-তামাশা" ছাড়া আর কিছুই করছেন না! বরং এটি আমলের নামে "আল্লাহর হুকুমের সাথে মশকরা এবং ফাইয্লামী"! জিহাদ বাদ দিয়ে বারবার হজ্জ ওমরা করার অর্থ হচ্ছে, হে আল্লাহ! তুমি যতই বল, আমি কিন্তু জিহাদ করছি না। এই আমল করাটা (মক্কা-মদীনায় বারবার যিয়ারত করা) আমার খুব ভালো লাগে, তাই এটিই বারবার করবো।

আপনারা এই আমলটাকে যতটুকু গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি তাকে এতটাই গুরুত্ব দিয়ে থাকতেন তাহলে তিনি জীবনে মাত্র চারটা ওমরাহ করতেন না আর অন্যদিকে ষাটোর্ধ ছোট-বড় সামরিক অভিযান ও যুদ্ধ পরিচালনা করতেন না? তিনি যদি বছর বছর হজ্জ ওমরাহ করাকে এতই গুরুত্ব দিতেন, তাহলে তিনিও আপনার মতোই কয়েক হাজার বার হজ্জ-ওমরাহ করতেন। যদি আপনার এতই নেকীর দরকার হয়, তাহলে আসুন, ময়দানে আসুন।

মা-বোনের উপর ধর্ষণ আর নির্যাতনের ষ্টীম-রোলার স্ব-চক্ষে দেখে যান, বাপ-ভাই আর সন্তানের মর্মান্তিক খুন এসে নিজের চোখে দেখে যান। তাদের জন্য যদি নিজের গায়ের রক্তের ফোঁটা ঝরাতে না পারেন, আসুন, এক ফোঁটা অশ্রু বিসর্জন করে যান। হারামাইন শরীফাইনের ফাইভ-স্টার হোটেলগুলোতে খাবারের নামে অপচয় না করে অনাহারী, দুর্ভিক্ষপীড়িত, মযলুম মুসলমানদের মুখে এক লোকমা খাবার তুলে দিয়ে যান। এত অর্থ সম্পদ খরচ করে মক্কা-মদীনার এ.সির বাতাস না খেয়ে, ময়দানের উত্তপ্ত লূ হাওয়া খেয়ে যান। তাহলে আরশের অধিপতি আপনার প্রতি বেশি খুশি

হবেন, বেশি সওয়াব দিবেন, বেশি নৈকট্য দান করবেন। আপনি যদি নিজেকে হক্কানী, আল্লাহওয়ালা মনে করে থাকেন, তাহলে তো ময়দানে আপনার মতো লোকেরই দরকার। কেননা, যেহেতু আপনি ওলী-আউলিয়া, আপনার দুআ আল্লাহ পাক তো ফেলবেন না। আপনার দুআয় মুসলমানদের দুঃখ-কষ্ট দূর হবে, মুজাহিদ্দের আল্লাহ বিজয় দিবেন। তাই আসুন ময়দানে আসুন।

হ্যাঁ, আপনি যদি জিহাদের পাশাপাশি প্রতি বছর হজ্জ বা ওমরা করতে পারেন, তাহলে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি কোনো অভিযোগ থাকবে না।

বারবার কেন হজ্জ-উমরাকারীদের কথা বলা হচ্ছে? কারণ, উম্মতের যেই লোকগুলোর হজ্জ-উমরা করার সামর্থ্য আছে, বুঝতে হবে এদের হিজরত করার মতো আর্থিক ও শারীরিক যোগ্যতা অবশ্যই আছে। তাছাড়া সামর্থ্যবান উম্মতের সকলের জন্যই কথাগুলো প্রযোজ্য।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে সাহাবাওয়ালা দ্বীনী বুঝ দান করুন। আমীন।

বিভিন্ন মেহনতের সাথে জড়িত সাথিদের প্রতি শয়তানের ধোকাঃ

শয়তান মেহনতের সাথীদেরকে মেহনতের ধোকায় ফেলে।

কিভাবে?

প্রত্যেক দ্বীনদার মুসলমানই কম-বেশি কোনো না কোনো মেহনতের সাথে সম্পৃক্ত। যেমনঃ কেউ মাদরাসার খেদমত, কেউ দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত, কেউ এসলাহী মেহনত, কেউ ইসলামী রাজনীতির মেহনত, কেউ জিহাদের ময়দানে মেহনত করে। এক্ষেত্রে শয়তান যে যে মেহনতের সাথে লেগে আছে, তার কাছে সেই মেহনতের গুরুত্ব এমনভাবে পেশ করে যে, সে দ্বীনের অন্য কোনো মেহনতের সাথে জুড়ার কথা কল্পনাও করতে পারেনা। এক পর্যায়ে সে তার স্বীয় মেহনতকে পরিপূর্ণ মেহনত মনে করতে থাকে। কুরআনের ভাষায়,

كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

"প্রত্যেক দলই আপন আপন মতবাদ নিয়ে উল্লসিত।" (৩০ সূরা রূমঃ ৩২)

হো হো হো! আমিই হক! আমিই হক! আমি আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত! আমিই সেই জামাত যার সম্পর্কে নবীজী ﷺ ভবিষ্যদ্বানী করেছেন, কেয়ামত পর্যন্ত একটি দল হকের উপর থাকবে! আমিই আল্লাহর নবীর ওয়ারিশ! আমিই নায়বে নবী! আমিই দ্বীনের ঠিকাদার! আমিই দ্বীনের পাহারাদার! আমিই নবীওয়ালা কামকরনেওয়ালা! আমি "সীরাতে মুস্তাকীমের উপর আছি! আমিই .... আমিই .... আমিই সব! শেষ যামানায় ইমাম মাহদী আমার দল থেকেই আসবেন! ইমাম মাহদী আমার তরীকার খলীফা হবেন; আমার মাদরাসার ছাত্র হবেন! হা হা হা!

আজ মুসলমানদের মুখে এরকম কত দাবী যে শুনা যায়, তার ইয়ত্তা নেই। আপনার এসব দাবী যে সত্য তার প্রমাণ কী? আপনার মন আপনাকে বুঝিয়ে দিল যে আপনি হক আর আপনি তাতেই বিশ্বাস করে ফেললেন? অথচ আপনি হকের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয়েছেন কিনা তাতো একবারও ভাবলেন না! যার যিন্দেগী আল্লাহর রাসূলের যিন্দেগীর সাথে মিলবে, যার যিন্দেগী সাহাবায়ে কেরাম রদিয়াল্লহু আনহুমদের যিন্দেগীর সাথে মিলবে, সে-ই প্রকৃত হক, সে-ই প্রকৃত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত, সে-ই প্রকৃত নবীর ওয়ারিশ, সে-ই............(বাকী সবকিছু)!

অনেকে তো আরো এক ধাপ এগিয়ে যায়, নিজের মেহনতকে ছাড়া দ্বীনের অন্যান্য মেহনতকে গোমরাহী ভাবা শুরু করে। হয়ত অনেকে অন্যান্য মেহনতকে গোমরাহী মনে করে না, কিন্তু যারা দ্বীনের অন্য মেহনত করে এবং তার মেহনতের সাথে জুড়ে না, তাদের সাথে সে এমন আচরণ করে যেন ঐ ব্যক্তিরা গোমরাহ হয়ে গেছে। এর কারণ কী? আত্মতুষ্টি। আমরা মেহনত করি এবং আত্মতুষ্টিতে ভুগি 'আলহামদুলিল্লাহ! আমি তো অনেক উঁচা মেহনতের সাথে জুড়ে আছি।' এই আত্মতুষ্টিই আমাকে নিজের মেহনতকে বড় এবং অন্যের মেহনতকে ছোট করে দেখার প্ররোচনা যোগায় এবং শয়তান ঘাড়ে চেপে বসে। আমি কখনো এটি চিন্তা করিনা যে, আমি হয়ত নিজেকে একটি বুঝ দিয়েছি, অথবা আমার নফস বা শয়তান আমাকে একটি বুঝ দিয়ে রেখেছে, ফলে নিজেকে নিজে সান্তনা দিচ্ছি, আমি তো একটা মেহনতের সাথে লেগেই আছি, আর অন্য কোনো মেহনতের দরকার নেই। এই কারণে আমার দ্বারা দ্বীনের জন্য বড় বড় কদম দেয়া হয়ে উঠে না। আমার দ্বারা বড় কোনো খেদমতও আল্লাহ তাআলা নিচ্ছেন না।

এরকম হওয়ার কারণ হচ্ছে, মেহনতের ক্ষেত্রে আমি সবসময় আমার রুচি, সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে মেহনত করি। যে মেহনত আমার রুচি মাফিক হয়না, যে মেহনত হাতের নাগালে নেই, যেই মেহনতের দ্বারা আমি প্রথম দ্বীনের উপর চলা শুরু করেছি কিংবা আল্লাহ তাআলা যেই মেহনতের দাওয়াতের উসীলায় আমাকে দ্বীনের উপর উঠার তাওফীক দিয়েছেন, সেই মেহনত ছাড়া অন্য মেহনত করতে আমি রাজি নই। **অথচ** যে কোনো মেহনত করার পূর্বে আমাকে যাচাই করে দেখা দরকার, দ্বীন এবং মুসলমানদের জন্য বর্তমানে কোন্ বিষয়টি বেশি দরকার। কোন্ ক্ষেত্রে কাজ করলে অল্প সময়ে উম্মতের বেশি ফায়দা হবে। এর দ্বারা সওয়াবও বেশি হবে। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিও বেশি হাছিল হবে। যদি এমন হয়, বর্তমানে আল্লাহ তাআলা চাইছেন বা ফরযে আইন করেছেন যে, উম্মত এই মেহনত করুক আর আমি চাচ্ছি বা করছি অন্য মেহনত, অন্য কোনো নফল বা সুন্নত বা ওয়াজিব মেহনত, তাহলে একটু চিন্তা করি, আমার মেহনত কি আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করবেন? আমি কি নিজেকে ধোকা দিচ্ছি না? নিঃসন্দেহে আমার সব মেহনত আল্লাহ তাআলার কাছে বেকার সাব্যস্ত হবে।

● যখন জিহাদ ফরযে আঈন হয়ে যায়.....

যখন জিহাদ ফরযে আঈন হয়ে যায়, তখন উম্মতের সকলের উপর একটি মেহনত কিংবা পেশাই অনুমোদিত, আর সেটি হলো 'তরবারি'র মেহনত/পেশা অর্থাৎ জিহাদ। এটি ব্যতীত অন্য কোনো মেহনত/পেশায় নিয়োজিত হওয়া গুনাহে কবীরা। অন্য কোনো মেহনত/পেশায় নিয়োজিত হওয়া জায়েয নেই। মাদরাসাওয়ালাদেরকে মাদরাসা ছাড়তে হবে, তাবলীগওয়ালাদের তাবলীগ ছাড়তে হবে, খানকাহওয়ালাদের খানকাহ্ ছাড়তে হবে, রাজনীতিওয়ালাদের রাজনীতি ছাড়তে হবে, ব্যবসাওয়ালাদের ব্যবসা ছাড়তে হবে, ডাক্তারকে ডাক্তারী ছাড়তে হবে, ইঞ্জিনিয়ারকে ইঞ্জিনিয়ারী ছাড়তে হবে, চাকুরীওয়ালাদের চাকুরী ছাড়তে হবে, ছাত্রদেরকে পড়াশুনা ছাড়তে হবে, কৃষিজীবীদের কৃষি, খেত-খামার ও গরুর লেজ ছাড়তে হবে। যদি না ছাড়া হয়, সে ফাসেক, গোনাহে কবীরা করনেওয়ালা, আল্লাহ তাআলার ফরয হুকুম তরক করনেওয়ালা, হোক সে আল্লামা কিংবা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বক্তা বা ক্বারী, হোক সে গ্র্যান্ড মুফতী কিংবা শাইখুল ইসলাম, হোক সে শাইখুল হাদীস কিংবা শাইখুল কুরআন, হোক সে শামসুল উলামা কিংবা নাযমুল উলামা, হোক সে যামানার শ্রেষ্ঠ আলেম কিংবা শ্রেষ্ঠ বুযুর্গ, হোক না সে শ্রেষ্ঠ পীরে কামেল, হোক না সে শ্রেষ্ঠ দাঈ ইলাল্লাহ, সে যাই হোক না কেন, তার নামের আগে "ফাসেক" উপাধি যোগ হবে। মনে রাখবেন, এসকল টাইটেল বা উপাধি সাহাবাদের যামানায় ছিল না।

হ্যাঁ, নবুওয়তের যামানায় অবশ্য দুইটা টাইটেল ছিল। কেননা, সাহাবাদের জামাতে দুই শ্রেণির মুসলমান ছিল। এক. খাঁটি মুসলমান, দুই. মুনাফিক।

যারা আল্লাহর রাসূলের সাথে সকল জিহাদে অংশগ্রহণ করতেন, তাঁরা ছিলেন খাঁটি মুসলমান আর যাঁরা জিহাদ ত্যাগ করতো, তারা ছিল মুনাফিক। মুনাফিকরা মুসলমানদের সাথে সকল আমলে জুড়ত, জিহাদ ছাড়া। তাই বর্তমান সময়েও দ্বীনের সকল কাজ করার পরেও জিহাদ ত্যাগ করার কারণে 'মুনাফেক' হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে, যেমনটি আল্লাহর রাসূলের যামানায় ছিল।

দ্বীনতো সেটিই আছে, কিন্তু আমাদের মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা নষ্ট হয়ে গেছে, 'হেকমত' নামের ভূত সকলের মাথায় চেপে বসেছে। যে যত বেশি জিহাদ থেকে পালানোর পন্থা উদ্ভাবন করতে পারি, সে তত বেশি হেকমতওয়ালা!!!

দ্বীনের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিদেরই যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে আমরা যারা দুনিয়ার গোলাম, দুনিয়া নিয়েই যাদের ভোর আর দুনিয়া নিয়েই যাদের সন্ধ্যা, যাদের মন-মগজ আর গিলুর ভিতর পুরোটাই দুনিয়া, তাদের অবস্থা কী হবে, একটু চিন্তা করি। বর্তমান যামানাই সেই যামানা, যেই যামানায় জিহাদ সকলের উপর ফরযে আঈন। আল্লাহ তাআলা চাইলে, এই যামানাই ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের যামানা। এখন আর অন্য কোনো কিছু করার সুযোগ কারোর নেই। আগে জিহাদ, পরে অন্য কিছু!!!

❖ আলেম সমাজকে শয়তানের ধোকা:

ধরুন, আপনি **কুরআন কারীমের তিলাওয়াত শিখানোর মেহনত** করেন। আপনার পাঁচশত বা হাজার খানেক নিয়মিত ছাত্র আছে। আলহামদুলিল্লাহ! অনেক মুবারক মেহনত। কেননা, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিখায়।" কিংবা মনে করুন, আপনি একজন **মাদরাসার উঁচু পর্যায়ের উস্তাদ,** আপনার দ্বারা ইলমী অনেক খেদমত আল্লাহ তাআলা নিচ্ছেন। এখন মনে করুন, আপনার উপর জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ' ফরয হয়ে গেল, তাহলে এখন আপনার করণীয় কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরাম আপনার স্থানে থাকলে কী করতেন? এক্ষেত্রে আপনার করণীয় হলো, কুরআন কারীম শিখানোর মেহনত কিংবা মাদরাসার দরস্ দানের ইবাদত (যা একটি ফরযে কিফায়া কিংবা ক্ষেত্র বিশেষে নফল আমল) বাদ দিয়ে ফরয ইবাদতের দিকে দৌঁড় দেয়া। কেননা আপনি যদি ফরযে কিফায়া/নফল বাদ দেন এজন্য আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে না, কিন্তু ফরয ত্যাগ করলে আপনাকে অবশ্যই আল্লাহ তাআলার সামনে অপরাধী সাব্যস্ত হতে হবে, আপনাকে 'ফাসেক' হতে হবে, যদিও আপনি অনেক বড় মেহনত করছেন। আপনি যদি জিহাদে যেতেন, হয়ত আল্লাহ তাআলা আপনার দ্বারা আরো অনেক খেদমত নিতেন। যেমন: কুফ্ফার কর্তৃক আক্রান্ত মুসলিম ভূমিতে আপনার মাধ্যমে মুসলমানদের দ্বীন শিক্ষার ব্যবস্থা হতো, আল্লাহ তাআলা আপনার দ্বারা পৃথিবীর কোনো ভূমিতে তাঁর দ্বীন পরিপূর্ণরূপে কায়েম করাতেন, ফলে সেখানে কুরআনের আইন প্রতিষ্ঠিত হতো, তখন আপনি এরকম হাজারটা

মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন, লক্ষ লক্ষ মানুষ কুরআন শিখতে পেত, দ্বীনের ইলম লাভ করে পরকালে নাজাত পেত আর আপনিও কেয়ামত পর্যন্ত সদকায়ে জারিয়ার সওয়াব পেতে থাকতেন। আর না হলে হয়ত আপনি শহীদ হয়ে কামিয়াবীর যিন্দেগী লাভ করতেন, সাথে সাথে অন্যরা দ্বীন কায়েম করে যে সওয়াব পেয়েছে, তাদের সাথে থেকে আপনিও সেই সওয়াব হাছিল করতে পারতেন। আল্লাহ তাআলা আপনার নিয়তের কারণে পরিপূর্ণই দিতেন, একটুও কম করতেন না।

● আমরা (আলেমরা) জিহাদ করি না; তার কারণ......

➢ প্রথম কারণঃ

হিন্দুস্তানের একজন বিখ্যাত আলেম, নাম বললে অনেকেই চিনে ফেলবেন, উলামায়ে কেরামের জিহাদ না করার এমন এক কারণ বয়ান করলেন, শুনে অবাক হলাম, এবং ধরে নিলাম তিনি শুধু একা নন, উনার মতো বড় বড় অনেক আলেমই এই রোগে ব্যধিগ্রস্ত। তাই বিষয়টি উম্মতের সামনে পরিষ্কার করা দরকার। তিনি বললেন, “আমরা (আলেমরা) জিহাদ করিনা; কারণ, আমাদের চার মাযহাবের কোনো ইমাম এবং আমাদের অমুক অমুক আকাবীরদের যিন্দেগীতে সশস্ত্র জিহাদ ছিল না। তারা আজীবন এলেমের খেদমত করে গেছেন। তাই আমরাও আজীবন এলেমের খেদমত করে যাবো।”

ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন......

কী বললেন তিনি এটি! তাঁর মতো বুঝমান একজন আলেমের কাছে এ ধরণের মূর্খতাসুলভ কথা শোভা পায় না। অবশ্য বুঝলে তো আর তিনি

এমন কথা বলতেন না! তিনি জানেন না, ইসলামের বড় বড় ইমামদের উপর তিনি কত বড় অপবাদ আরোপ করলেন! অথচ আমি কিংবা তিনি- আমরা কেউই তাঁদের পায়ের ধূলার সমানও নই।
উনার উক্তিটি আরেকবার পড়ুন।......

এবার ভালো করে খেয়াল করুন, তিনি যখন উপরোক্ত উক্তিটি করলেন, তিনি আইম্মায়ে কেরামের উপর মূলতঃ নিচের অপবাদগুলো আরোপ করলেন-

১. আইম্মায়ে কেরাম কি দ্বীন বুঝেন নাই?
আমরা যেমন বুঝে-শুনে, যথেষ্ট কারণ বের করে জিহাদ করছি না, তেমনিভাবে তাঁরাও বুঝে-শুনেই জিহাদ করেননি। আমরা ও তাঁরা এক পথেই হাঁটছি। ঘুরিয়ে বললে, যদি আমরা দ্বীন বুঝে না থাকি, তাহলে তাঁরাও তো দ্বীন বুঝেন নাই! (নাউযুবিল্লাহ)

২. যেহেতু আমরা একই মানহাযের উপর আছি, সেহেতু যদি আমরা জিহাদ তরককারী হই, তাহলে তো তাঁরাও জিহাদ তরককারী! (নাউযুবিল্লাহ)

৩. একইভাবে, যদি জিহাদ ত্যাগ করার কারণে আমরা ‘ফাসেক’ হয়ে থাকি, তাহলে তো তাঁরাও ফাসেক ছিল! (নাউযুবিল্লাহ)

৪. আইম্মায়ে কেরাম কী জিহাদের গুরুত্ব বুঝেন নাই?
যেহেতু আমরা ও তাঁরা একই সিল্‌সিলার পথিক, জিহাদ না করার কারণে যদি আমরা জিহাদের গুরুত্ব না বুঝে থাকি, তাহলে তো তাঁরাও জিহাদের গুরুত্ব বুঝেন নাই! (নাউযুবিল্লাহ)

৫. তাঁরা ইলমের খেদমতকে জিহাদের ময়দানের খেদমতের চেয়ে বড় মনে করতেন। তাই তাঁরা আজীবন ইলমের খেদমত করে গেছেন। তাই আমরাও মনে করি, ইলমের খেদমত জিহাদের খেদমতের চেয়ে বড় ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমরাও আজীবন মাদরাসার খেদমত করে যাবো। মাদরাসা থেকে কখনোই বের হবো না। যদি আমরা ভুল পথে থাকি, তাহলে তো আইম্মায়ে কেরামও ভুল পথের পথিক ছিলেন! (নাউযুবিল্লাহ)

এইখানে এসে কিছু কথা!!!

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "আমার সাহাবীরা (আসমানের) তারকার মতো, তোমরা যে কোনো একজনকে অনুসরণ করবে, হিদায়াত পেয়ে যাবে।" অর্থাৎ হিদায়াতের মানদণ্ড হচ্ছেন সাহাবায়ে কেরামগণ, অন্য কেউ নন। আল্লাহর রাসূলের ﷺ পর কাউকে অনুসরণ যদি করতেই হয়, তাহলে সাহাবায়ে কেরামকে অনুসরণ করতে হবে। পরবর্তী যামানার কেউ অনুসৃত হতে পারেন না।

আবার হাদীসে এও এসেছে,"সর্বশ্রেষ্ঠ জামাত হচ্ছে আমার সাহাবীদের জামাত, এরপর শ্রেষ্ঠ যারা তাদের পর (তাবেয়ীগণ), এরপর শ্রেষ্ঠ যারা তাদের পর (তাবে-তাবেয়ীগণ)।"

এখন আপনি যদি সাহাবীদের যিন্দেগী দেখেন, তাহলে তাঁদের প্রত্যেকের সীরাত মানেই সশস্ত্র জিহাদ বা কিতাল (যুদ্ধ)। প্রত্যেকের যিন্দেগীতেই কোনো না কোনো যুদ্ধের কাহিনী রয়েছে। এমনও সাহাবী আছেন, ঈমান আনার পর নামাযের ওয়াক্ত না হওয়ায় নামায পড়তে পারেননি, জিহাদ চলছিল, জিহাদের শরীক হয়ে শহীদ হয়ে যান। তাই নবীজী ﷺ-এর নির্দেশ অনুসারে যদি সাহাবীদের অনুসরণ করেন, তাহলে আপনাকে

জিহাদ করতেই হবে। এবার আসুন, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীদের কথায়। তাঁদের সকলের যিন্দেগীতে জিহাদ পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ চার মাযহাবের (ফিকাহ শাস্ত্রের) ইমামগণ, হাদীসের ইমামগণ, মুজতাহিদীন, এক কথায় ইলমের জগতের সাথে সম্পর্কিত ইমামদের যিন্দেগীতে খুব কম সংখ্যককেই পাবেন যাদের যিন্দেগীতে জিহাদ আছে। কেন? তাঁরা কি সাহাবায়ে কেরামের অনুসারী ছিলেন না? যদি অনুসারী হয়েই থাকেন, তাহলে সাহাবাদের সকলের যিন্দেগীতেই তো জিহাদ ছিল, কিন্তু তাঁদের যিন্দেগীতে জিহাদ নেই কেন? আর যদি তাঁরা সাহাবীদের অনুসারী না হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁরা 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত' হলেন কিভাবে? নবীজী ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরামের অনুসারী হলেন কিভাবে?............

আইম্মায়ে কেরাম অবশ্যই "আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত", তাঁরা অবশ্যই হকের উপর ছিলেন, তাঁরা অবশ্যই সাহাবায়ে কেরামের অনুসারী ছিলেন, সন্দেহ নেই। তাহলে, সাহাবাদের যিন্দেগীর সাথে পার্থক্য কেন? যদি তাঁরা সাহাবাদের অনুসারী হয়েই থাকেন, তাহলে (বর্তমান যামানায়) তাঁদেরকে কি অনুসরণ করা যাবে না? (যেহেতু তাঁরা হক ছিলেন), তাঁদেরকে অনুসরণ করতে গিয়ে যদি (বর্তমান যামানায়) জিহাদ না করা হয়, তাহলে কেন হকের উপর থাকা হবে না?..........

এইখানে এসেই আমাদের বর্তমান যামানার বড় বড় আলেমগণও ধোকা খান। বিষয়টি যতটুকু জটিল মনে হচ্ছে, আসলে এতো জটিল নয়। একটু মাথা খাটালেই বুঝে আসবে?

এক্ষেত্রে এসে আমাদের আলেম সমাজ ভুলে যান, শরীয়তের কিছু কিছু হুকুম পরিস্থিতির ভিন্নতার কারণে পরিবর্তনশীল। যেমন: কখনো কখনো কোনো কোনো পরিস্থিতিতে কোনো একটি হুকুম ফরযে আইন,

আবার একই হুকুম কখনো ফরযে কিফায়া। সাহাবাদের যামানা আর তাবেয়ী/ তাবে-তাবেয়ীদের যামানার পরিস্থিতি এক রকম ছিল না, আবার তাবেয়ী/ তাবে-তাবেয়ীদের যামানার সাথে বর্তমান পরিস্থিতির মিল নেই। বরং সাহাবায়ে কেরামের সময়ের সাথে বর্তমান যামানার যথেষ্ট মিল রয়েছে। নবুয়ওতের যামানায় যেমন পরিবেশ ইসলামের প্রতিকূল ছিল, বর্তমান যামানায়ও তেমনি প্রতিকূল পরিবেশ বিদ্যমান। অন্যদিকে তাবেয়ী/ তাবে-তাবেয়ীদের যামানা ছিল ইসলামের জন্য পুরোপুরি অনুকূল, মুসলমানদের নিরাপত্তার দিক থেকে 'স্বর্ণযুগ' বলা যেতে পারে।

অধিকাংশ আইম্মায়ে কেরাম কেন জিহাদ করেননি, আর বর্তমান যামানায় কেন তাদের যিন্দেগীর অনুসরণ করা যাবে না, তা বুঝতে হলে নিচের কথাগুলো ভালোভাবে বুঝার চেষ্টা করুন-

১. আইম্মায়ে কেরামের যামানায় জিহাদ 'ফরযে আইন' ছিল না, 'ফরযে কিফায়া' ছিল। তখন ইসলামী খিলাফত ছিল। দেশরক্ষা এবং অমুসলিমদের অঞ্চলগুলো জয় করার জন্য উম্মতের যথেষ্ট পরিমাণ বাহিনী ও শক্তি ছিল। শাসকগোষ্ঠীও জিহাদ ছাড়া অন্য কিছু বুঝতো না। সাধারণ মুসলমানদের মাঝে জিহাদের জযবা একশতে একশ ছিল। পৃথিবীর বাতিল শক্তিগুলো মুসলমানদের উপর তরবারি উত্তোলন করবে তো দূরে থাক্, নিজেরাই মুসলমানদের ভয়ে দৌঁড়ের উপর ছিল। দিগ্বিজয়ী মুসলমান সেনাপতিরা তাদের ঘুম হারাম করে রেখেছিলেন। এই সকল কারণে তখন সাধারণভাবে সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরয (ফরযে আইন) ছিল না। আর তাই জিহাদ না করার কারণে আইম্মায়ে কেরাম দোষী সাব্যস্ত হবেন না। কিন্তু বর্তমানে উম্মতের পরিস্থিতি কী, তা লক্ষ্য করুন! আগেই

এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে যে, বর্তমানে জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গিয়েছে, ফরযে কিফায়া নয়। তাই এখন কেউ জিহাদ না করলে দোষী সাব্যস্ত হবেন।

২. আইম্মায়ে কেরামের যামানায় ইলমের খেদমত করা ফরযে আইন ছিল। কিভাবে? আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ওফাতের পর নানামুখী ফেতনা দেখা দেয়। এর মধ্যে অন্যতম প্রধান ফেতনা হলো, ইহুদী-নাসারা ও মুনাফিক কর্তৃক জাল হাদীস ও মাসলা-মাসাইল উদ্ভাবনের ফেতনা। এরা বিভিন্ন রকমের মনগড়া জাল হাদীস বানিয়ে উম্মতকে গোমরাহ করছিল। তাই তখন সময়ের দাবী ছিল, হাদীস এবং মাসলা মাসাইল (ফিক্হ) সমূহ কিতাবাকারে লিপিবদ্ধ করা। উম্মতকে ধ্বংসের মুখ থেকে বাঁচানোর জন্য সহীহ হাদীস ও বিশুদ্ধ ফিক্হের ইলমকে সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা কর। আর যারা এ কাজের উপযুক্ত ছিলেন, সে সকল ব্যক্তিদের উপর কাজটি ফরযে আইন ছিল। আইম্মায়ে কেরাম যদি তখন ইলমের খেদমত (যা তখন ফরযে আইন হয়ে গিয়েছিল, তা) বাদ দিয়ে জিহাদের (যা তখন ফরযে কিফায়া ছিল, তার) মেহনত করতেন তাহলে উম্মত লাভবান হওয়ার পরিবর্তে ক্ষতিগ্রস্ত হতো বেশি। এবং তাঁরা ফরয তরকের গুনাহে দোষী হতেন। তাঁদের আজীবন সাধনার প্রেক্ষিতে ইলমের খেদমত আবারো ফরযে কিফায়া হয়ে যায়, যা বর্তমান পর্যন্ত বিদ্যমান আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে ইন্‌শাআল্লাহ। যেহেতু বর্তমানে ইলমের খেদমত করা ফরযে কিফায়া, আর জিহাদ ফরযে আইন, তাই কেউ যদি মাদরাসা নিয়ে বসে থাকে, তাহলে তার ফরয তরক করার গুনাহ হবে।

৩. হযরত ইমাম গায্যালী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “দ্বীনের রক্ষা প্রাচীর চারটি, যথা: ইলম, তাযকিয়া, দাওয়াত ও জিহাদ। এর কোনো একদিকে দূর্বলতা থাকলে বাতিল সেদিক দিয়েই উম্মতকে আক্রমণ করবে।” অর্থাৎ একথা থেকে বুঝা যায়, বাতিল যদি কোনো একদিকে আক্রমণ করে, বুঝতে হবে ঐ দিকটি উম্মতের দুর্বল হয়ে গিয়েছে। তখন সেদিকটিকে শক্তিশালী করা উম্মতের উপর ফরয। আইম্মায়ে কেরামের সময় যেহেতু বাতিলের আক্রমণ ইলমী ময়দানে ছিল (অন্যদিকে জিহাদের ক্ষেত্রে উম্মত তখন যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল), তাই তখন সেটিকে সুরক্ষিত করা ফরযে আইন ছিল। আলহামদুলিল্লাহ তাঁরা সেটি যথাযথভাবে পালন করেছেন। কিন্তু বর্তমানে উম্মত জিহাদের ক্ষেত্রে দুর্বল হয়ে যাওয়ায়, বাতিলের আক্রমনের শিকার হচ্ছে, তাই বর্তমানে জিহাদ ফরযে আইন।

৪. যদিও আইম্মায়ে কেরামের সকলেই জিহাদ করেননি, কিন্তু তাঁরা কেউই কখনো বাতিলের সাথে আপোস করেননি। কোনো কুফরকে হেকমত হিসেবে গ্রহণ করেননি। শাসকগোষ্ঠীর আনুগত্য করেননি। তাদের দরবারে গমন করেন নি। তাঁদের ঈমান বিক্রি করেননি। বরং শাসকদেরকে সৎকাজে আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ করেছেন (যা সবচেয়ে বড় জিহাদ)। বর্তমান যামানায় আলেমরা তাঁদের উল্টাপথে চলেও দাবী করেন যে, তাঁরা আইম্মায়ে কেরামের অনুসারী।

৫. সেই যামানার আইম্মায়ে কেরাম যদি বর্তমান সময়ে জন্মগ্রহণ করতেন, অবশ্যই তাঁরা “ইমামুল ফিকাহ” না হয়ে “ইমামুল জিহাদ” হতেন। কেননা তাঁরা আমলের গুরুত্ব বুঝতেন, আমলের প্রয়োজনীয়তা বুঝতেন, ফরযে আইন অবস্থায় জিহাদ পরিত্যাগের ক্ষতি ও শাস্তির কথা

তাঁরা উপলব্ধি করতেন। জিহাদ যেন উম্মতের মাঝে পুনর্জাগ্রত হয়, সেজন্য মেহনত করতেন, সেজন্য কলম ধরতেন।

৬. আইম্মায়ে কেরাম সাহাবায়ে কেরামের অনুসারী ছিলেন। কেননা সাহাবায়ে কেরামের যিন্দেগীতে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে জিহাদের দুইটি অবস্থাই ছিল। কখনো জিহাদ ফরযে আইন হতো তখন সকলকেই তাতে জুড়তে হতো, না জুড়লেই মুনাফিক। আবার কখনো জিহাদ ফরযে কিফায়া হতো, তখন সবাই তাতে অংশগ্রহণ করতেন না।

আচ্ছা বলুনতো,

ইসলামের প্রথম যুদ্ধ কী?........... বদরের যুদ্ধ।

এটি আক্রমণাত্মক নাকি আত্মরক্ষামূলক?...........আক্রমণাত্মক (Offensive)। কেননা, আল্লাহর রাসূল ﷺ আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলা আক্রমণ করতে বের হলেন। এই বাণিজ্য কাফেলাকে রক্ষা করার জন্য মক্কা থেকে বাহিনী আসলে বদর প্রান্তরে তারা মুসলমানদের মুখোমুখি হয়। যেহেতু এতে মুসলমানরা আক্রান্ত হয়নি, বরং মুসলমানরাই আগে বেড়ে আক্রমণ করতে গিয়েছে, তাই এটি ছিল আক্রমণাত্মক (Offensive) জিহাদ।

এটি কি ফরযে আইন ছিলো নাকি ফরযে কিফায়া?...........ফরযে কিফায়া। যেহেতু আক্রমণাত্মক তাই এটি ফরযে কিফায়া। এ কারণেই আল্লাহর রাসূল ﷺ মদীনার সকল সাহাবীদের সাথে করে নিয়ে বের হননি। মদীনায় তখন হাজারের উপর পুরুষ সাহাবী ছিলেন, এর মধ্য থেকে মাত্র ৩১৩ জনকে নিয়ে আক্রমণাত্মক এই অভিযানে বের হন। অর্থাৎ যুদ্ধটি

ছিল ফরযে কিফায়া। এছাড়াও মূতা, মক্কা বিজয়, খাইবার অভিযান ইত্যাদি আক্রমণাত্মক যুদ্ধ ছিল।

এবার আসুন বাকি যুদ্ধগুলো, যেমন: ওহুদ, খন্দক, তাবুক, হুনাইন ইত্যাদি এগুলো ছিল প্রতিরক্ষামূলক (Defensive) যুদ্ধ। এই যুদ্ধগুলোতে সকলের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক (ফরযে আইন) ছিল, কেবল হুনাইনের যুদ্ধ ছাড়া। হুনাইনের যুদ্ধে আল্লাহর রাসূল বার হাজার সাহাবীকে সাথে নেন, যারা শত্রুদের মোকাবেলার জন্য যথেষ্ট ছিল।

আমাদের আইম্মায়ে কেরামের যামানায় যেহেতু জিহাদ ফরযে কিফায়া ছিল, আর তাঁদের জিহাদ করার প্রয়োজনও ছিল না, বরং তাঁরা ইলমের হিফাযতের জন্য ফরযে আইন খিদমত আঞ্জাম দিচ্ছিলেন, তাই তাঁরাও মূলত সাহাবায়ে কেরামের আদর্শের উপরই ছিলেন, কেননা, ফরযে কিফায়া যুদ্ধগুলোতে সকল সাহাবী যোগ দিতেন না।

ভালো করে বুঝে নিন, বর্তমান যামানার প্রেক্ষাপট হলো ওহুদ, খন্দক কিংবা তবুকের যুদ্ধের ন্যায়, আর এই যুদ্ধগুলোতে সকল মুসলমানদের অংশগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক ছিল। খন্দকের জিহাদের কাজ করতে গিয়ে স্বয়ং আল্লাহর রাসূলের ﷺ চার ওয়াক্ত নামায কাযা হয়ে যায়, এ থেকেই প্রতিরক্ষামূলক জিহাদের গুরুত্ব বুঝে আসে। কেবল মুনাফেক ছাড়া এই যুদ্ধগুলোতে সকল সাহাবায়ে কেরাম অংশগ্রহণ করেছিলেন। আর মুনাফেক সর্বপ্রথম চিহ্নিতই হয় ওহুদের যুদ্ধের সময়। তাই আমরা যারা ফরযে আইন জিহাদ ত্যাগ করে ঘরে বসে আছি, আমাদের “মুনাফেকী”র ব্যাপারে খুব ভয় করা দরকার। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মুনাফেকী থেকে হেফাযত করুন। আমীন।

তাই যারা বলেন,"আইম্মায়ে কেরাম জিহাদ করেননি, তাই আমরাও জিহাদ করবো না।" তাদেরকে বলি-

✓তাঁরা দ্বীন বুঝেই জিহাদ করেননি, আর আপনারা দ্বীন না বুঝার কারনে জিহাদ ত্যাগ করেছেন।

✓তাঁরা আল্লাহ তাআলার কাছে জিহাদ তরককারীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না, কিন্তু আপনাদের ব্যাপারে ভয় আছে।

✓তাঁরা ফরয তরককারী ফাসেক ছিলেন না, কিন্তু আপনাদের ব্যাপারে প্রবল আশঙ্কা আছে।

✓তাঁরা জিহাদের গুরুত্ব বুঝেছিলেন, এজন্যই জিহাদ করেননি। আর আপনারা জিহাদের গুরুত্ব বুঝছেন না, এজন্য জিহাদ করছেন না।

✓তখন জিহাদ ছিল ফরযে কিফায়া আর ইলমের খিদমত ছিল ফরযে আইন। তাই তারা ইলমের খেদমতকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। আর বর্তমানে জিহাদ ফরযে আইন আর ইলমের খিদমত ফরযে কিফায়া। তাই আপনারা একই কাজ করে অর্থাৎ ইলমের মেহনতকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে আইম্মায়ে কেরামের উল্টো পথে হাঁটছেন।

✓তাঁরা জিহাদ না করার কারণে তাঁদের ব্যাপারে মুনাফেকীর ভয় ছিল না, তাঁদের যামানায় সেই পরীক্ষা আসেনি; কিন্তু বর্তমানে সমস্ত উম্মতের উপর সেই পরীক্ষা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, যা এসেছিল সাহাবাদের জামাতের উপর। সুতরাং সাবধান!

➢ দ্বিতীয় কারণঃ

হাদীসে এসেছে, নবীদের সাথে আলেমদের মর্যাদার পার্থক্য হবে মাত্র এক স্তরের। পার্থক্যটা শুধু এজন্য যে, নবীদের কাছে ওহী আসত আর আলেমদের কাছে ওহী নাযিল হয় না। কিন্তু তাঁরা উভয়েই ইলমে ওহীর ধারক ও বাহক। হাদীস থেকে বুঝা যায়, উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মর্যাদাবান উলামায়ে কেরাম, এমনকি মুজাহিদ এবং শহীদদের থেকেও। যেমন, আরেক হাদীসে এসেছে, "ইবাদতকারীর ওপর একজন আলেমের শ্রেষ্ঠত্ব যেমন, সমস্ত তারকার ওপর পূর্ণিমার চাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের মত।"

হযরত ইমাম গায্যালী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "এ হাদীস দ্বারা ইলমের এমন মাহাত্ম্য প্রমাণিত হয় যে, ইলমের স্থান নবুওয়তের পরে এবং শাহাদাতের পূর্বে। অথচ শাহাদাতের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত আছে।"

তাই, আমাদের (আলেমদের) জিহাদ করার দরকার কী? আমাদের স্থানতো মুজাহিদদের উপরেই আছে? আমরা কেন নিচে নামব? আমরা তো অধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতই করছি? দ্বীনের অধিক গুরুত্বপূর্ণ খিদমতই করছি?

এখন আমি আপনাদেরকে (আলেমদেরকে) কিছু প্রশ্ন করছি,

কোন্ আলেমের স্থান নবীদের পরে, কিন্তু শহীদের আগে?

নবীদের পরেই কি সেই আলেমের স্থান হবে, যে আলেম নামায পড়ে না?

নবীদের পরেই কি সেই আলেমের স্থান হবে, যে আলেম রোযা রাখে না?

নবীদের পরেই কি সেই আলেমের স্থান হবে, যে আলেম যাকাত ফরয হওয়া সত্ত্বেও যাকাত আদায় করে না?

নবীদের পরেই কি সেই আলেমের স্থান হবে, যে আলেমের উপর হজ্জ ফরয হওয়া সত্ত্বেও হজ্জ করে না?

প্রশ্ন হচ্ছে, যেসব আলেম 'ফরযে আইন' উক্ত কাজগুলো করে না, তাদের স্থান কি নবীদের পরে, আর শহীদের আগে হবে? হবে না! কারণ, সে ইল্‌মের যত বড় জাহাজ আর যত বড় সাগরই হোক না কেন, সে 'একজন ফাসেক আলেম'। আর কোনো ফাসেকের স্থান নবীদের পরে হবে, আর শহীদের আগে হবে, এটি কিভাবে সম্ভব?

তাই যদি হয়, তাহলে নবীদের পরেই কি সেই আলেমের স্থান হবে, যে আলেম তার উপর আপতিত অন্য কোনো 'ফরযে আইন' হুকুমকে আদায় করে না?

তাই বর্তমান যামানায় (আপনি মানেন আর না মানেন, কারো নফ্‌স এতে সায় দেক বা না দেক) জিহাদ যখন ফরযে আইন হয়ে গেছে, তখন যে সব আলেম জিহাদ করছে না, জিহাদের বিষয়ে কথা বলছে না, জিহাদের জন্য কলম ধরছে না, জিহাদের জন্য ময়দানে আসছে না, তাদেরকে কেন 'ফাসেক' বলা হবে না?

আর জিহাদ না করার কারণে তারা যদি 'ফাসেক' হয়, তাহলে ফাসেকের স্থান কেন নবীদের পরে আর শহীদের আগে হবে?

এরা কত বড় আলেম যে, এদের জিহাদ করা লাগে না?

এরা কি হযরত আবূ বকর রদিয়াল্লহু আনহুর চেয়েও বড় আলেম?

এরা কি হযরত ওমর রদিয়াল্লহু আনহুর চেয়েও বড় আলেম?

এরা কি হযরত ওসমান রদিয়াল্লহু আনহুর চেয়েও বড় আলেম?

এরা কি হযরত আলী রদিয়াল্লহু আনহুর চেয়েও বড় আলেম?

এরা কি হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লহু আনহুর চেয়েও বড় আলেম?

এরা কি হযরত আবূ হুরাইরা রদিয়াল্লহু আনহুর চেয়েও বড় আলেম?

এরা কি হযরত আমর ইবনুল আস রদিয়াল্লহু আনহুর চেয়েও বড় আলেম?

এরা কি হযরত আবূ উবাইদা ইবনুল জার্‌রাহ রদিয়াল্লহু আনহুর চেয়েও বড় আলেম?

এরা কি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রদিয়াল্লহু আনহুর চেয়েও বড় আলেম?

এরা কি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রদিয়াল্লহু আনহুর চেয়েও বড় আলেম?

এরা কি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রদিয়াল্লহু আনহুর চেয়েও বড় আলেম?

এরা কি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রদিয়াল্লহু আনহুর চেয়েও বড় আলেম?

....

এরা এমনি ভাবে কোন্ সাহাবী রদিয়াল্লহু আনহুর চেয়ে বড় আলেম?

নাকি এরা নিজেদেরকে স্বয়ং আল্লাহর রাসূলের ﷺ চেয়েও বড় আলেম মনে করে? (নাউযুবিল্লাহ)

"ফরযে আইন" অবস্থায় যদি কোনো সাহাবী জিহাদ ছাড়া 'আলেম' না হতে পারেন, বরং মুনাফেকদের তালিকায় নাম চলে যায়, তাহলে বর্তমান যামানার আলেমরা জিহাদ না করে, জিহাদের পক্ষে না থেকে, উল্টো পৃথিবীতে যেন জিহাদ না থাকে সেজন্যে জিহাদের বিরুদ্ধে ফতোয়াবাজি করে কিভাবে "মুনাফিক" হয় না? কিভাবে এরা 'আলেম' হয়ে যায়? শুধু কুরআন-হাদীসের জ্ঞান থাকলেই যদি আলেম হয়ে যায়, তাহলে তো ইবলিস সবচেয়ে বড় আলেম, ইবলিসের স্থান সকল আলেমের উপরে!

হাদীস শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে, "মুনাফিকদের মধ্যে দুটি অভ্যাস পাওয়া যায় না। (১) চমৎকার পথ প্রদর্শন (হিদায়াত), (২) দ্বীনের ইলম (ফিক্হ)।"

হযরত ইমাম গায্যালী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর "এহইয়াউ উলূমিদ্দীন" কিতাবে লেখেন, "মনে রাখতে হবে, সমসাময়িক ধর্মীয় জ্ঞানে জ্ঞানী (কিছু শব্দ ও বাক্যের অধিকারী) আলেমদের কপটতা (মুনাফেকী) দেখে এ হাদীস সম্পর্কে সন্দেহ করা ঠিক হবে না। কেননা ফেকাহ শব্দ বলে আল্লাহর রাসূল ﷺ সে জ্ঞান বুঝাননি, যা আপনারা ধারণা পোষণ করে থাকেন। প্রকৃত ফেকাহবিদ তিনিই যিনি আখিরাতকে দুনিয়া অপেক্ষা উত্তম বলে মানে (এবং তাঁর যিন্দেগীতে তা প্রকাশ পায়)।"

সুতরাং বাহ্যিক লেবাস-পোশাক আর ডিগ্রি দেখে ধোকা খাবেন না!

যে আলেমের মাঝে আখিরাতের ভয় আছে, তিনি কী করে ফিস্‌ক-এর ভয় করেন না?

যে আলেমের মাঝে আখিরাতের ভয় আছে, তিনি কী করে নিফাক্-এর ভয় করেন না?

যে আলেমের মাঝে আখিরাতের ভয় আছে, তিনি কী করে জিহাদ না করে ঘরে বসে থাকেন? জিহাদ ফরযে আইন হওয়া সত্ত্বেও মসজিদ মাদরাসা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন? একটি দেশে ইলমের খিদমতের জন্য কি লক্ষ লক্ষ আলেমের দরকার আছে? সাহাবায়ে কেরামের মাঝে কি সকলেই ফতোয়া দিতেন? একটি দেশের ফতোয়ার খেদমত আঞ্জাম দেয়ার জন্য কয়জন মুফতী দরকার? নিশ্চয় লক্ষ লক্ষ মুফতী সাহেবের দরকার নেই? তাহলে বাকীরা কেন এখনো ঘরে বসে আছেন? উম্মতকে কেন সতর্ক করছেন না? উম্মতকে কেন জিহাদের জন্য প্রস্তুত করছেন না? তাদেরকে কেন জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করছেন না? এই কাজ আপনারা ছাড়া আর কে ভালোভাবে করতে পারবে? কেন এগিয়ে আসছেন না? আল্লাহ তাআলার কাছে কী হিসাব দিবেন, কী জবাব দিবেন, একটু চিন্তা করেছেন কী?

➢ তৃতীয় কারণঃ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "কিয়ামতের দিন আলেমদের লেখার কালি শহীদের রক্তের সাথে ওজন করা হবে।"

হযরত হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আলেমদের লেখার কালি ও শহীদের রক্ত ওজন করা হলে কালির ওজন বেশি হবে।"

এ কারণে, আমরা (আলেমরা) বুকের রক্ত ঝরানোর চেয়ে কলমের কালি দিয়ে যুদ্ধ (জিহাদ) করাকে বেশি ভালোবাসি। আমাদের আমল মীযানের পাল্লায় বেশি ভারী হবে, তাই বেশি লাভজনক কাজ ছেড়ে আমরা (আলেমরা) কম লাভজনক কাজে নিয়োজিত হওয়া পছন্দ করি না।

এ সম্পর্কে কিছু কথা!

✓ হযরত হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ যা বলেছেন, ঠিকই বলেছেন, কিন্তু তা সকল যামানার জন্য প্রযোজ্য নয়। আর যদি তা সকল যামানার জন্যও হয়ে থাকে, তবুও এই কারণে জিহাদ ত্যাগ করা আল্লাহর রাসূল ﷺ কিংবা সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ নয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ ফরমান, "সে সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জান! অবশ্যই আমি আশা করিঃ আমি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে যাব এবং এতে শহীদ হয়ে যাব, এরপর আবার জিহাদে যাব এবং আবার শহীদ হবো, এরপর আবার জিহাদে যাব এবং আবার শহীদ হয়ে যাবো।" (বুখারী-৩১২৩ এবং মুসলিম-১৮৭৬)

যদি মীযানের পাল্লায় শহীদের রক্ত কলমের কালি অপেক্ষা হালকা হতো, আর এ কারণে জিহাদে যাওয়াকে অপছন্দ করা হতো, তাহলে

আল্লাহর রাসূল ﷺ এভাবে বারবার শহীদ হওয়ার তামান্না লালন করতেন না, বরং কলমের জিহাদ করে ঘরেই বসে থাকতেন।

✓ আল্লাহ পাক নবীজী ﷺ-এর প্রতি লাখো-কোটি দরূদ ও সালাম পেশ করুন। আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর হিকমত লক্ষ্য করুন, তিনি কি বললেন, "কিয়ামতের দিন আলেমদের লেখার কালি শহীদের রক্তের সাথে ওজন করা হবে।"!!!

তিনি কিন্তু বলেননি কোন্‌টি বেশি ভারী হবে, কেবল এতটুকুই বলেছেন 'ওজন করা হবে'। সুব্‌হানাল্লাহ!!!

কেন???

তার কারণ, কখনো আলেমের কলমের কালি ভারী হবে, কখনো শহীদের রক্ত ভারী হবে, আবার কখনো দুটোই সমান হবে। এই কারণেই বিষয়টি আল্লাহর রাসূল ﷺ উন্মুক্ত রেখে দিয়েছেন।

এর প্রমাণ কী?

মনে করুন, ফযরের দুই রাকাত ফরয নামায আর রমাযান মাসের রোযা উভয়কে মীযানের দুই পাল্লায় উঠানো হলো, কোন্‌টি ভারী হবে? কোনোটাই ভারী হবে না, দুটোই সমান হবে, কারণ দুটোই ফরযে আইন হুকুম!

আবার চিন্তা করুন, জানাযার নামায এবং কুরআন কারীম হিফয করা এই দুই হুকুমকে যদি মীযানের পাল্লায় উঠানো হয়, তাহলে কোন্‌টি ভারী হবে? এক্ষেত্রেও কোনোটাই ভারী হবে না, দুটোই সমান হবে, কারণ দুটোই ফরযে কিফায়া হুকুম!

এবার আসুন, মীযানের এক পাল্লায় ফযরের দুই রাকাত ফরয নামাযের হুকুম আর আরেক পাল্লায় জানাযার নামাযের হুকুমকে উঠানো হলো, এবার বলুন কোনটি ভারী হবে? অবশ্যই ফযরের দুই রাকাত ফরয নামাযের হুকুম। কেননা এটি ফরযে আইন হুকুম আর জানাযা ফরযে কিফায়া হুকুম।

আচ্ছা বলুনতো, কতগুলো জানাযা (ফরযে কিফায়া) এক সাথে করলে এক ওয়াক্ত ফযরের দুই রাকাত ফরয হুকুমের সমান ওজন হবে?

হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম থেকে শুরু করে, কিয়ামত পর্যন্ত শেষ ব্যক্তির জানাযার নামাযও (ফরযে কিফায়া) যদি মীযানের এক পাল্লায় রাখা হয়, আর এক ওয়াক্ত ফযরের দুই রাকাত ফরয নামায (ফরযে আইন) এক পাল্লায় রাখা হয়, তাহলে ফযরের দুই রাকাত নামাযের ওজনই বেশি হবে। সুবহানাল্লাহ!!!

এবার ভালোভাবে জেনে নিন, প্রয়োজনীয় পরিমাণ ইলম অর্জন করা ফরযে আইন। কিন্তু ইলমে দ্বীনের পাণ্ডিত্য অর্জন করা, ইলমের হেফাযত করা, ইলমী ময়দানে খেদমত করা কখনো ফরযে আইন, কখনো ফরযে কিফায়া। (এ সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে।) অর্থাৎ ইলমী খেদমতের ওজন কম-বেশি হয়।

ঠিক একই রকমভাবে, জিহাদ কখনো ফরযে আইন, কখনো ফরযে কিফায়া। (এ সম্পর্কেও পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।) অর্থাৎ জিহাদ করা, শাহাদাত বরণ করার ওজনও উঠানামা করে।

এখন এই দুইটাকে যদি তুলনা করা হয়, তাহলে আমরা পাই,

✓যখন ইলমী খেদমত এবং জিহাদ উভয়েই ফরযে আইন থাকে, তখন আলেমের কলমের কালি এবং শহীদের রক্ত উভয়ের ওজন সমান হবে।

✓যখন ইলমী খেদমত এবং জিহাদ উভয়েই ফরযে কিফায়া থাকে, তখনও আলেমের কলমের কালি এবং শহীদের রক্ত উভয়ের ওজন সমান হবে।

✓কিন্তু যখন ইলমী খেদমত ফরযে আইন আর জিহাদ ফরযে কিফায়া, তখন আলেমের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়ে ওজন হবে।

✓ঠিক একই কারণে, যখন জিহাদ ফরযে আইন আর ইলমী খেদমত ফরযে কিফায়া, তখন শহীদের রক্তের ওজন আলেমের কলমের কালি অপেক্ষা বেশি হবে।

✓হযরত হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহর সময় ছিল সেই ফেতনার সময়, যখন ইলমী খেদমত ছিল ফরযে আইন, আর জিহাদ ছিল ফরযে কিফায়া, তাই তাঁর এ উক্তি তাঁর যামানার জন্য যথার্থ ছিল।

✓আল্লাহর রাসূলের যামানায়, ইলমী খেদমত এবং জিহাদ উভয়ের গুরুত্ব সমান ছিল, তাই তখন দুটোই ফরযে আইন ছিল বিধায়, সাহাবায়ে কেরামকে দুটোই সমান তালে চালিয়ে যেতে হয়েছিল।

✓কিন্তু বর্তমান যামানায় ইলমী খেদমত ফরযে কিফায়া, আর জিহাদ ফরযে আইন, যা কিয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকবে, ইন্‌শাআল্লাহ। এ কারণে বর্তমান যামানায় নিঃসন্দেহে শহীদের রক্তের ওজন আলেমের কলমের কালি অপেক্ষা বেশি হবে।

✓তাই ইলমী খেদমত 'চলে পরিমাণ' লোককে ইলমী ময়দানে নিয়োজিত করে বাকীদেরকে অবশ্যই ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এটিই দ্বীন। এর বাহিরে যারা অবস্থান করবে, তাঁরা দ্বীন থেকে এমন ভাবে বেরিয়ে যাবে, যেমন ভাবে তীর ধনুক থেকে বেরিয়ে যায়!
আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন।

● বর্তমান যামানায় 'ইলমী খেদমত' নয়, জিহাদই সর্বশ্রেষ্ঠ আমলঃ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন,

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "ফেতনার যামানায় শ্রেষ্ঠ মানুষ সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর শত্রুদের পেছনে ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে। সেও আল্লাহর শত্রুদের সন্ত্রস্ত করে তুলবে, তারাও তাকে ভয় দেখাবে। কিংবা সেই ব্যাক্তি, যে নিজ চারণভূমিতে নিভৃত জীবন অবলম্বন করে নিজের দায়িত্বে আল্লাহ পাকের যেসব হক আছে, সেগুলো পালন করবে।" (মুসতাদরাকে হাকেম, খ. ৪, পৃ. ৫১০)

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো ইরশাদ করেন, "ফেতনার যামানায় সবচেয়ে উত্তম হবে সেই ব্যক্তি, যে তার পশুপালের মাঝে জীবন অতিবাহিত করবে, সেগুলোর যাকাত আদায় করবে এবং আপন রবের ইবাদতে নিমগ্ন থাকবে। আর সেই ব্যাক্তি, যে আপন ঘোড়ার মাথা ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে (সব সময় জিহাদের জন্য প্রস্তুত থাকবে) আর ইসলামের শত্রুদের সন্ত্রস্ত রাখবে। তারাও তাকে ভয় দেখাবে।" (আল ফিতান: খ. ১, পৃ. ১৯০)

নবীজী ﷺ ইরশাদ করেন,“যতদিন পর্যন্ত আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হবে, ততদিন পর্যন্ত জিহাদ সতেজ ও সুমিষ্ট থাকবে। আর অদূর ভবিষ্যতে মানুষের জীবনে এমন একটি সময় আসবে, যে যুগের শিক্ষিত লোকেরা (আলেম কিংবা ইংরেজি শিক্ষিত দ্বীনদার ব্যক্তিরা) বলবে, এটি জিহাদের যুগ নয়। অতএব, যে ব্যক্তি সে যুগটি পাবে, তার জন্য সেটি হবে জিহাদের শ্রেষ্ঠ যুগ।” সাহাবায়ে কেরাম অবাক হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! একজন মুসলমান কি এমন কথা বলতে পারে? (How Strange!!!) নবীজী বললেন, “হ্যাঁ, এমন মুসলমানরা বলবে, যারা আল্লাহ, ফেরেশতা ও সমস্ত মানুষের অভিশাপে অভিশপ্ত।” (আস্‌সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান, খ. ৩, পৃ. ৭৫১)

বর্তমান যামানা যে সেই ফিতনার যামানা, এটা কি কেউ অস্বীকার করতে পারবেন? কেননা বর্তমান যামানায়ই দ্বীনের অনেক অভিশপ্ত মুরুব্বী ও আলেমদের মুখে এ ধরণের ভয়ানক একথা শুনা যাচ্ছে (এখন জিহাদের সময় নয়, বা এখন যা চলছে তা জিহাদ নয়, জিহাদ অন্য কিছু)। তাহলে, বর্তমানে সর্বোত্তম ব্যক্তি হচ্ছেন হাদীসে উল্লেখিত দুই শ্রেণি। এই দুই শ্রেণির মধ্যে আবার মুজাহিদে ইসলাম শ্রেষ্ঠ হবেন, সন্দেহ নেই। কেননা, যারা নিজের চারণভূমিতে অবস্থান করবে, তারাতো কেবল নিজের ঈমান হেফাযত করবে। পক্ষান্তরে ‘মুজাহিদীনে ইসলাম’ নিজেদের ঈমানের পাশাপাশি গোটা উম্মতের ঈমান ও অস্তিত্ব রক্ষার কাজে নিজের জীবনের বাজি লাগাবে। এর জন্য তারা বাড়ি-ঘর, পিতামাতা, স্ত্রী-সন্তান ও সহায়-সম্পত্তি পরিত্যাগ করে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে বুক পেতে দাঁড়াবে। তারা শত্রুদেরও হত্যা করবে, নিজেরাও শহীদ হবে।

লক্ষ্য করুন, হাদীসটিতে সশস্ত্র লড়াই ছাড়া 'হেকমত' খাটিয়ে জিহাদের অন্য কোনো ব্যাখ্যা করার অবকাশ আল্লাহর রাসূল ﷺ রাখেননি। কেননা তিনি জানতেন, তাঁর শেষ যামানার উম্মত জিহাদ থেকে পালানোর জন্য নানা রকম হেকমত ও ফতোয়া উদ্ভাবন করবে। তাই, তিনি নিজেই এর ব্যাখ্যা দিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহর পথের শত্রুদের মোকাবেলায় অস্ত্র হাতে বুকটান করে দাঁড়ানো, ঘোড়ার লাগাম ধরে রাখা (যুদ্ধের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকা), কখন ডাক আসবে আমি রণাঙ্গনে ছুটে যাবো, ইসলামের দুশমনদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে রাখা (সন্ত্রাস!!!), তাদেরকে হত্যা করা, নিজেরাও শাহাদাত বরণ করা, এগুলো কারা করছেন?

এগুলো কি আলেম সমাজ করছেন?

এগুলো কি খানকাহওয়ালা ভাইয়েরা করছেন?

এগুলো কি উম্মতের দাতা গোষ্ঠী ভাইয়েরা করছেন?

এগুলো কি উম্মতের সাধারণ দ্বীনদার ভাইয়েরা করছেন?

এগুলো কি দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের সাথীরা করছেন?

না, তারা কেউই একাজ করছেন না, একাজের কৃতিত্বের দাবীদার একমাত্র এবং কেবল মাত্র দ্বীনের মুজাহিদ ভাইয়েরা!

বর্তমান যামানায় জিহাদ কেবলই সর্বশ্রেষ্ঠ আমল নয়, বরং অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় গুরুত্বের দিক থেকে পঞ্চাশ থেকে একশ গুণ বেশি তাৎপর্যপূর্ণ, এমনকি সাহাবায়ে কেরামের যামানার চেয়েও! কেন?

কারণ-

- ✓ সাহাবায়ে কেরামের যামানায় স্বয়ং আল্লাহর রাসূল ﷺ জিহাদের নেতৃত্বে ছিলেন, বর্তমানে তেমন কেউ নেই।
- ✓ সেই যামানায় নবীজী ﷺ বর্তমান থাকায়, সাহাবায়ে কেরামের ঈমানের শক্তি ছিল বর্ণনাতীত। কিন্তু বর্তমানে যত দিন যাচ্ছে, উম্মতের ঈমানী শক্তি ততই হ্রাস পাচ্ছে।
- ✓ সেই যামানায় মুসলমানদের খিলাফত ছিল, বর্তমানে কোনো খিলাফত নেই।
- ✓ সেই যামানায় সাহাবায়ে কেরাম গুনাহমুক্ত ছিলেন বিধায়, আল্লাহর সাহায্য সহজেই আসত, বর্তমানে উম্মত গুনাহ ছাড়তে পারছে না বিধায় আগের মত মদদ নুসরত পাওয়া যাচ্ছে না।
- ✓ সেই যামানায় কুফ্‌ফারদের শক্তি ও সংখ্যা সাধারণত মুসলমানদের চার থেকে ছয়গুণ হতো, কিন্তু বর্তমানে কুফ্‌ফারদের শক্তির সাথে মুসলমানদের শক্তির কোনো তুলনাই চলে না।
- ✓ হাকীকত হচ্ছে, কুফ্‌ফারদের আছে পারমাণবিক বোমা আর মুসলমানদের কাছে ইট-পাটকেলও নেই।
- ✓ বর্তমান যামানার যে কোনো যুদ্ধ পূর্বের যে কোনো যুদ্ধের চেয়ে বেশি ভয়ানক, বেশি ধ্বংসাত্মক, বেশি ক্ষয়-ক্ষতি বয়ে আনে।
- ✓ সেই যামানায় দেড় হাজার সাহাবী পৃথিবী জয়ের জন্য যথেষ্ট ছিল, বর্তমানে মুসলমানদের মাঝে দুনিয়াপ্রীতি ও মৃত্যুর ভয় প্রবেশ করায় আড়াইশ কোটি মুসলমানও বানের পানিতে ভেসে আসা খড়কুটোর মতো (মূল্যহীন ও দুর্বল) হয়ে গেছে। তাই কুফ্‌ফাররা ইসলাম ও

মুসলমানদেরকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য সম্ভাব্য সকল উপায় অবলম্বন করছে।

এহেন কঠিন ও মারাত্মক পরিস্থিতিতে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমানের কারণে, তাঁদের প্রতি মহব্বতের কারণে, তাঁদের খবরকে সত্য বিশ্বাস করার কারণে, জিহাদের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে, নিজের জীবন বাজি লাগাবে, দুনিয়ার সকল সুখ-শান্তি, চাওয়া-পাওয়াকে আল্লাহর জন্য কুরবানি করবে, তারা উত্তম হবে না তো কারা হবে???

যারা ঘরে বসে আছে, তারা কোন্ যুক্তিতে এই সকল মরদে মুজাহিদের সমান বা উত্তম হবে???

হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী , ফেতনার যামানার একজন শহীদ সাহাবাদের সময়কার পঞ্চাশ জন শহীদের সমান সওয়াব লাভ করবে (গুরুত্বের বিচারে)।

এ থেকেই বুঝা যায়, শেষ যামানায় জিহাদের গুরুত্ব, জটিলতা এবং ভয়াবহতা নবুয়তের যামানা অপেক্ষা পঞ্চাশ গুণ বেশি হবে।

এর চেয়ে ভালো ভাবে বুঝানো আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়!!!

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বর্তমান যামানায় জিহাদের গুরুত্ব বুঝার তাওফীক দান করেন। আমীন।

❖ দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের সাথীদেরকে শয়তানের ধোকা:

যারা দ্বীনের অন্যান্য মেহনতের সাথে জড়িত তাদের জন্যও একই কথা। যারা **দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের** সাথে জড়িত তারা একটু ভেবে দেখি! আমরা ফরযে আইন ইবাদত বাদ দিয়ে আগে যেন নফল বা ওয়াজিব বা ফরযে কিফায়া নিয়ে দৌঁড়াদৌড়ি না করি। কেননা বর্তমানে জিহাদ ফরযে আইন (সকলের উপর ফরয)। তাই অন্য কোনো ব্যাখ্যা না দিলেও এটাই সময়ের দাবী যে, যে যার অবস্থান হতে জিহাদের পতাকা উত্তোলন করবো। তারপরও বলছি, দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের সাথী ভায়েরা সবসময় একটি আত্মতুষ্টিতে ভুগি, সেটি হলো আমরা তো 'নবীওয়ালা কাজ' নিয়ে আছি। কথা তো সত্য! কিন্তু আমাদেরকে ভুলে গেলে চলবে না, নবীওয়ালা কাজ তো শুধু দাওয়াত ও তাবলীগ নয়, মাদরাসায় পড়া, পড়ানোটাও নবীওয়ালা কাজ, ইসলাহী মেহনত করাটাও নবীওয়ালা কাজ, জিহাদ করাও নবীওয়ালা কাজ। আমাদেরকে প্রাধান্য দিতে হবে, বর্তমানে কোন নবীওয়ালা কাজটা ফরযে আইন সেটির উপর। যদি আপনি সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করাকেই নিজের জীবনের ব্রত বানিয়ে থাকেন তাহলে বলছি, যদি দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের উদ্দেশ্য হয়, আমার ঈমান কিভাবে বনে, আমার যিন্দেগী কিভাবে বদলায়, উম্মতের ময়দানে কিভাবে আল্লাহর কালাম বুলন্দ হয়ে যায়, তাহলে বলব, জিহাদ ঈমান ও ইসলামের চূড়া, জিহাদ আমার যিন্দেগীর এসলাহ আরো বেশি করবে, আল্লাহর কালাম বেশি বুলন্দ হবে, আর জিহাদ নিজেই সবচেয়ে বড়ো 'সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ', জিহাদ নিজেই সবচেয়ে বড়ো 'দাওয়াত ও তাবলীগ'। কারণ

জিহাদের দ্বারা কুফর, শিরক, বাতিল ও যাবতীয় ফেতনা যত দ্রুত ও কার্যকরী ভাবে সমাজ থেকে দূর হয় এবং তার স্থলে আল্লাহর দীন মানুষের যিন্দেগীতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তা অন্য কোনো ভাবে সম্ভব না। এর প্রমাণ, নবুয়ত প্রাপ্তির পর মাক্কী যিন্দেগীতে শুধু দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত ছিল, জিহাদ ছিল না, তখন তের বছরে মাত্র দেড় থেকে দুই হাজার মুসলমান হয়েছিলেন। আর হিজরতের পর যখন জিহাদ ফরয করা হলো, তখন মাত্র দশ বছরে লক্ষ লক্ষ সাহাবী তৈরী হয়ে গেলেন। আল্লাহর রাসূলের ওফাতের পর মাত্র দশ বছরে হযরত ওমর রদিয়াল্লহু আনহুর শাসনামলে "আক্রমনাত্মক জিহাদের" মাধ্যমে সিরিয়া, ইরাক, মিশর, রোম, পারস্য জয় হয়ে ইসলাম অর্ধপৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দিকে দিকে মানুষ ইসলামের পরিচয় পেয়ে তার সত্যতা অনুধাবন করে তার সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিতে শুরু করে, আর এটি এজন্য যে মানুষ সাধারণত পৃথিবীর পরাশক্তিদের দ্বারা সবসময়ই প্রভাবিত হয়, তাদের কৃষ্টি-কালচার, সংস্কৃতি, আকীদা-বিশ্বাস সহজেই গ্রহণ করে। নবুয়ত এবং খুলাফায়ে রাশেদার যামানায় এটি কোন্ দাওয়াতের বরকতে সম্ভব হয়েছিলো? তা জিহাদ নয়কি? আল্লাহ তাআলার ইরশাদ, "যখন আসবে আল্লাহ তাআলার সাহায্য ও বিজয়, এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন।" (১১০ সূরা নছর:১-২)

মনে রাখবেন, দাওয়াত হচ্ছে মানুষকে (কুফর/শিরক/অন্যান্য) ফেতনা থেকে আল্লাহর দিকে ডাকার জন্য (এতে হয়তো কিছু মানুষ দ্বীনের সন্ধান পাবে), আর জিহাদ হচ্ছে সমাজ থেকে সেই ফেতনাকে নির্মূল করার জন্য (ফলে সকল মানুষ দ্বীনের ছায়া পাবে)। তাই জিহাদ-ই সর্বোত্তম দাওয়াত।

আরেকটি দুঃখজনক বিষয় হলো, আমরা যারা দাওয়াতের মেহনত করি, তারা জিহাদের আয়াত ও 'আল্লাহর রাস্তা'র ফাযায়েল সম্বলিত হাদীসসমূহকে দাওয়াতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি। এর লাভ হলো, "মানুষ দাওয়াতের দিকে ঝুঁকছে", আর সবচেয়ে ক্ষতি যেটি হয়েছে, "মানুষ জিহাদকে ভুলে গিয়েছে। দাওয়াতের ময়দানকে জিহাদের ময়দান মনে করা শুরু করেছে। জিহাদ না করেও জিহাদের সওয়াব পাচ্ছে বলে বিশ্বাস করা শুরু করেছে।"

স্বীকার করছি, 'আল্লাহর রাস্তা' একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। যে ইলম হাছিল করছে, যে আত্মশুদ্ধির মেহনত করছে, যে দাওয়াত দিচ্ছে, যে জিহাদ করছে, যে মসজিদে নামায পড়তে যাচ্ছে, যে হজ্জ করতে যাচ্ছে, এমনকি যে আপন পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য মজদুরি বা কোনো পেশায় নিয়োজিত আছে, এরা সবাই 'ফী সাবিলিল্লাহ' বা আল্লাহর রাস্তার পথিক। কিন্তু আমাদেরকে তাকাতে হবে সাহাবাদের দিকে, তাঁরা 'ফী সাবিলিল্লাহ'র আয়াত ও হাদীস দ্বারা 'জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ'-ই বুঝতেন।

আবার খেয়াল করুন, 'জিহাদ' শব্দটির একটি সাধারণ অর্থ এবং একটি পারিভাষিক অর্থ রয়েছে। "জিহাদের" সাধারণ অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, শরীয়তের শিক্ষা ও নির্দেশনা অনুযায়ী ইসলামের কালিমা বুলন্দ করার জন্য যে ত্যাগ, তিতিক্ষা, কষ্ট ও মুশাক্কাত সহ্য করা হয় তাই জিহাদ, তা যে কোনো পথেই হোক বা যে কোনো পন্থায়ই হোক না কেন।

কিন্তু "জিহাদ" যা শরীয়তের একটি পরিভাষা, তার অর্থ হলো, আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করা, ইসলাম ও মুসলমানদেরকে রক্ষা করা, মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি করা ও কাফের মুশরিকদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে চূর্ণ করার জন্য আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাফের মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করা। এটিই জিহাদের শরয়ী অর্থ। (কিতাবুল জিহাদ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. পৃ. ২৪)

এখন প্রশ্ন হলো আমরা কোন্ অর্থকে গ্রহণ করবো, আগেরটা না পরেরটা, নাকি দুটাই? খুব ভালোভাবে মনে রাখবেন, শরীয়তের কোনো একটি পরিভাষার ক্ষেত্রে সাধারণ অর্থ গ্রহণযোগ্য নয়, শরয়ী অর্থই গ্রহণ করতে হবে। বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যাক। 'যাকাত' এর সাধারণ অর্থ 'পবিত্র করা'। ওযু করে পবিত্রতা হাছিল করলেই "যাকাত" আদায় হবে না। শরীয়তের পরিভাষায় "যাকাত" বলতে আমরা শুধু পবিত্র করা বা হওয়া বুঝি না, আমরা বুঝি 'যার নেসাব পরিমাণ মাল এক বছর অতিবাহিত হবে, তার সম্পদের আড়াই শতাংশ কুরআনে বর্ণিত সাত শ্রেণির উপযুক্ত হকদার ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে সম্পদকে পবিত্র করা।' আবার দেখুন 'সিয়াম' (রোযা) অর্থ সংযমী হওয়া/বিরত থাকা। একজন লোক চুরি করা বা মিথ্যা বলা থেকে সংযমী হলো/বিরত থাকল, তাতেই কি তাকে 'সায়িম' (রোযাদার) বলা যাবে? না। যে ব্যক্তি সুবহে সাদিক থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সম্ভোগ থেকে বিরত থাকল, তাকেই কেবল শরীয়তের পরিভাষায় 'সায়িম' (রোযাদার) বলা হবে। একই ভাবে 'সালাত' (নামায) শব্দের অর্থ 'দুআ বা আশীর্বাদ'। শুধু দুআ করলেই কি নামায আদায় হয়ে যাবে? হবে না।

আমরা এগুলো বুঝি, কিন্তু জিহাদের ক্ষেত্রে কেন জানি বুঝে আসে না, সাহাবায়ে কেরাম জিহাদ বলতে "সশস্ত্র যুদ্ধ"-কেই বুঝতেন, অন্য কিছুকে নয়, কেননা এটিই শরীয়তের উদ্দেশ্য। আমাদের নফ্স (মন) বোধ হয় জিহাদকে ময়দানের বাহিরে খুঁজতেই বেশি ভালোবাসে!!!

তাই আমরা সতর্ক হই, জিহাদের ফাযায়েলকে দাওয়াতের মধ্যে টেনে না আনি, এতে দ্বীন বিকৃতি ও বিদআতের গুনাহ হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। আর যারা জিহাদের বা আল্লাহর রাস্তার ফাযায়েল লাভ করার প্রয়োজন বোধ করি, তারা একটু কষ্ট করে ময়দানে আসি।

❖ ইসলাহী মেহনত করনেওয়ালা সাথীদেরকে শয়তানের ধোকা:

আমরা যারা **ইসলাহী মেহনত** করি, তারা মনে করি, যারা নিজেদের সোহাগিনী ও প্রাণ-প্রিয়া স্ত্রীদের ছেড়ে, কলিজার টুকরা আদরের সন্তানদের ছেড়ে, মমতাময়ী মায়ের আচলকে উপেক্ষা করে, পিতার স্নেহ হতে নিজেদেরকে বঞ্চিত করে, খেয়ে না খেয়ে, পরে না পরে, গুহার আঁধারে রাত্রিযাপন করে, জিহাদের তপ্ত ময়দানে নিজের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিচ্ছে, তারা ছোট জিহাদ (জিহাদে আসগর) করছে আর আমরা যারা স্ত্রী-সন্তান-পিতা-মাতা নিয়ে আনন্দ-ফূর্তিতে লিপ্ত, তিন বেলা পেট পুরে আহার করছি, ফ্যান-এসি, গ্যাস-বিদ্যুৎ আর রঙ-বেরঙের আলোকসজ্জায়, সকল সুবিধা নিয়ে শহরের পাকা বাড়িতে মজ-মাস্তি করছি, আর যেহেতু আমি অমুক পীরে হক্কানীর হাতে বাইয়াত হয়েছি, তাই আমি বড় জিহাদ (জিহাদে আকবর) করছি। আহ্! কী এক তৃপ্তির ঢেকুর.....!

একটু চিন্তা করে দেখুন তো, কেমন বিচার আপনার! একটি হাদীসের উপর ভিত্তি করে (যেই হাদীসে নবীজী ﷺ এক জিহাদ হতে ফিরে এসে বলেছিলেন,"আমরা জিহাদে আসগর/ময়দানের জিহাদ হতে জিহাদে আকবর/নফসের জিহাদের দিকে ফিরে এলাম।") সেই হাদীসের অর্থ না বুঝে, আপনি এতবড় একটা অবিচার দ্বীনের মুজাহিদীনদের সাথে করতে পারেন না, তাদের উপর এমন একটি অপবাদ চাপিয়ে দিতে পারেন না- "তারা ময়দানে ছোট জিহাদ করছে আর আমরা ঘরে বসে বড় জিহাদ করছি।" এই ব্যাপারে আমি নিজে কিছু বলতে চাইনা। কেননা, এই ব্যাপারে আমি কিছু বললে, সালেকীন ভায়েরা হয়ত আমার কথা গ্রহণ নাও করতে পারেন, তাই এই ব্যাপারে পীর-মুরীদীর লাইনে শীর্ষ একজন

আলেম, যিনি হিন্দুস্তানে আধ্যাত্মিক মেহনতের রাহবার, হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত শাহ আশরাফ আলী থানবী রাহিমাহুল্লাহর এই ব্যাপারে একটি বিখ্যাত উক্তি আছে সেটিই উল্লেখ করতে চাই।

তিনি বলেন, "আজকাল সাধারণভাবে মানুষের ধারণা এই যে, কাফেরদের সাথে লড়াই করা জিহাদে আসগর (ছোট জিহাদ) এবং নফসের মুজাহাদা (কুপ্রবৃত্তির দমন ও আত্মশুদ্ধি) জিহাদে আকবর (বড় জিহাদ)। যেন তারা নিভৃতে নফসের মুজাহাদায় নিমগ্ন হওয়া থেকে কাফেরদের সাথে লড়াই করাকে সকল ক্ষেত্রেই নিম্নমানের মনে করে।

এই ধারণা ঠিক নয়। বরং বাস্তব কথা হলো, কাফেরদের সাথে লড়াই করা ইখলাস শূণ্য হলে বাস্তবিকপক্ষেই তা নফসের মুজাহাদা থেকে নিম্নমানের কাজ। এ ধরণের লড়াইকেই জিহাদে আসগর এবং বিপরীতে নফসের মুজাহাদাকে জিহাদে আকবর বলা হয়েছে।

কিন্তু কাফেরদের সাথে লড়াই যদি ইখলাসপূর্ণ হয় তবে এই লড়াইকে জিহাদে আসগর বলা গাইরে মুহাককিক (অগভীর জ্ঞানের অধিকারী), সুফীদের বাড়াবাড়ি, বরং এই লড়াই অবশ্যই জিহাদে আকবর এবং তা (ময়দানে ইখলাসের সাথে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ করা) নিভৃতে নফসের মুজাহাদায় নিমগ্ন হওয়া থেকে উত্তম। কেননা যে লড়াই ইখলাসপূর্ণ হবে তাতে নফসের মুজাহাদাও বিদ্যমান থাকবে। সুতরাং এতে উভয় জিহাদের ফযীলতই একত্রিত হচ্ছে।" (আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যাহ খঃ ৪, হিস্সা: ৫, পৃঃ ৮২, মালফূয, ১০৪১)

সবচেয়ে বড় কথা হলো, সাহাবায়ে কেরাম আমাদের মতো কোনো দিন 'জিহাদে আকবরের' ধূঁয়া তুলে, সশস্ত্র জিহাদকে ত্যাগ করে ঘরে বসে থাকেননি, আর মনে করেননি যে, আমরা নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করেই ময়দানের সওয়াব হাছিল করছি।

যারা সুলূকের (আত্মশুদ্ধির) লাইনে মেহনত করে থাকি, তারা একটু খেয়াল করি, হযরত আশরাফ আলী থানবী রাহিমাহুল্লাহর "যে লড়াই ইখলাসপূর্ণ হবে তাতে নফসের মুজাহাদাও বিদ্যমান থাকবে।"-এ কথার ব্যাখ্যা কী?

আমরাতো নফসের সাথে কম খাওয়া, কম ঘুমানো, কম কথা বলা, কম মিলামিশা করা ইত্যাদির মেহনতই করে থাকি, যেন আমাদের নফস দূর্বল হয়, আমরা গুনাহমুক্ত হতে পারি, তাইনা?

আপনি যখন জিহাদের ময়দানে থাকবেন, আপনার জীবনে খুব কম দিনই আসবে যেদিন আপনি পেটভরে তিন বেলা খেতে পারবেন কিংবা আপনার চাহিদা মাফিক কোনো খাবার, ফলমূল পাবেন (এটি হলো কম খাওয়ার মেহনত)।

ময়দানে আপনাকে 'রিবাত' তথা সীমানা পাহারা দেয়া, কিংবা ছামানা ও অস্ত্র-শস্ত্র পাহারা দেয়া, নৈশকালীন অভিযান, এক স্থান ত্যাগ করে অন্য স্থানে গমন, নরম বিছানা নেই, মাটি কিংবা পাথরের উপর পিঠ স্থাপন, ফ্যান-এসির অভাব, পোকা-মাকড় ও মশার কামড়, যে কোনো সময় শত্রুর আক্রমণ/বোম্বিং-এর ভয় ইত্যাদি সবকিছু মিলে আপনি কোনোদিনই শান্তি বা পরিপূর্ণ তৃপ্তির ঘুম ঘুমাতে পারবেন না (এ হলো আপনার কম ঘুমানোর মেহনত)।

ময়দানে যখন আপনি সর্বদা মাথার উপর মৃত্যুকে দেখবেন, তখন আপনার পেট থেকে খোশগল্প বের হবে না। এটি 'নিরহঙ্কারপূর্ণ গাম্ভীর্য'। (এই হলো কম কথা বলার মেহনত)।

আর ময়দানে আসার আগে আপনি তো আপনার স্ত্রী-সন্তান-সন্ততি-পিতা-মাতা-বন্ধু-বান্ধব ছেড়েই আসবেন, তাইনা? তাহলে অধিক মেলামেশার সম্ভাবনা কোথায়? ময়দানের সাথীদের সাথে যে মিলামিশা হবে সেটি হবে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই নিয়ন্ত্রিত। (এটি হলো কম মিলা-মিশার মেহনত)।

ময়দানে তো আর আপনি রাস্তা-ঘাটের বেপর্দা মহিলাদের দেখবেন না, গান-বাদ্য আর অশ্লীল কথা শুনবেন না, কম খাওয়া আর কম ঘুম, চব্বিশ ঘন্টা মৃত্যু ও আখিরাতের চিন্তা, এসব পারিপার্শ্বিকতার চাপে পড়ে আপনার নফস্ এমনি সোজা হয়ে যাবে। আলাদা ভাবে নফসের মুজাহাদার প্রয়োজন পড়বে না। তাছাড়া ময়দানে আপনি যখন নিজের চোখে আল্লাহ তাআলার সাহায্য দেখবেন, দেখবেন যে শহীদদের লাশ পঁচে-গলে যাচ্ছে না, রক্ত লাল কিন্তু ঘ্রাণ অপার্থিব কোনো মেশকের, হাস্যোজ্জ্বল শুহাদাদের চেহারা, চিন্তা করুন তো, তখন আপনার ঈমান কেমন হবে? এগুলো কি ঘরে বসে থেকে অর্জন করা সম্ভব? কক্ষনো নয়।

এছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "এই উম্মতের বৈরাগ্য হচ্ছে জিহাদ।" অর্থাৎ বৈরাগ্য সাধনার জন্য, কৃচ্ছ্রতা সাধনের জন্য চিরকুমার সেজে, পরিবার পরিজন ছেড়ে খাল্‌ওয়াতের (একাকীত্ব) উদ্দেশ্যে বনে জঙ্গলে যাওয়ার এই উম্মতের প্রয়োজন নেই। জিহাদের মাঝেই রয়েছে উম্মতের জন্য বৈরাগ্য। বৈরাগ্য সাধনার সকল উপাদান জিহাদে বর্তমান রয়েছে। এটিই উম্মতের জন্য কৃচ্ছ্রতার সাধনা।

কেউ কেউ বলেন, ভাই! আমরা এখন ইখলাস বানানোর মেহনত করছি। ইখলাস তৈরি হয়ে গেলে আমরা জিহাদ করবো। তাহলে আমি বলবো, এটি শয়তানের একটি ধোকা, আপনার দ্বারা জিহাদ কস্মিনকালেও সম্ভব না। কেননা ইখলাসের কোনো বাহ্যিক সূরত নেই, যা দেখে আমরা বুঝতে পারবো, আমার/আপনার ইখলাস অর্জন হয়ে গেছে। আমি যখন বললাম, "আমি আল্লাহর জন্য জিহাদ করছি" আর আমার ভিতর ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, র‍্যাংক, মালে গনিমত, বীর খেতাব লাভ করার অভিলাষ নেই, কেবলই আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা, তাঁর হুকুম পালন, আল্লাহর রাসূলের অনুসরণ, সাহাবায়ে কেরামের অনুকরণ, নির্যাতিত মুসলমানদের উদ্ধার করা, দুনিয়া থেকে ফেতনা ও বদদ্বীনী মিটানো ইত্যাদি উদ্দেশ্যে জিহাদ করব, কেউ আমাকে চিনুক বা জানুক এই আশা করিনা, তখন এটিই ইখলাস। এর জন্য বছরের পর বছর মেহনত করার কোনো দরকার নেই। কখনো মনে উল্টা-পাল্টা চিন্তা আসলে সাথে সাথে তাওবা করে নেয়া। আপনি কী মনে করেছেন, "ইখলাস তৈরির মেহনত করছি" বলে জিহাদ ত্যাগ করলে আল্লাহ আপনাকে ছেড়ে দিবেন? আল্লাহ তাআলা আমাদের সুমতি দান করেন। আমীন।

❖ ইসলামী রাজনীতি করনেওয়ালা সাথীদেরকে শয়তানের ধোকা:

আরেকদল আছেন, যারা **ইসলামী রাজনীতি (সিয়াসত)** নাম দিয়ে কুফরকে ইসলামী লিবাস পরিয়েছেন। এদের সম্পর্কে বেশি কিছু বলতে চাইনা। কেননা, কুফরকে ইসলামী পোশাক পরালেই তা কখনোই ইসলাম হয়ে যায় না। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র, ইত্যাদি তন্ত্র-মন্ত্র এগুলো শয়তানী তরীকা। সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠার মেহনত মোট চার প্রকার, যথা: ইলম (তথা তালীম ও তরবীয়ত- যা মাদরাসায় করা হয়), তাযকিয়া (আত্মশুদ্ধি- যা খানকাহ সমূহে করা হয়), দাওয়াত (যা উম্মতের ময়দানে করা হয়) ও জিহাদ (যা কাফেরদের যুলুম থেকে উম্মতকে বাঁচানো কিংবা যুদ্ধের মাধ্যমে কুফ্ফারদের ভূমি দখল করে সেখানে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করার দ্বারা করা হয়)। আর ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার পর ইসলামী খিলাফা অনুযায়ী মুসলিম সাম্রাজ্য পরিচালিত হবে। এর বাহিরে অন্য সকল মেহনত আর তন্ত্র-মন্ত্র বাতিল ও ত্বগুত। **নবুওয়ত ও সাহাবাদের যামানায় এগুলোর বাহিরে অন্য কোনো মেহনত ছিল না।** আল্লাহর রাসূল ﷺ জীবনে একটি মুহূর্তের জন্যও বাতিলের সাথে এই মর্মে সমযোতা করেননি, তোমরা আমাদের ধর্মের কিছু মেনে নাও, আর আমরাও তোমাদের ধর্মের কিছু মেনে নিচ্ছি। যারা গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রকে ধারণ করে সাথে সাথে ইসলামী হওয়ার দাবী করে, তাদের দৃষ্টান্ত "ইসলামী মদ" কিংবা "ইসলামী সুদ"-এর মতো। মদের সাথে কিংবা সুদের সাথে ইসলামী শব্দ যোগ করলেই যেমন তা হালাল হয়ে যায় না, তেমনি গণতন্ত্রের সাথে কিংবা সমাজতন্ত্রের সাথে ইসলামী শব্দ যোগ করলেই তা আল্লাহ তাআলার কাছে কস্মিনকালেও গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবার গণতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচনে যারা অংশ নেয়, যারা পার্লামেন্টে যায়, **সরকারি সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করে,** এই নিয়তে যে সেখানে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করবে, তাদের দৃষ্টান্ত হলো ঐ ব্যক্তির মতো যে মদ খায় আর বলে আমি মদ এই জন্য খাই যেন মদের ক্ষতিকর দিকগুলো বুঝে মানুষকে মদ থেকে বারণ করতে পারি, কিংবা ঐ ব্যক্তির মতো, যে পতিতালয়ে যায়, পতিতাদের সাথে মিলামিশা করে এই আশায়, এদের সাথে মিশতে মিশতে, ঘনিষ্ট হতে হতে একদিন তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিব। এরা সবাই গোমরাহ, বাতিল, ত্বগুত, বিদআতী।

আরেকদল আছে যারা গণতন্ত্রকেই জিহাদ মনে করে, মিটিং-মিছিল করে নিজেদেরকে মুজাহিদ মনে করে, তাদের নেতাদেরকে 'আমীরে মুজাহিদীন' মনে করে। বলে কী!!! যারা এধরণের কথা বলে তাদের জন্য একটি ছোট্ট উপমা। জিহাদ হলো মধুর মতো, যা সকল রোগের জন্য মহৌষধ। মধু পান করলে যেমন সর্বরোগ থেকে বাঁচা যায়, তেমনি জিহাদ দ্বারা সমাজের সকল প্রকার ফেতনার মূলোৎপাটন হয়ে সমাজ সকল প্রকার সামাজিক ব্যাধি থেকে মুক্ত হয়।

অন্যদিকে গণতন্ত্রের উদাহরণ চলে 'মূত্র কিংবা বীর্যের' সাথে। নাপাক মূত্র বা বীর্য যেমন পানকারীদের জন্য ঘৃণিত, অপবিত্র ও হারাম, যা পান করলে নানারকম ব্যাধি দেখা দিবে এবং দেহ বিনাশপ্রাপ্ত হবে, ঠিক তেমনিভাবে যারা জিহাদ মনে করে 'গণতন্ত্রের সুধা' পান করছে, তারা যেন মধু মনে করে এসকল নাপাকী পান করছে, যার দ্বারা তারা নিজেরা ব্যধিগ্রস্ত হয়ে ধ্বংস হচ্ছে, ইসলামকে ধ্বংস করছে, উম্মতকে ধ্বংসের পথ দেখাচ্ছে!!!

এর প্রমাণ, এই লোকগুলোই আজ সত্য জিহাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে, প্রকৃত জিহাদের বিরুদ্ধে মিটিং-মিছিল-র‌্যালী করছে, ফতোয়াবাজী করছে, মিথ্যা ও ভ্রান্ত প্রোপাগান্ডা দিয়ে উম্মতকে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে বিষীয়ে তুলছে। নিজেদের মাদরাসাগুলোকে 'জঙ্গীমুক্ত' (ওরফে জিহাদমুক্ত!!!) ঘোষণা দিতে খুব তৃপ্তি বোধ করছে, এক প্রকারের 'পাশবিক' আনন্দ লাভ করছে! বস্তুতঃ তারা যা পান করছে, তা তো মূত্র কিংবা বীর্যের চেয়েও নিকৃষ্ট। কেননা মূত্র বা বীর্য পান করা কুফুরী নয়, গুনাহে কবীরা, কিন্তু গণতন্ত্র কোনোরূপ যুক্তিতর্ক ছাড়াই নিরেট কুফুরী!!!

আমার লিখা পড়ে অনেকেই বলতে পারেন, মাহমুদ সাহেব! আপনি এ পর্যন্ত অনেক অশ্লীল কথা বলে ফেলেছেন, অনেক অশ্লীল উদাহরণ টেনেছেন। এবার থামুন!

উত্তরঃ সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি বলব,

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِيْ مِنَ الْحَقِّ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সত্য প্রকাশ করার ব্যাপারে লজ্জাবোধ করেন না।"

তাই আমিও করবো না। আজ উম্মতকে বুঝানোর জন্য আমি এসব উদাহরণ দিতে বাধ্য হচ্ছি; এসব উপমা দিচ্ছি যেন তারা বুঝে তারা কী করছে, যেন তাদের টনক নড়ে। আমি যা বলেছি, তার হাকীকত যদি বুঝতেন তাহলে আপনিই বলতেন, ভাই আপনি যা বলেছেন তা খুব নগণ্যই হয়েছে। এই লোকগুলোর কার্যকলাপ এর চেয়েও নিকৃষ্ট।

হায়! আমরা একেতো কোন্ আমলের গুরুত্ব কতটুকু তা বুঝি না, এর চেয়েও খারাপ কথা হলো, কোন্ গুনাহটা কতটা মারাত্মক সেটাও বুঝি না। কোন্ গুনাহের খারাবী কতটুকু তা উপলব্ধি করতে পারি না। কোন্ গুনাহটা অধিক ঘৃণিত, অধিক জঘন্য তা বুঝি না!!!

উদাহরণস্বরূপ, মনে করুন, আপনার এলাকার এক ব্যক্তি তার মায়ের সাথে জিনা করলো। এই খবরটা আপনার এলাকায় যখন ছড়াবে, তখন আপনি এবং আপনার এলাকার লোকজন ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে কী কী করবেন? একটু চিন্তা করুন তো! ছি ছি দিবেন! লোকটা করলো কী! এমন খারাপ কাজও কি মানুষ করে! লোকটাকে পারলে বয়কট করবেন। তার সাথে কথাবার্তা লেনদেন বন্ধ করে দিবেন। সে যখন রাস্তা দিয়ে যাবে তাকে কটুক্তি করবেন। বলবেন, লোকটা এলাকার মান-ইজ্জত সব শেষ করে দিলো! লোকটাকে 'ওয়াক্ থু' দিবেন। আরো যদি পারেন, লোকটাকে এলাকা থেকে বের করে দিবেন, তাই না! আর না হলে পুলিশে দিবেন। এই তো!

এবার ধরুন, আপনার এক বন্ধু কিংবা এক আত্মীয় কিংবা এলাকার এক ভাই/বোন সুদের ব্যবসা করে। আচ্ছা! এই ব্যক্তিটাকে আপনি ও আপনার সমাজ কি করবেন? যেই লোকটা তার মায়ের সাথে যিনা করলো, সে লোকটির সাথে যে আচরণ আপনি ও আপনার সমাজ করেছে, এই সুদখোর ব্যক্তিটির সাথে কি সেই একই আচরণ করবেন, তাকে কী একই রকম ঘৃণার চোখে দেখবেন? কখনোই এক আচরণ করবেন না, একই রকম ঘৃণার চোখে দেখবেন না। বরং আপনি এবং আপনার সমাজ লোকটিকে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিবেন, ঘাড়ে হাত রেখে রাস্তায় হাঁটবেন, মাঝে

মাঝে বাসায় এনে দাওয়াতও খাওয়াবেন, লোকটি আপনারই বন্ধু হলে "দোস্ত" সম্বোধন করবেন, অভাবে পড়লে আপনিও তার কাছে গিয়ে সুদের উপর ঋণ নিবেন। তাই না?

আচ্ছা! এবার আপনাকে আবারো প্রশ্ন করি, বলুনতো, এই দুই ব্যক্তির মধ্যে কোন্ লোকটি আসলে অধিক ঘৃণিত ছিল? অবশ্যই সুদখোর! সুদ খাওয়া নিজের মায়ের সাথে সত্তর বার যিনা করার চেয়েও বেশি খারাপ কাজ। কিন্তু আপনি ও আপনার সমাজ প্রথম ব্যক্তির সাথে বেশি খারাপ আচরণ করলেন, কেন? কেন এমন করলেন, জানেন? কারণ আপনি এবং আপনার সমাজ কোন্ গুনাহের খারাপী কতটুকু তা বুঝেন না? যেই ব্যক্তিটি (নিজের মায়ের সাথে যিনাকারী) আপনি ও আপনার সমাজের কাছে বেশি খারাপ আচরণ ভোগ করেছে, সে ব্যক্তিটি আল্লাহ তাআলার কাছে দ্বিতীয় ব্যক্তিটির (সুদখোরের) চেয়ে সত্তর গুনের চেয়েও উত্তম ছিল।

মনে রাখবেন, যে সুদ খায় সে যেমনই নিকৃষ্ট ও অভিশপ্ত, ঠিক তেমনি যারা সুদ দেয়, সুদের সাক্ষী থাকে, দলীল/ডকুমেন্ট লিখে দেয়, দালালী করে/সুদের সন্ধান দিয়ে দেয়, এভাবে যারাই সুদের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে, সকলেই সমান পাপী এবং অভিশপ্ত।

যদি আমার কথা বুঝে থাকেন, তাহলে আমার নিচের কুইজ দু'টির উত্তর দিন।

কুইজ-১:

বলুনতো, কোন্ জায়গাটি আল্লাহ তাআলার কাছে বেশি অপ্রিয়? পতিতালয় নাকি ব্যাংক?

কুইজ-২:

বলুনতো, কোন্ পেশাটি আল্লাহ পাকের দৃষ্টিতে অধিক নিকৃষ্ট? বেশ্যাবৃত্তি নাকি ব্যাংকের চাকুরি?

আসল ব্যাপার হলো, শয়তান যেমন ভাবে মানুষকে আমলের গুরুত্ব বুঝতে দেয়না, ফলে এর দ্বারা সে মানুষকে অধিক সওয়াবের কাজ থেকে দূরে রাখে; ঠিক একই রকমভাবে মানুষকে শয়তান গোনাহের খারাপী ও ঘৃণার পর্যায় বুঝতে দেয় না, তুলনামূলক ছোট নাফরমানীমূলক কাজগুলোর গুনাহকে বড় করে দেখায় আর তুলনামূলক বড় নাফরমানীমূলক কাজগুলোর গুনাহ সম্পর্কে ভুলিয়ে দেয়, অজ্ঞ কিংবা গাফেল রাখে; ফলে মানুষ তুলনামূলক কম খারাপ কাজকে বেশি ঘৃণার কাজ মনে করে, পাহাড়ের মতো ভারী মনে করে; আর বেশি খারাপ কাজকে কম ঘৃণার কাজ মনে করে, মশা-মাছির মতো হালকা মনে করে। যার ফলে সে ছোট গুনাহ থেকে ঘৃণার সাথে দূরে থাকে আর বড় গুনাহ গুলো তৃপ্তির সাথে করতে থাকে।

এই কারণেই আমাদের সমাজে অধিক ভয়াবহ গুনাহগুলো অকপটে, প্রকাশ্য দিবালোকে, বাধাহীনভাবে চলে, আর ছোট গুনাহগুলোর ক্ষেত্রে বাধা বেশি আসে। এই কারণেই সমাজে এক ব্যাটা ফুচ্‌কা চোর মার খেয়ে জান হারায়, আর ঘোষখুর রাঘববোয়ালদের 'স্যার স্যার' করা হয়। মা-

বাবাকে না জানিয়ে বিয়ে করাকে অনেক বড় দোষ মনে করা হয়, কিন্তু ছেলে-মেয়েরা অবৈধ দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করছে, এটাকে হালকা মনে করা হয়।

ঠিক একই কারণে, আজ অনেক আলেমরাও নামাযে হাত উঠানো (রফ্উল ইয়াদাইন) নিয়ে মাতামাতি করে, ধর্মীয় সভাগুলোতে কথার বোমা ফাটায় কিন্তু কুফরের বিরুদ্ধে চুপ! উম্মত নামাযে 'আমীন' জোরে বলে কিংবা আস্তে বলে, উম্মত গেলরে! কিন্তু উম্মত গণতন্ত্রকে মেনে নিয়েছে, নারী নেতৃত্বকে মেনে নিয়েছে, এগুলোর বিরুদ্ধে 'টু' শব্দটা পর্যন্ত করে না!

আবার আরেকদল আলেম আছে যারা দেশে নাস্তিক-মুরতাদদের অস্তিত্ব স্বীকার করতে নারাজ, খেলাফে সুন্নত তাদের কাছে মহা গুনাহ, কিন্তু খেলাফে ঈমান (কুফর) তাদের কাছে কিছুই না।

যারা সমাজে নাস্তিক-মুরতাদ খুঁজে পান না, তাদেরকে বলি, আমাদের সমাজে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শানে গোস্তাকী করার মতো লোকের কি অভাব আছে? আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন: "যে কোনো ব্যক্তিই রাসূল ﷺ এর অবমাননা করবে, চাই তা ইচ্ছাকৃত হোক বা ঠাট্টাচ্ছলে হোক, সে কাফের হয়ে যাবে।" [আসসারিমুল মাসলূল আলা শাতিমির রাসূল: পৃ.৩১-৩২]

ইমাম ইবনে হুমাম রাহিমাহুল্লাহ লিখেন: "যে কোন ব্যক্তিই রাসূল সা. এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে, সে মুরতাদ হয়ে যাবে।" [ফাতহুল কাদীর: খ.৪, পৃ: ৪০৭]

যেই সকল মুজাহিদ ভাই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অবমাননাকারীদের হত্যা করে, তাদেরকে আবার অনেক আলেম সহ্য করতে পারে না।

তাদের দীলের মধ্যে মানবপ্রীতি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি জেগে উঠে। মুজাহিদদেরকে তারা নৃশংস, মানবতাবিরোধী মনে করে। তাদের মতে আগে সেই সকল জারজদের দাওয়াত দেয়া দরকার ছিল, কেননা তারা তো বুঝে না। হায়রে মূর্খের দল! পাশ্চাত্যের গোলামী করতে করতে তোদের মন-মগজ গোবরে ভরে গিয়েছে।

ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন-"আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে কষ্টদাতা 'ওয়াজিবুল-কতল' বা তাকে হত্যা করা ওয়াজিব।' [আসসারিমুল মাসলূল আলা শাতিমির রাসূল (উর্দূ তরজমা) : পৃ ৬২]

ইমাম মালিক রহ. বলেন:"যদি কেউ একথা বলে থাকে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জামার বোতামটাও ময়লা, তাহলে তাকেও হত্যা করা হবে।"

কাজী ই'য়াজ রাহিমাহুল্লাহ তার 'আশ শিফা' নামক কিতাবে বলেন:"যে কেউ এমন কোনো কথা বলল যা রাসূল ﷺ কে নিন্দা করে বলা হয়, কোনো রকম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা ছাড়াই তাকে হত্যা করা হবে।"

অর্থাৎ এটি এমন এক ভয়াবহ গুনাহ এবং যারা এ কাজ করবে, এদেরকে হত্যা করার জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের কোনো পরওয়ানা লাগবে না, কোনো মুজাহিদ বাহিনীর আমীরের হুকুম লাগবে না, যে কেউ যে কোনো সময় এদেরকে হত্যা করতে পারবে।

আমাদের সমাজে আরেকদল আলেমতো মুশরিকদেরকেও "কাফের" বলতে নারাজ। তাদের মুখে শুনা যায় "হিন্দুদের কাফের বলা উচিত নয়, কেননা তারা এতে কষ্ট পায়।" হায় হায়, বলে কী! কবে যে এরা বলে বসে "ইবলিসকে 'শয়তান' বলা ঠিক নয়, কেননা সে এতে কষ্ট পায়", ওরে আমার হুস্নে মুআশারাত রে! একটি কুফর কিংবা একটি শিরকের কারণে যেখানে আকাশ ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়, সেখানে এসব

নামধারী আলেমদের কাছে বিষয়টি এতই হালকা, যেন এটি কোনো গুনাহ্ই না! তিনি কি জানেন না, 'যে কাফেরকে 'কাফের' বলে না, সে নিজেই কাফের হয়ে যায়।' এসব "মুরজিয়া" মূর্খদের কারণেই উম্মতের আজ এই বেহাল অবস্থা!

যাই হোক, পূর্বের আলোচনায় ফিরে যাওয়া যাক! মনে করুন! একজন মুসলমান ব্যক্তি নিয়মিত পতিতালয়ে যায়, আরেকজন মুসলমান ব্যক্তি গণতান্ত্রিক সরকারের নির্বাচনে অংশ নেয়, পার্লামেন্টে (সংসদ ভবনে) যায়। কোন্টা বেশি খারাপ মনে হয়? শুনতেতো পতিতালয়ে গমনকারী সেই মুসলমানের কাজটাই বেশি খারাপ মনে হয়, তাই না? কিন্তু প্রকৃত অর্থে, আল্লাহ তাআলার কাছে দ্বিতীয় ব্যক্তির কাজটা এতোটাই অপছন্দীয় যে, কেয়ামত পর্যন্ত কোনো মুসলমান যদি প্রতিদিন পতিতালয়ে যায় সেটি আল্লাহর কাছে যতটা না খারাপ, কোনো মুসলমান যদি একবারও গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষ হয়ে নির্বাচনে অংশ নেয় কিংবা পার্লামেন্টে যায়, কিংবা একবার ভোট দেয়, সেটি আল্লাহর কাছে বেশি খারাপ, বেশি জঘন্য। কেন জানেন?

কারণ, প্রথমটি কবীরা গুনাহ, আর দ্বিতীয়টি কুফ্র। আর **কুফরের গুনাহের সামনে গুনাহে কবীরার গুনাহ কিছুই না।** কেননা, পতিতালয়ে গমনকারী মুসলমানের গুনাহ আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে মাফ করবেন, কিন্তু যে গণতন্ত্রের নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে, পার্লামেন্টে যাচ্ছে, ভোট দিচ্ছে, তাকে আল্লাহ তাআলা কস্মিনকালেও মাফ করবেন না, যতদিন না সূঁচের ছিদ্রপথে উট গমন করে, তার জন্য আছে চির কালের জাহান্নাম, কতই না নিকৃষ্ট ঠিকানা সেটি! এই ব্যক্তি যতই মসজিদ-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করুক না কেন, যতই হজ্জ-উমরা করুক না কেন, যতই দান-সদকা করুক না কেন,

যতই ইবাদত-বন্দেগী করুক না কেন, সে নামায-রোযা যাই করুক, তার কোনো আমলই কবুল হবে না। তার সমস্ত আমল আল্লাহ পাক ধ্বংস করে দিবেন। কেননা সে কুফুরী করেছে!!!

ভালোভাবে খেয়াল করুন, মদ পান করা গুনাহে কবীরা, কুফর নয়। যেখানে মদের বোতলে 'ইসলামী মদ' লিখে পান করলে গুনাহে কবীরা থেকে বাঁচা যায় না, সেখানে কুফরকে ইসলামী নাম দিলে তা কিভাবে জায়েয ও হালাল হবে? তাহলে একজন আলেম যখন গণতন্ত্র নামক কুফরকে ইসলামের লেবাস পরিয়ে কুফুরী করলো তখন যদি তাকে বলা হয়, ভাই আপনি এই কাজ না করে পশ্চিমাদের পতিতালয় ও নাইটক্লাবগুলোতে গিয়ে পড়ে থাকেন, হাজার বার জিনা করেন, মজ-মাস্তি করেন, তবুও ভালো, তবুও পার্লামেন্টে যাবেন না, ওটা কুফর, ওটা আরো ভয়াবহ গুনাহ; আমি কি তাকে সদোপদেশ দিলাম না? তাহলে আমার কথাগুলো শুনতে কেন খারাপ শুনা যায়? আমি যখন আলেমদের সম্পর্কে এই মন্তব্য করলাম, "কেন তারা আজ 'ইসলামী গণতন্ত্রের' নামে পতিতা পশ্চিমা জাতির 'নষ্ট দুধ' গোগ্রাসে পান করছে?" তখন কেন অনেকের গায়ে আগুন ধরে গিয়েছিল? আমি কি সত্য বলিনি? বরং বাস্তবতার নিরীখে আমি কি আরো কম বলিনি?

হায়রে উম্মত কেন যে বুঝে না, গণতন্ত্র কুফর! মানবরচিত বিধান-কুফর! এটি লক্ষ কোটি বার জিনা করার চেয়েও বড় গুনাহ, জঘন্য গুনাহ, অমার্জনীয় গুনাহ! 'জিহাদের মাধ্যমে খিলাফত কায়েম করাই' একমাত্র সুন্নতী রাজনীতি। এছাড়া আর কোনো রাজনীতি ইসলামে নেই।

যদি আমার উপরের আলোচনা বুঝে থাকেন, তাহলে আমার নিচের কুইজগুলোর উত্তর দিন।

কুইজ-৩:

বলুনতো, কোন্ জায়গাটি আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি নিকৃষ্ট? পতিতালয়, ব্যাংক, নাকি গণতন্ত্রের পার্লামেন্ট?

কুইজ-৪:

বলুনতো, একজন মুজাহিদকে যদি স্বাধীনতা দেয়া হয়, বোমা মেরে যে কোনো একটিকে ধ্বংস করতে পারবেন; তাহলে কোনটিকে সর্বপ্রথম ধ্বংস করা উচিত? পতিতালয়, ব্যাংক, নাকি গণতন্ত্রের পার্লামেন্ট?

কুইজ-৫:

নিচের কোন্ লোকটি আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত? বেশ্যা, ব্যাংকার, নাকি গণতন্ত্রের জনপ্রতিনিধি?

অনেকে বলেন, “আরে ভাই! আমরা তো জানি গণতন্ত্র কুফর। কিন্তু এখন যেহেতু খিলাফত নেই, তাই ইসলামকে টিকিয়ে রাখতে হেকমতের দাবী হিসেবে আমরা গণতন্ত্রকে বেছে নিয়েছি। আমরা ক্ষমতায় যেতে পারলে তখন খিলাফা কায়েম করবো।”

খুব ভালো কথা, তবে বেশি ‘ভালো’ ভালো নয়! গণতন্ত্রকে ইসলামীকরণ কোনো হেকমতের বিষয় নয় যে আপনি হেকমত মনে করে করতে থাকবেন। কুফর কুফরই! এক বেটা মূর্তি পূজা করে আর বলে

"আমি জানি এটি শিরক/কুফুরীর শামিল, কিন্তু যেহেতু মূর্তি সামনে থাকলে ধ্যান-খেয়াল (খুশু খুযু) পয়দা হয়, তাই হেকমতের কারণে আমি মূর্তি সামনে নিয়ে ইবাদত করি।" বলুন, এ ব্যক্তি কাফের কি কাফের না? তাহলে যারা গণতন্ত্র নামক কুফরকে অবলম্বন করছে 'হিকমত' হিসেবে, তাদেরকে কেন ছাড় দেয়া হবে, কেন 'কাফের' বলা হবে না? শায়েখ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আলে শায়েখ রাহিমাহুল্লাহ (সৌদি আরবের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতী) বলেন, "মানব রচিত কানূন এমন কুফর, যা (ব্যক্তিকে) ইসলাম ধর্ম থেকে বের করে দেয়।" (আল ফাতওয়া, খ. ১২, পৃ. ২৮০) এছাড়াও শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ., আল্লামা ইবনে কাসীর রহ., আল্লামা যাহিদ কাউসারী রহ., আব্দুল কাদের আওদাহ রহ.-সহ আরো অসংখ্য উলামায়ে কেরামের একই মতামত রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ

"যে সব লোক আল্লাহ তাআলা যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই কাফের।" (৫ সূরা মায়েদা: ৪৪)

সুস্পষ্ট আয়াত! আয়াতটিতে কোনোরূপ অস্পষ্টতা নেই। এখানে হেকমতের কোনো সুযোগ নেই।

যে মুসলিম রাষ্ট্রগুলো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চলে, যেখানকার সংবিধান ও আইন মানবরচিত, যেখানকার আদালত মানব রচিত আইনে চলে, এক কথায়, রাষ্ট্র এবং বিচার কার্য আল্লাহ তাআলার বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হয়না, তা সব "দারুল হারব" এবং সেখানকার শাসক কোনো ব্যতিক্রম বাদে সকলেই (দলগতভাবে) কাফের ও মুরতাদ।

অবশ্য শরীয়তসম্মত বিশেষ ওযর বশতঃ ব্যক্তিগতভাবে কেউ কাফের বা মুরতাদ নাও হতে পারেন, কিন্তু সেগুলো ধর্তব্য নয় (এই কিতাব সেসকল ক্ষেত্রসমূহের আলোচনার জায়গাও নয়), তবে এসকল শাসকগোষ্ঠীকে দলগতভাবে "কাফের বা মুরতাদ" হিসেবে মুজাহিদদের নির্মম কাটাকাটির শিকার হতে হবে, যদিও তিনি দাঁড়ি-টুপিওয়ালা, আর জুব্বা-পাগড়িওয়ালা হন।

সহজভাবে বুঝুন, দ্বীন কায়েমের ক্ষেত্রে যদি গণতন্ত্র অবলম্বন হেকমতই হতো, তাহলে তো আল্লাহর রাসূলের যিন্দেগীতে কিংবা সাহাবায়ে কেরামের যিন্দেগীতে এ ধরণের হেকমতের আলামত পাওয়া যেত। তাঁরা তো আমাদের চেয়ে দ্বীন বেশি বুঝতেন, তাঁদের হেকমত কি আমাদের চেয়ে বেশি ছিল না? তাহলে তারা কেন দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য হেকমতস্বরূপ কোনো কুফুরী পন্থা অবলম্বন করলেন না? অথচ তখন তো দ্বীন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বাধা-বিপত্তি বর্তমানের চেয়ে অনেক গুণ বেশি ছিল। কেন তাঁরা কাফেরদের সাথে সমঝোতা করেননি? কেন তাঁরা "হিকমত" হিসেবে কুফরের কিছু অংশ মেনে নেননি? আসল কথা হলো, দুনিয়ার মহব্বত ও মৃত্যুর ভয় আমাদের উপর চেপে বসেছে, তাই আমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও জিহাদের পন্থা বাদ দিয়ে বাতিল পন্থা তালাশ করি। যেখানে মৃত্যুর ঝুঁকি নেই সেদিকেই দৌঁড় দেই। এক কথায়, "কেউ জিহাদ না করলে আমি একাই জিহাদ করবো"- উম্মতের মাঝে এই মানসিকতার অপমৃত্যু হয়েছে, আর সেটির একমাত্র কারণ- মৃত্যুর ভয়!!! মৃত্যু থেকে পালানোকে আজ আমরা নাম দিয়েছি 'হিকমত'!!!
হা হা হা!!!
তাই, 'বাতিল' হেকমত- দূর হোক! নিপাত যাক! নিপাত যাক!

এরপরও যদি কেউ আমার কথা না বুঝে থাকেন, তাহলে আমাকে বাধ্য হয়েই বলতে হবে,

"তাদের অধিকাংশ লোকের ব্যাপারে আমার (আযাবের) বিধান অবধারিত হয়ে গেছে, ফলে তারা ঈমান আনবে না। আমি ওদের গলদেশসমূহে বেড়ি পরিয়ে দিয়েছি, অতঃপর তা তাদের চিবুক পর্যন্ত ঢেকে দিয়েছি, ফলে তারা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে গিয়েছে। আমি তাদের সামনে পিছনে প্রাচীর স্থাপন করে দিয়েছি, তাদের (দৃষ্টি) ঢেকে দিয়েছি, ফলে তারা দেখে না। তুমি তাদের সাবধান করো আর না করো তাদের জন্য দুই-ই সমান, তারা ঈমান আনবে না।" (৩৬ সূরা ইয়াসীনঃ ৭-১০)

"আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তর ও কানের উপর মোহর মেরে দিয়েছেন, এবং তাদের চোখের উপর আবরণ ফেলে দিয়েছেন, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।" (০২ সূরা বাকারাঃ ০৭)

"(বাস্তবিকই) এরা বধির, বোবা, অন্ধ, এরা (সঠিক পথের দিকে আর) ফিরে আসবে না।" (০২ সূরা বাকারাঃ ১৮)

প্রকৃতপক্ষে, এসব ভ্রান্ত-দরবারী আলেমরা আল্লাহ তাআলার দ্বীনের মধ্যে পরিবর্তন আনতে চায়। এই যামানায় 'উমরের তরবারি' থাকলে না জানি এদের কী হালত হতো! মনে রাখবেন, আল্লাহ তাআলা দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্‌র হুকুমই করেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না দ্বীন মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পুরোপুরিভাবে আল্লাহ তাআলার জন্যই হয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلّٰهِ

“আর তোমরা তাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই করতে থাকো, যে পর্যন্ত না (পৃথিবীর সকল) ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।” (২ সূরা বাকারা: ১৯৩)

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন।

জিহাদ ছাড়া দ্বীনের অন্যান্য মেহনত কি তাহলে বেকার?

এতক্ষণের আলোচনায় হয়তো অনেকে মনে করতে পারেন, 'মাহমুদ সাহেব তো দ্বীনের অন্যান্য সকল মেহনতকে বেকার সাব্যস্ত করে দিলেন। মনে হয়, তিনি জিহাদ ছাড়া আর কিছুই বুঝেন না।'

উত্তর: দুঃখিত! আমাকে ভুল বুঝবেন না। দ্বীনের প্রতিটি মেহনতই স্ব-স্ব স্থানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, ছোট থেকে ছোট প্রতিটি ইবাদতই অত্যন্ত মূল্যবান, কেননা বলা তো যায় না, কোন্ আমল আল্লাহ পাকের কাছে কবুল হবে, আর কোন্ আমলের জন্য নাজাত মিলবে। দ্বীনের অস্তিত্ব সকল মেহনতের উপরই নির্ভর করে। যেমন, পূর্বেও বলেছি, হযরত ইমাম গায্যালী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "দ্বীনের রক্ষা প্রাচীর চারটি, যথা: ইলম, তাযকিয়া, দাওয়াত ও জিহাদ। এর কোনো একদিকে দূর্বলতা থাকলে বাতিল সেদিক দিয়েই আক্রমণ করবে।" অর্থাৎ একথা থেকে বুঝা যায়, বাতিল যদি কোনো একদিকে আক্রমণ করে, বুঝতে হবে ঐ দিকটি উম্মতের দুর্বল হয়ে গিয়েছে। তখন উম্মতের সকল তবকার মুসলমানের দায়িত্ব হলো সে দুর্বলতা দূর করার চেষ্টা করা। বর্তমানে উম্মত সকল দিক দিয়েই ক্ষতিগ্রস্ত। তবে এখন উম্মতের বাঁচা-মরা কিংবা অস্তিত্বে টিকে থাকা, না থাকার প্রশ্ন এসে দাঁড়িয়েছে। যার প্রেক্ষিতে বর্তমানে সকল তবকার মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গিয়েছে। তাই এখন সময়ের দাবী, অন্যসব মেহনত বাদ দিয়ে সকল মুসলমান এক হয়ে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং যুদ্ধ করতে থাকবে যতদিন না উম্মতের উপর থেকে অস্তিত্বের ঝুঁকি কিংবা আশঙ্কা পুরোপুরি দূর হয়ে

যাবে, বিশেষত উম্মতের উপর তরবারি উত্তোলনকারী সম্প্রদায়গুলো তাদের তরবারি না নামাবে। তাদের তরবারি যতদিন উত্তোলিত থাকবে, ততদিন জিহাদ "ফরযে আইন" থাকবে আর যেদিন তারা মুসলমানদের ভয়ে কিংবা প্রভাবে তরবারি নামিয়ে ফেলবে, সেদিন থেকে জিহাদ আবারো "ফরযে কিফায়া" হয়ে যাবে। এই সহজ কথাগুলো আমরা কেন যে বুঝি না!!!

এরপর তখন আমরা উম্মতের প্রয়োজনে একেকজন একেক মেহনত আবারো করতে পারবো। তখন আর সমস্যা নেই। কিন্তু বর্তমানে একথা বলার সুযোগ নেই, আমি তো একটি মেহনত করছি, বাকীগুলো করবো না, বাকীগুলোকে কেবল সমর্থন করে যাবো। একটি মেহনত করছেন, ভালো কথা! কিন্তু অন্য একটি মেহনত ফরযে আইন হয়ে গেলেও কি করবেন না? যদি না করা হয়, সেটি দ্বীন নয়, সেটি হবে মেহনতের নামে নিজের খাহেশাত পুরা করা।

আমি আল্লাহর জন্য আমল করছি, নাকি খাহেশাত পুরা করছি তা বুঝার কি কোনো উপায় আছে? হ্যাঁ, আছে। মনে রাখবেন, আপনি যে আল্লাহর হুকুম পালন করার জন্যে একটি মেহনত করছেন বলে মনে করেন, সেই আল্লাহই আপনার উপর জিহাদ ফরযে আইন করেছেন। আমল করাটা যদি খাহেশাত হয়, তাহলে যেটা আপনার কাছে ভালো/ সহজ লাগে, আপনি সেটাই করতে থাকবেন। আল্লাহর অন্য হুকুমের দিকে তাকাবেন না। আর যদি আল্লাহর হুকুম পালনই মাকসাদ হয়, তাহলে তো আপনি সবসময় খুঁজবেন, এখন আমার উপর আল্লাহর হুকুম কী? এখন কী ফরয? আর সেদিকেই আপনি ঝাঁপ দিবেন, যদিও নিজের জীবন বাজি লাগাতে হয়! এটাই আসল ও সরল পথ!

ভালো করে বুঝে নিন, আমি আপনাদেরকে শুধু আমলের গুরুত্ব বুঝানোর চেষ্টা করেছি। গুনাহের খারাপী ও ঘৃণ্যতা বুঝাবার চেষ্টা করেছি। প্রত্যেকটা আমলকে ততটুকুই গুরুত্ব দেয়া উচিত যতটুকু গুরুত্ব আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ দিয়েছেন। প্রত্যেকটি গুনাহকে ততটুকুই ঘৃণা করা উচিত, যতটুকু যেটি পাবার উপযুক্ত।

আমাদেরকে কখনোই ভুলে গেলে চলবে না, যদি কোনো হুকুম 'ফরযে আইন' হয়ে যায়, তখন অন্যান্য ফরযে কিফায়া, ওয়াজিব, সুন্নত, মোস্তাহাব, মুবাহ কাজগুলো ত্যাগ করে ফরযে আইন হুকুম পালন করাই দ্বীন।

মনে করুন, আসরের ওয়াক্ত শেষ হতে আর মাত্র দশ মিনিট বাকী আছে। আপনি এখনো আসরের নামায আদায় করেননি। এই মুহূর্তে একটি জানাযা এসে উপস্থিত। আপনি কোন্‌টা আগে পড়বেন? আসর নাকি জানাযা?........

এই সহজ ব্যাপারটি বুঝানোর জন্যই আমি এতগুলো কথা বললাম।

আরেকটি উদাহরণ দিচ্ছি। আমাদের দেশে একদল পীর সাহেব আছেন, যারা নিজেদেরকে "আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত" দাবী করেন। তাদের "উরস মোবারক"(!)-গুলোতে খানা-দানার ধুম পড়ে যায়। তাই এদেরকে আদর করে আমরা "আহলে শিরনী ওয়াল বিরিয়ানী" বলে থাকি। তো এই পীরসাহেবরা নামায পড়েন না। তারা গাইবীভাবে কিভাবে জানি নামায আদায় করেন আর সারাদিন তসবীহ নিয়ে যিকির করেন। আচ্ছা! আপনাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, ভাই! এরা কি হক? আপনি কী জবাব দিবেন? এরা বাতিল, এরাই ভণ্ড! তাইনা? কারণ কী? কারণ হচ্ছে, এরা ফরযে আইন বাদ দিয়ে নফল নিয়ে দৌঁড়াদৌড়ি করে, এইতো?

তাহলে যারা জিহাদ (ফরযে আইন) বাদ দিয়ে মাদরাসা, খানকাহ, দাওয়াত, রাজনীতি, কিতাব লিখালিখি, বছর বছর হজ্জ/ওমরাহ, মসজিদ/মাদরাসা বানানো ইত্যাদি ফরযে কিফায়া, ওয়াজিব, সুন্নত ও নফল নিয়ে দৌঁড়াদৌড়ি করে তাদেরকে আপনি কী বলবেন?

আচ্ছা! চিন্তা করুন তো, বর্তমান যামানায় যদি সাহাবায়ে কেরামরা আসতে পারতেন, তাহলে এদেরকে কী বলতেন? এদের অবস্থা কী করতেন?

وَمَا عَلَيْنَآ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ

দীলের মধ্যে জিহাদের মহব্বত তৈরির উপায় তিনটি:

১. জিহাদ ও শাহাদাতের ফাযায়েল জানা
২. দুনিয়ার মহব্বত দীল থেকে বের করা
৩. মৃত্যুর ভয় দীল থেকে দূর করা

দ্বিতীয় গুণ

আল্লাহ তাআলার পর অন্য কাউকে ভয় বা তোয়াক্কা না করা

০২. আল্লাহ তাআলার পর অন্য কাউকে ভয় বা তোয়াক্কা না করা

- আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلَآ أَخَّرْتَنَا إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً ﴿٧٧﴾

“অতঃপর যখন তাদের প্রতি জিহাদের নির্দেশ দেয়া হলো, তৎক্ষণাৎ তাদের মধ্যে একদল লোক মানুষকে ভয় করতে আরম্ভ করলো, যেমন করে ভয় করা হয় আল্লাহকে। এমনকি তার চেয়েও অধিক ভয়। আর বলতে লাগল, হায় আমাদের পালনকর্তা, কেন আমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করলে! আমাদেরকে কেন আরো কিছুকাল অবকাশ দিলেনা! (হে রাসূল!) তাদেরকে বলে দিন, পার্থিব ফায়দা সীমিত। আর আখেরাত তাদের জন্য উত্তম যারা আল্লাহকেই ভয় করে। আর তোমাদের অধিকার একটি সূতা পরিমাণও খর্ব করা হবে না।” (৪ সূরা নিসা: ৭৭)

- আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন,

ٱلَّذِينَ آمَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱلطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوٓاْ أَوْلِيَاءَ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً ﴿٧٦﴾

"যারা ঈমানদার তারা জিহাদ করে আল্লাহর রাহেই। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে শয়তানের পক্ষে সুতরাং তোমরা জিহাদ করতে থাক শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে, (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত নিতান্তই দুর্বল।" (৪ সূরা নিসা: ৭৬)

- আল্লাহ তাআলা আরেক স্থানে ইরশাদ করেন,

فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِى

"সুতরাং তোমরা তাদেরকে (অর্থাৎ বাতিল, তৃগুত বা কুফুরী শক্তিকে) ভয় করো না। ভয় কর আমাকেই।" (২ সূরা বাকারা: ১৫০)

- আল্লাহ পাক আরো ইরশাদ ফরমান,

أَتَخْشَوْنَهُمْ فَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

"তোমরা কি তাদের ভয় কর? অথচ তোমাদের ভয়ের অধিকতর যোগ্য হলেন আল্লাহ, যদি তোমরা মুমিন হও।" (৯ সূরা তাওবা: ১৩)

সাহাবায়ে কেরামের ভয়ঃ

সাহাবায়ে কেরাম রদিয়াল্লহু আনহুম আযমাঈন সর্বদা আল্লাহ তাআলার ভয়ে ত্রস্ত থাকতেন। একদিকে আল্লাহ ও রাসূলের মহব্বত, অন্যদিকে আল্লাহর তাআলার ভয়, এই দুইয়ের এক চমৎকার সমাবেশ পাওয়া যায়, সাহাবায়ে কেরামের মাঝে। অন্যদিকে তাঁদের দীল গাইরুল্লাহর ভয় থেকে পাক ছিল। আল্লাহ তাআলার পর তাঁরা কাউকে ভয় বা তোয়াক্কা করেননি। সে যত বড় বাতিল আর যত শক্তিধর তৃগুতই হোক না কেন, তাঁরা কোনোদিন তার পরোয়া করেননি, তাদের সাথে আপোষ করেননি। আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়ানো এবং তাঁর কাছে জবাবদিহিতার ভয় তাদেরকে সকল অন্যায় থেকে বিরত রাখত, সকল মাখলূকের ভয় থেকে দূরে রাখত। সাহাবায়ে কেরাম কিছু বিশেষ বিষয়ে সর্বদাই ভীত থাকতেন। এগুলোও মূলত আল্লাহ তাআলার প্রতি ভয় হতেই উৎপন্ন, বরং তার শাখাপ্রশাখা বলা যায়।

আল্লাহ তাআলার উপস্থিতির ভয়ঃ

তাঁদের দীলের মাঝে সবসময় এই খেয়াল থাকতো যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের দেখছেন, আল্লাহ তাআলা আমাদের সাথে আছেন। তাই সকল কাজকর্মে তাঁরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে চলতেন। কোনরূপ অন্যায় বা ভুল তাই তাঁদের দ্বারা সংগঠিত হতো না।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ

" তোমরা যেখানেই থাক, তিনি (আল্লাহ তাআলা) তোমাদের সাথেই আছেন।" (৫৭ সূরা হাদীদ: ৪)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ

"আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার মন নিভৃতে যে কুচিন্তা করে আমি তাও অবগত আছি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী।" (৫০ সূরা কাফ: ১৬)

মৃত্যুর পর আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়ানো ও জবাবদিহিতার ভয়:

'আল্লাহ তাআলার হুকুমসমূহকে যদি পুরোপুরি আমাদের যিন্দেগীতে আনতে না পারি, আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে যদি পরিপূর্ণরূপে অনুসরণ করতে না পারি, অন্যদিকে যদি নফস ও খাহেশাতের গোলাম বনে যাই তাহলে আল্লাহর সামনে দাঁড়াব কী করে? নবীজী ﷺ-কে এ মুখ দেখাব কী করে?

আল্লাহ পাকের ইরশাদ করেন,

فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ - وَآثَرَ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا - فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ - وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ - فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ

"সুতরাং যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করেছে; এবং দুনিয়ার যিন্দেগীকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, তার ঠিকানা হলো জাহান্নাম। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল খুশি থেকে (নফসের চাহিদা পূরণ করা থেকে) নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, তার ঠিকানা হলো জান্নাত।" (৭৯ সূরা আন-নাযিয়াত: ৩৭-৪১)

আল্লাহ পাকের আযাব বা শাস্তির ভয়:

"আমাদের কোনো ভুল-ত্রুটির কারণে পূর্ববর্তী উম্মতের মতো আমাদের উপর আল্লাহর আযাব না এসে পড়ে" সাহাবায়ে কেরাম রদিয়াল্লহু আনহুমগণ সবসময় এই ভয় করতেন। কেননা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ- مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ

"আপনার পালনকর্তার আযাব অবশ্যম্ভাবী, তা কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না।" (৫২ সূরা তূর: ৭-৮)

তিনি আরো ইরশাদ করেন,

إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ

“নিশ্চয় তাদের পালনকর্তার আযাব থেকে নিঃশঙ্কা থাকা যায় না।”

(৭০ সূরা মাআরিজ: ২৮)

أَأَمِنتُمْ مَّن فِى ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِىَ تَمُورُ- أَمْ أَمِنتُمْ مِّن فِى ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ

“তোমরা কি ভাবনা মুক্ত হয়ে গেছ যে, আকাশে যিনি আছেন তিনি তোমাদেরকে ভূ-গর্ভে বিলীন করে দিবেন, অতঃপর তা কাঁপতে থাকবে। না তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ যে, আকাশে যিনি আছেন, তিনি তোমাদের উপর প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, অতঃপর তোমরা জানতে পারবে কেমন ছিল আমার সতর্কবাণী।” (৬৭ সূরা মূলক: ১৬-১৭)

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَآ أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

“আমি তোমাদের সমমনা লোকদেরকে ধ্বংস করেছি, অতএব, কোনো চিন্তাশীল আছে কি?” (৫৪ সূরা ক্বমার: ৫১)

তাইতো দেখা যায়, একটু ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলেই সাহাবায়ে কেরাম রদিয়াল্লহু আনহুম আযমাঈনগণ আল্লাহ পাকের আযাব থেকে পানাহ চাওয়ার জন্য মসজিদে ছুটে আসতেন। আহ্! তাঁদের কোনো গুনাহ না থাকা সত্ত্বেও, তাঁদের উপর আল্লাহ পাক রাজি-খুশি হওয়া সত্ত্বেও তারা

আল্লাহ পাককে কতটা ভয় করতেন, তাঁর আযাবকে কি পরিমাণ ভয় করতেন! আর আমরা বেপরোয়াভাবে এত গুনাহ করার পরও নিশ্চিন্তে নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছি। আজ উম্মতের উপর আযাব আসবে না কেন? আযাব তো শুধু ঘূর্ণিঝড়, বন্যা আর ভূমিকম্পের নাম নয়!

মুসলমানদের উপর কুফ্ফারদের চাপিয়ে দেয়া- আযাব!

ইলম উঠিয়ে নেয়া- আযাব!

দুআর মজা না পাওয়া- আযাব!

ইবাদত করতে ভালো না লাগা- আযাব!

চোখে পানি না আসা- আযাব!

অসুখ বিসুখ চাপিয়ে দেয়া- আযাব!

পারিবারিক জীবনে অশান্তি- আযাব!

ক্ষমতার আসনে যালেম সরকার- আযাব!

ক্ষমতায় নারী নেতৃত্ব- আযাব!

উলামায়ে কেরামদের সরকারের অনুগত হয়ে যাওয়া- আযাব!

তাদের মুখ বন্ধ করে রাখা- আযাব!

দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত বন্ধ হয়ে যাওয়া- আযাব!

অশ্লীলতা ও নারীর ফেতনা- আযাব!

চারদিকে ফেতনা আর ফেতনা- আযাব!

এগুলো তো ঘূর্ণিঝড়, বন্যা আর ভূমিকম্পের চেয়েও ভয়াবহ আযাব। কেননা ঘূর্ণিঝড়, বন্যা আর ভূমিকম্পে তো মরে গেলেই শেষ হয়ে গেল। কিন্তু এগুলোতে মানুষের জন্য দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানেই আগুন

নিহীত রয়েছে, এগুলোতে ব্যক্তি মরবে না কিন্তু যতদিন জীবিত থাকবে অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ হয়ে ঝলসাবে! আখিরাত বরবাদ হয়ে অনন্তকাল জাহান্নামে জ্বলবে! যদিও আমরা আযাবে গ্রেপ্তার হয়েও অধিকাংশই বুঝি না, বা বুঝার ক্ষমতা রাখিনা যে আমাদেরকে আযাব দেয়া হচ্ছে। এটি স্বতন্ত্র আরেকটি আযাব!

তাই উপরোল্লিখিত কোনো একটি আযাব যদি আমরা বুঝতে পারি, তাহলে আমাদেরকে আগে দেখতে হবে, আমার দ্বারা কোনো নাফরমানী হয়ে যাচ্ছে কিনা! আমল করে বা তদবীর করে আযাব দূর করার আগে, নিজের ভুল-ক্রুটি ও গুনাহগুলোকে খুঁজে বের করতে হবে এবং তাওবা করে ফিরে আসতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের হেফাযত করুন। আমীন।

পূর্ববঙ্গে আযাব ও প্রসঙ্গঃ গাযওয়ায়ে হিন্দ।

পূর্ববঙ্গে (বাংলাদেশে) শুনা যাচ্ছে, সারা দেশ ব্যাপী বন্যা ও ডেঙ্গু জ্বরের উপদ্রূপ। প্রতিদিনই ডেঙ্গু জ্বরে মানুষ মারা যাচ্ছে। নিঃসন্দেহে এটি সে দেশের জন্য আযাব। আর এগুলো শুরু হয়েছে, দুই ঈদের মাঝখানে। নেয়ামাতুল্লাহ কাশ্মিরী রাহিমাহুল্লহু এক হাজার বছর আগে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, মুসলামানদের একটি শহর বা দেশ গাযওয়াতুল হিন্দে হিন্দুদের বলীর পাঠা হবে। ঘরে ঘরে কারবালা ঘটাবে। অধিকাংশ আলেম উলামাদের আশংকা সেটি হবে পূর্ববঙ্গ (বাংলাদেশ), কেননা সেখানে বর্তমানে মুনাফেক সরকার ক্ষমতাসীন। (পূর্ববঙ্গ আসামের তো মুশরীক সরকার।) আবার নারী ক্ষমতায় থাকাতে (হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী), সে জাতি অভিশপ্ত জাতি। তাই কোনো একটি অভিশপ্ত জাতির উপর যে

কোনো সময় আযাব আসাটাই স্বাভাবিক। মায়ানমারের মুসলমানদের উপর এত নির্যাতনের পরও সে দেশের উলামায়ে কেরামকে জিহাদ ঘোষণার পরিবর্তে উদ্বাস্তুদের মাঝে গরু আর খাসী বিতরণে ব্যস্ত দেখা যাচ্ছে। দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। তারও কারণ সাথীদের বদ আমল। খেলাফে সুন্নত কার্যকলাপ। তাই সেদেশের উপর আযাব আসাটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। (আল্লাহই ভালো জানেন)। তবে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের জন্য সতর্কবাণী হচ্ছে আল্লাহ তাআলা বড় আযাব পাঠানোর আগে ছোট ছোট আযাব প্রেরণ করে থাকেন যেন বান্দারা সঠিক পথে ফিরে আসে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“গুরু শাস্তির পূর্বে আমি অবশ্যই তাদেরকে লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে।” (৩২ সূরা আস্ সাজদাহ: ২১)

তাই দুই ঈদের মাঝখানে বন্যা ও বিশেষ করে ডেঙ্গু জ্বর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সতর্কবাণী। এডিস মশা আগে কেবল ঢাকাতেই ছিল। কিন্তু বর্তমানে সারা দেশে ছড়িয়ে গেছে। প্রশ্ন হলো, মশাগুলো আগে কেন ছড়ায়নি? হঠাৎ করে তারা সারা দেশের রাস্তাঘাট কিভাবে চিনে ফেলল? এরা কি আল্লাহ তাআলার হুকুম ছাড়াই সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল? এরা কি আল্লাহ তাআলার জ্ঞানের বাহিরেই ছড়িয়ে পড়েছে? না! আসলে যিনি এই মশা বানিয়েছেন এবং এরা যার বাহিনী তিনিই এদেরকে এমনটি করতে হুকুম দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলার বাহিনী সম্পর্কে কেউ কোনোদিন কল্পনাও করতে পারবে না। শাহ নেয়ামাতুল্লাহ কাশ্মিরী রাহিমাহুল্লাহ কাসীদাতে বলেছেন, পাঞ্জাবের একটি অঞ্চল (কাশ্মীর) মুসলমানরা জয়

করার পরই গাযওয়াতুল হিন্দ শুরু হবে। ১৪৪০ হিজরী চলছে। বর্তমানে কাশ্মীরে হিন্দু কর্তৃক মা-বোনদের ধর্ষণ, যুলুম-নির্যাতন আর হত্যাকাণ্ড চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে, হয়তো ১৪৪০ হিজরী বা ১৪৪১ হিজরীতেই (২০১৯-২০২০ সালের মাঝেই) মুসলমানরা কাশ্মীর জয় করে নিবে ইনশাআল্লাহ। এরপর পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশের) পালা। তাই সেখানকার মুসলমানরা সতর্ক হই। সঠিক ইসলামে ফিরে আসি। জিহাদের প্রস্তুতি নেই। আল্লাহ তাআলাই পথ প্রদর্শনকারী।

֍ আখিরাতের ঘাটিসমূহের ভয়ঃ

সকল নবী-রাসূলগণ এবং তাঁদের পর সাহাবাগণের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো যিকরে আখিরাত (আখিরাতের স্মরণ)। যে যত বেশি আখিরাতের ইলম হাছিল করতে পেরেছে, তার মধ্যে দুনিয়াবিমুখতা, পরহেযগারী, আল্লাহর ভয় ইত্যাদি তত বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। নবীজী ﷺ যখন জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা করতেন, তখন সাহাবায়ে কেরামগণের কাছে মনে হতো যেন তাঁরা নিজের চোখে তা দেখতে পাচ্ছেন। কবর, হাশর, মীযান, পুলসিরাত, জান্নাত ও জাহান্নাম ইত্যাদি আখিরাতের ঘাঁটিসমূহের আলোচনায় তাঁরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে অধিক পরিমাণে কান্না করতেন।

হযরত উসমান রদিয়াল্লহু আনহু যখনই কোনো কবরের পাশে দাঁড়াতেন, তখনই এত কান্নাকাটি করতেন যে, (চোখের পানিতে) তাঁর দাঁড়ি ভিজে যেত। কেউ তাকে প্রশ্ন করলো যে, কি ব্যাপার! আপনি জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা হলে তো আপনি এতো কান্না করেন না,

কিন্তু কবর দেখেই কেন এত কান্না করেন? উত্তরে তিনি বলতেন যে, আমি শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: নিশ্চয় কবর হলো আখিরাতের মনযিল সমূহের মাঝে প্রথম মনযিল। এই মনযিলে যে ব্যক্তি মুক্তি পাবে, পরবর্তী মনযিলগুলো অতিক্রম করা তার জন্য সহজ হয়ে যাবে। আর যদি এখানে কেউ ধরা পড়ে যায়, তাহলে পরবর্তী মনযিলগুলো হবে তার জন্য আরো ভয়াবহ। (তিরমিযী)

মুনাফেকীর ভয়:

যাদের অন্তরে কুফুরী, যারা অন্তর থেকে ইসলাম ও আল্লাহর হুকুমকে কবুল করেনি কিন্তু নিজেকে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেয়, তাদেরকে মুনাফিক বলা হয়।

হযরত ইবনে আবি মুলাইকা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি ত্রিশজন সাহাবা রদিয়াল্লহু আনহুম আযমাঈনদের সহিত সাক্ষাৎ করেছি। তাঁরা প্রত্যেকে নিজের সম্পর্কে মুনাফিক হওয়ার ভয় করছিলেন।" (বুখারী)

অর্থাৎ তাঁরা মনে করতেন, আমাদের বাহ্যিক অবস্থা যেমন উত্তম, উহার ভিতরগত অবস্থা তেমন উত্তম নয়। এই কারণে তাঁরা নিজের মধ্যে নেফাকের ভয় করতেন।

আমরা গুনাহকে যেই পরিমাণ ভয় করি না, সাহাবায়ে কেরাম তো তাঁদের নেক আমল কবুল না হওয়াকে তার থেকে অনেক বেশি ভয় করতেন। হায়! আমরা মুনাফিক হয়েও নিজেদেরকে পাক্কা ঈমানদার মনে

করি। আর তাঁদের ঈমানকে স্বয়ং আল্লাহ পাক মানদণ্ড ঘোষণা করার পরও তারা নিজেদেরকে মুনাফিক মনে করতেন।

হযরত ওমর রদিয়াল্লহু আনহু, যাকে খোদ নবীজী ﷺ (যোগ্যতার দিক থেকে) নবীর সমতুল্য ঘোষণা করলেন, তিনি হুজাইফা রদিয়াল্লহু আনহুর নিকট অনুরোধ করলেন, "দেখো, তোমাকে নবীজী ﷺ মুনাফিকদের যে লিস্ট বলে গিয়েছেন, সেখানে কারা কারা আছে, আমি তা জানতে চাইবো না। আমাকে কেবল এতোটুকু বলো, আমার নাম সেখানে আছে কিনা।"

আমার ও আমার খান্দানের জান তাদের জন্য কুরবান। আমরা হারাম থেকে যতটুকু দূরে যেতে পারি নাই, তারা তো হালাল থেকেও তার চেয়ে বেশি দূরে ছিলেন। তাঁরা আল্লাহর হুকুমের ব্যাপারে কতুটুকু সতর্ক ছিলেন!

নবুয়তের যামানায় সর্বপ্রথম যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে আল্লাহ তাআলা মুনাফেকদের মুখোশ উন্মোচন করেন তা হলো ওহুদের যুদ্ধ। মুনাফেকদের সরদার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার অনুসারী ৩০০ জন মূল বাহিনী থেকে পেছনে সরে যায়। বাকী ৭০০ জন সাহাবী ৩০০০ কাফেরের বিরুদ্ধে ওহুদের ময়দানে যুদ্ধ করেন। এ থেকে বুঝা গেল, সাহাবায়ে কেরামের জামাতে ঘাপটি মেরে বসেছিল এমন মুনাফেকের সংখ্যা ৩০%।

লক্ষ্য করার বিষয় হলো, এই মুনাফিকরা সকল আমলই করত। তারা নামায পড়ত, রোযা রাখত, যাকাত দিত, দান-খয়রাত করত, হজ্জ করত, সবই করত। করতো না শুধু একটি আমল, যেই আমল থেকে এরা সর্বদা পিছিয়ে থাকত। যেহেতু জিহাদের ময়দানে গেলে মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে,

তাই এরা মৃত্যুর ভয়ে জিহাদ থেকে পালাত। জিহাদে না জুড়ার কারণে সকল আমলে জুড়লেও এরা মুনাফেকদের কাতারে শামিল হতো।

তাবুকের যুদ্ধের সময়ও এরা ফসল কাটা কিংবা গরমের অজুহাত দেখিয়ে জিহাদ থেকে অব্যাহতি চায়। এরা তো প্রকাশ্য মুনাফেক। এমনকি যারা খাঁটি মুমিন ছিলেন, এবং কোনো কারণ ছাড়াই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেননি, তাদেরকেও তাদের ঈমান (তারা যে মুনাফেক নন তা) প্রমাণ করার জন্য পরবর্তীতে অনেক কাঠ-কয়লা পুড়াতে হয়েছিল।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ قَاتِلُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِ ٱدْفَعُواْ قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لَّٱتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِى قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٦٧﴾ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴿١٦٨﴾

“১৬৭. এবং (জিহাদের হুকুম এই জন্য করা হয়েছে যেন,) তাদেরকে সনাক্ত করা যায়, যারা মুনাফিক ছিল। আর তাদেরকে বলা হলো, এসো, আল্লাহর রাহে লড়াই কর কিংবা শত্রুদেরকে প্রতিহত কর। তারা বলেছিল, আমরা যদি জানতাম যে, লড়াই হবে, তাহলে অবশ্যই তোমাদের সাথে থাকতাম। সে দিন তারা ঈমানের তুলনায় কুফুরীর কাছাকাছি ছিল। যা

তাদের অন্তরে নেই তারা নিজের মুখে সে কথাই বলে, বস্তুতঃ আল্লাহ ভালোভাবে জানেন তারা যা কিছু গোপন করে থাকে।

১৬৮. ওরা হলো সে সকল লোক, যারা ঘরে বসে থেকে নিজেদের ভাইদের সম্পর্কে বলে, যদি তারা আমাদের কথা শুনত, তবে তারা নিহত হতো না। তাদেরকে বলে দিন, এবার তোমাদের নিজেদের উপর থেকে মৃত্যুকে সরিয়ে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।" (০৩ সূরা আলে ইমরান)

বুঝা গেল, আল্লাহ তাআলার কাছে মুনাফেক সাব্যস্ত হওয়ার জন্য জিহাদ ত্যাগ করাই যথেষ্ট। মুনাফিক হওয়ার ভয়ে সাহাবায়ে কেরাম কোনো দিন জিহাদ ত্যাগ করেননি।

হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম প্রকাশিত হওয়া অর্থ হচ্ছে "ঈমান মানেই জিহাদ, আর জিহাদ না করা মানেই মুনাফিক"।

কেননা তাঁর জামানা নবুওয়তের আদলে খিলাফতের জামানা। সেই নবুওয়তের জামানার হালত আবারও পৃথিবীতে ফিরে আসবে ইন্‌শাআল্লাহ। হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেও একই কথা, কেননা ইসলামের বিধান সব যুগের জন্য একই। এবং ইসলাম পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। তাতে আর কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন হবে না। বর্তমানে এই কথা বলার সুযোগ নেই, আরে ভাই, এখন মাক্কী জামানা চলছে, এখন দাওয়াতের সময়। ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম আসলে মাদানী যুগ শুরু হবে, তখন জিহাদ করা যাবে। একথা এজন্য বলা যাবে না, কারণ, মাক্কী যিন্দেগীতে জিহাদ ফরয ছিল না, বরং জিহাদের হুকুমই নাযিল হয়নি। কিন্তু বর্তমানে প্রতিটি মুসলমানের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে আছে। আবারো বলছি, ইসলামের বিধান পরিপূর্ণ হয়ে গেছে।

তাই এখন আর একথা বলার সুযোগ নেই। যদি আপনার কথা মতো মেনে নেয়া হয়, বর্তমানে মাক্কী যামানা চলছে, তাহলে মাক্কী যিন্দেগীতে তো মদ হালাল ছিল, তাই বলে কি এখন মদ হালাল হবে?

হায়! বর্তমানে আমরা জিহাদ না করেও নিজেদেরকে আল্লাহর ওলী, আল্লাহ ওয়ালা, দ্বীনদার, হক্কানী, অনেক কিছু মনে করি, অনেক কিছু দাবী করি, কিংবা আকার ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয়ার চেষ্টা করি। অথচ আমরা মুনাফিক হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে একটুও ভয় করি না।

অথচ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً

"নিশ্চয়ই মুনাফেকদের অবস্থান জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। আর তাদের জন্য তোমরা কোনো সাহায্যকারীও পাবেনা।" (০৪ সূরা নিসা: ১৪৫)

যে মুনাফেকী করবে, বুকে বে-ঈমানী, মুখে ঈমানের কথা বলবে, উম্মতের সাথে গাদ্দারী করবে, উম্মতের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করে, তাদেরকে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে নিক্ষেপ করা হবে। এদের শাস্তি হবে সবচেয়ে মর্মান্তিক। তাদেরকে পাঠানো হবে "যুব্বুল হুযন" (চিন্তার কূপ) নামক স্থানে। এটি এমনই ভয়ংকর যে, খোদ জাহান্নামই এর মসীবত থেকে আল্লাহর কাছে দিনে শতবার পানাহ চায়। সুতরাং উম্মতের গাদ্দাররা সাবধান!

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নিফাকের ব্যাধি হতে বাঁচান। আমীন।

আল্লাহ তাআলাকে আমরা কেন সবচেয়ে বেশি ভয় করবো না!!!

তিনিই তো আমাদের আল্লাহ, এক, অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়। তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি আমাদের রব। সৃষ্টজীবের সাথে তাঁর কোনো তুলনা হয়না। এ মহাবিশ্ব এবং তাতে বিদ্যমান সকল কিছুর একমাত্র স্রষ্টা, প্রতিপালক, পরিচালক, সংহারক, নিয়ন্ত্রক ও সকল ব্যাপারে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তাআলা।

তাঁর যে সকল অনাদি, অনন্ত গুণ বিদ্যমাণ রয়েছে, সেসব গুণের মধ্যে অন্য কেউ শরীক আছে কি?

তিনিই সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, হায়াত ও মওতদাতা, বিধানদাতা, গায়েব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই। অন্য সবকিছুই ক্ষয়শীল ও ধ্বংসশীল, কিন্তু তাঁর ক্ষয়ও নেই ,ধ্বংসও নেই। আসমান-যমীন ও তার মধ্যবর্তী কিংবা তার বাইরের সকল কিছুর উপর তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত। সবকিছুর উপর তাঁর ক্ষমতা চলে। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক চুল পরিমাণ অগ্রসর হওয়ার ক্ষমতা কারো আছে কি?

আল্লাহ তা'আলা কারও মুখাপেক্ষী নন, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী।

তিনি কি সর্বশক্তিমান নন? তিনি আগুনকে পানি এবং পানিকে আগুন করতে পারেন। এই যে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে আকাশ, বাতাস, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি বিদ্যমান, তিনি হুকুম করলে মুহূর্তের মধ্যে এসব নাস্তানাবুদ হয়ে যাবে। সকলেই তাঁর নামের তাসবীহ পাঠ করে। সকলেই তাঁর হুকুমের

অনুগত। তাঁর হুকুমকে পাশ কাটিয়ে অস্তিত্বে টিকে থাকবে, সৃষ্টি জগতে এমন কে আছে?

তিনি কি সর্বজ্ঞ নন? তিনি না জানেন এমন কিছুই নেই। মনের মধ্যে যে ভাবনা বা কল্পনা উদয় হয় তাও তিনি জানেন। তিনি সবকিছুই দেখছেন। সবকিছুই শুনছেন। মৃদু আওয়াজ এমনকি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণ আওয়াজও তিনি শুনেন। অন্ধকার রাত্রিতে পাথরের ভিতর ছোট্ট কোনো কীট, কিংবা সমুদ্রের গভীর তলদেশে মাটির গভীরে ছোট্ট কোনো পোকা-মাকড়, তাদের নড়াচড়ার শব্দও তিনি শুনতে পান, তাদেরকে তিনি দেখতে পান, এমনকি তাদের হৃদয়ের সকল চাওয়া, আকুতি তারা তাঁর কাছেই পেশ করে থাকে। তাহলে তিনি কি কাফেরদের গোপন পরামর্শ, মনের ভিতরের কুমতলব আর নষ্ট ষড়যন্ত্রসমূহ তিনি শুনেন না, তিনি কি জানেন না? তাঁর জ্ঞানের বাহিরে কেউ আছে কি?

আসমান-যমীনের সকল অদৃশ্য, গাইবের বিষয় একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। তিনি ছাড়া আর কেউ গাইব জানেন না। এমনকি নবী-রাসূলগণ বা অলীগণও নন। তাহলে শয়তান ও তার দলবল কিভাবে জানবে? তারা কি আল্লাহ তাআলাকে এমন কোনো বিষয় জানাতে চায়, যার খবর আল্লাহ তাআলার কাছে নেই? তিনি তো আমার হৃদয়ের জল্পনা কল্পনা সব জানেন, আড়চোখে কোনো খেয়ানত করি কিনা তাও অবগত। যদি প্রকাশ্য দিবালোকে কোনো নাফরমানী করে থাকি তা তিনি যেমন জানেন, তেমনি জানেন আমি যা কিছু সকলের অলক্ষ্যে রাতের আঁধারে করি।

আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র হাজির নাজির। তিনি ছাড়া আর কেউ হাজির নাজির নন। এমনকি নবী-রাসূলগণ বা অলীগণও নন। তিনি কি জিহাদের

ময়দানে হাজির আছেন না, মুমিনদের সাথে আছেন না, কাফেরদেরকে দেখছেন না? আমাদেরকে শক্তি আর সাহস দেওয়ার জন্য আমাদের সাথে আছেন না? তিনি কি কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদের জন্য যথেষ্ট নন? তাদের এত শক্তি-দলবল আল্লাহর সামনে টিকতে পারবে কি?

তিনি যা ইচ্ছা, তাই কি করতে পারেন না? কোনো পীর-অলী, পয়গম্বর বা ফেরেশতা, কোনো বাতিল, কোনো ত্বগুতী শক্তি তাঁর ইচ্ছাকে রদ বা প্রতিহত করতে পারবে কি? তিনিই আদেশ ও নিষেধ জারী করেন। তাঁর উপর ক্ষমতাবান কে আছে?

তাঁর ইচ্ছা ও হুকুম বাস্তবায়নে কোনো অংশীদার বা সহকর্মী বা উজীর নাজিরের প্রয়োজন আছে কি? তিনি কি একক কর্তৃত্বের অধিকারী নন? তিনিই সর্বোপরি বাদশাহ, রাজাধিরাজ; সবই তাঁর বান্দা ও গোলাম। তিনি বান্দাদের উপর অত্যন্ত ক্ষমতাবান।

তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করবেন। আসমান যমীনের এমন কেউ কি আছে, যাকে তিনি সৃষ্টি করেননি কিংবা তাঁর ক্ষমতার বাহিরে? সমস্ত সৃষ্টি একত্রিত হলেও কি তারা একটি মাছির পাখা বানাতে পারবে? এই ক্ষমতা তিনি কাউকে দিয়েছেন কি? তিনি যখনই কোনো কিছু সৃষ্টি বা ধ্বংস করতে চান, তাকে শুধু বলে দেন ‘হও’, আর তখনই তা হয়ে যায়। তিনি কোনো কিছু সৃষ্টি করতে চাইলে কিংবা ধ্বংস করতে চাইলে কোনো উপায় বা উপকরণ লাগে না। তিনিই কি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান নন? কত সক্ষম স্রষ্টা তিনি!

কাউকে উচ্চপদস্থ বা অপদস্থ করার ক্ষমতা তাঁরই হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন, আবার যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন। এসব তাঁরই ক্ষমতায়, তাঁরই এখতিয়ারে। এতে অন্য কারো ক্ষমতা বা অধিকার নেই।

তিনিই মহাবিশ্বের মালিক,তাঁর হাতেই রয়েছে রাজত্ব। তিনি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন, যার কাছ হতে ইচ্ছা রাজত্ব কেড়ে নেন। অবশেষে এই পৃথিবীতে শুধু তাঁরই হুকুমত চলবে। তিনিই তাঁর অনুগত বান্দাদের জন্য তা নির্ধারণ করে রেখেছেন। তিনিই সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠ কাফেরদের বিরুদ্ধে জয় দান করেন। যারা তাঁর সাথে হঠকারিতা করে কিংবা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, তিনিও তাঁদের বিরুদ্ধে কৌশল অবলম্বন করেন এবং ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেন। বস্তুতঃ তিনিই কি পরাক্রমশালী নন? তিনিই কি সর্বশ্রেষ্ঠ কুশলী ও হিকমতওয়ালা নন? তিনিই কি প্রতিশোধগ্রহণকারী নন? মুসলমানগণ যখন কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তখন মুসলমানদের বিজয় দান কে করেন, কাফেরদেরকে ধ্বংস কে করেন? সেটি কি মুসলিম শক্তি, মুসলমানদের সংখ্যা কিংবা অস্ত্র শক্তি? না, তিনি আল্লাহই কাফেরদের হত্যা করেন, তাদের মূল কর্তন করে দেন। তাঁর ইচ্ছা ও সাহায্য না থাকলে মুসলমানগণ কখনোই বাতিলকে ধ্বংস করতে পারতো না।

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা’আলার ওয়াদা সত্য। তাঁর চেয়ে অধিক ওয়াদাপালনকারী আর কে আছে? বান্দা যখন আল্লাহর রাস্তায় বের হবে, আল্লাহ্কে সাহায্য করবে, যথাযথ চেষ্টা করবে, যথার্থ প্রস্তুতি গ্রহণ করবে, তখন আল্লাহ তা’আলাও বান্দাকে সাহায্য করেন, আসমানী মদদ নাযিল

করেন। তাঁর ওয়াদাকে রুখতে পারে, ব্যর্থ করে দিতে পারে আসমান-যমীনে এমন কে আছে?

যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার হুকুমসমূহের হেফাযত করে, আল্লাহ তাআলা তার হেফাযত করেন। সমস্ত মানবজাতি, জীনজাতি, বরং সমস্ত সৃষ্টিজগত যদি একত্রিত হয়ে আমার কোনো উপকার করতে চায়, আর আল্লাহ তাআলা যদি না চান, তাহলে তারা আমার কোনো উপকার করতে পারবে না। আবার সকলে মিলে যদি আমার কোনো ক্ষতি করতে চায়, আর আল্লাহ তাআলা আমার কোনো মঙ্গল চান, তাহলেও কি তারা আমার কোনরূপ ক্ষতি সাধন করতে পারবে? কক্ষনোই পারবে না।

তিনিই জীবনদাতা, তিনিই মৃত্যুদাতা। তিনিই প্রত্যেকের জন্য মৃত্যুর ক্ষণ ও স্থান ঠিক করে রেখেছেন। তিনি যদি আমাকে মৃত্যু না দেন, তিনি যদি আমার জন্য জীবিত থাকার ফয়সালা করেন, আমার শাহাদাতের ফয়সালা এখনি না করেন, বাতিলের এমন কী শক্তি আছে যে আমাকে হত্যা করবে? তাদের পারমানবিক বোমাও কি আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে? কক্ষনো পারবে না।

তিনি বানিয়েছেন অসংখ্য অগণিত ফেরেশতা, তাঁর বাহিনী সম্পর্কে কেবল তিনিই জানেন। তিনি ইচ্ছা করলে মশা-মাছি দিয়েও তাঁর শত্রুদের ঘায়েল করতে পারেন। তাঁর বাহিনী কত বিশাল তা কেউ কোনো দিন কল্পনাও করতে পারবে না।

তিনিই আমাদের সাহায্যকারী, তিনিই আমাদের শক্তি, তিনিই আমাদের সৈন্যবাহিনী! তিনি যদি আমাদের সাহায্য না করেন, তাহলে তিনি ছাড়া কে আছে যে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে?

তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং কিয়ামতের দিন পুনর্বার সকলকে জীবিত করবেন। মহাবিশ্বের সকল কিছুকে ধ্বংস করে পুনর্বার সৃষ্টি করা আর কোনো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সৃষ্টিকে ধ্বংস করে পুনরায় সৃষ্টি করা তাঁর নিকট সমান। তাঁর মতো ক্ষমতাবান, তাঁর মতো সক্ষম আর কেউ আছে কি?

তিনি যদি কাউকে ক্ষমা করতে চান, কিংবা কাউকে আযাবে গ্রেপ্তার করতে চান, কোনো জাতিকে ধ্বংস করতে চান, তাঁর ইচ্ছাকে প্রতিহত করার কে আছে? আল্লাহ তাআলাকে অপারগ করতে পারে এমন কেউ আছে কি? তিনিই কি পরম ক্ষমাশীল, আবার মহাপরাক্রমশালী, আযীযুল গাফ্‌ফার নন? তিনিই কি একক, মহাপ্রতাপান্বিত, ওয়াহিদুল কাহ্‌হার নন?

তিনিই কি হযরত নূহ আলাইহিস্ সালামের জাতিকে এক মহা প্রলয়ংকারী বন্যায় নিমজ্জিত করে ধ্বংস করেননি? আকাশ কি আল্লাহর হুকুম পালন করেনি, যমীন কি তাঁর হুকুম পালনে কোনো ত্রুটি করেছে? নূহ আলাইহিস্ সালামকে উপহাস কারীরা এখন কোথায়? দুরাত্মা কাফেররা কি নিপাত যায় নি?

হযরত হূদ আলাইহিস্ সালামের জাতি 'আদ' কুফুরী ও শিরকে লিপ্ত ছিল। তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক ভয়াবহ ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা, যা তাদের উপর প্রবাহিত করা হয়েছিল সাত রাত্রি ও আট দিবস অবিরাম, কতিপয় অশুভ দিনে। তাদেরকে দুনিয়ার জীবনেই লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির স্বাদ উপভোগ করানো হয়েছিল, আর আখিরাতের আযাবতো আরো অপমানজনক। তারা কি বলতো না, "পৃথিবীতে আমাদের চেয়ে শক্তিধর আর কে?" কিন্তু তাদের পরিণতি কী হয়েছিল? তুমি যদি তাদেরকে দেখতে

পারতে, তাহলে দেখতে, তারা অসার খর্জুর কাণ্ডের ন্যায় ভূপাতিত হয়ে রয়েছে। তাদের কোনো অস্তিত্ব দেখতে পাও কি?

হযরত সালেহ আলাইহিস্ সালামের জাতি 'সামুদ' আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা করেছিল? তারা কি এই যামানার হিন্দুদের মতো মূর্তি পূজারী ছিল না? হযরত শোয়ায়েব আলাইহিস্ সালামের জাতি মাদায়েনবাসী। তারা পরিমাপে ও ওজনে কম দিত আর পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়াত। আল্লাহ তাআলা কি তাদের উভয়কে এক ভয়ংকর মহানাদ দ্বারা পাকড়াও করেননি? ফলে ভোর হতে না হতেই তারা নিজ নিজ গৃহসমূহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল, যেন তারা কোনদিনই সেখানে ছিল না! আখিরাতের আযাব কি আরো কঠিন নয়?

হযরত লূত আলাইহিস্ সালামের জাতি সমকামিতায় লিপ্ত ছিল। তাদেরকে কি নির্মমভাবে ধ্বংস করে দেয়া হয়নি? তাদের জনপদকে শূন্যে উত্তোলন করে উপরকে কি নীচে করে দেয়া হয়নি? তার উপর কি স্তরে স্তরে কাঁকর পাথর বর্ষণ করা হয়নি? এগুলো কে করেছেন, আল্লাহ তাআলাই কি করেননি?

ওহে সমকামী পশ্চিমা সম্প্রদায়! তোমাদের পরিণতি কি তোমাদের বাপ-দাদাদের চেয়ে বেশি সুখকর হবে?

নিজেকে "খোদা" দাবীদার ফিরাউন ও তার অহংকারী জাতি আজ কোথায়? সে তো ছিল দুষ্কৃতিকারীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়? বহু কীলকের অধিকারী, উঁচু উঁচু প্রাসাদের অধিকারী। সারা দুনিয়ার যুলুম অত্যাচারীদের আদর্শ। আল্লাহ তাআলা কি ফিরাউনের জাতিকে দুর্ভিক্ষের আযাব দেননি? তাদেরকে তুফান দিয়ে শাস্তি কে দিয়েছিলেন? তাদের খেত–খামার আর

শস্যগুলোকে ধ্বংস করার জন্য পঙ্গপাল কে পাঠিয়েছিলেন? তাদের মাথার চুল থেকে শুরু করে চোখের ভ্রূ পর্যন্ত খেয়ে ফেলার জন্য উকুন কে পাঠিয়েছিলেন? বিছানায়, খাবারের প্লেটে, ঘরে-বাহিরে, মাঠে-ঘাটে সর্বত্র ব্যাঙের আযাব কে দিয়েছিলেন? তাদের সকল খাদ্য ও পানীয়কে কে রক্তে পরিণত করেছিলেন? 'প্লেগ' নামক মহামারী দিয়ে তাদেরকে আযাব কে দিয়েছিলেন? তিনি কি আল্লাহ তাআলা নন? ফিরাউন এবং তার জাতিকে আল্লাহ তাআলা কি নীলনদের পানিতে নিমজ্জিত করে ধ্বংস করে দেননি? প্রত্যেক যামানার পাপিষ্ঠদের জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ তার লাশকে কিয়ামত পর্যন্ত হেফাযতের ওয়াদা করেননি?

আল্লাহ তাআলা কি নমরুদকে একটি খোঁড়া মশা দ্বারাই ধ্বংস করে দেননি?

কা'বা ঘর ধ্বংস করতে আগত আবরাহার হস্তী বাহিনীকে ছোট্ট পাখি "আবাবীল" দ্বারা কে ধ্বংস করেছিলেন? তিনি কি মহাশক্তিধর, প্রতিশোধগ্রহণকারী মহান আল্লাহ তাআলা নন?

তাঁর বাহিনী কত বিশাল, তা কি কেউ কোনোদিন কল্পনা করতে পারবে? তিনি ইরশাদ করেন,

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ

"আপনার রবের বাহিনী (কত বিশাল সে) সম্পর্কে তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না।" (৭৪ সূরা মুদ্দাছ্ছির: ৩১)

ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে দেখ! মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলা কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছেন। তুমি কি তাদের কারোও কোনো সাড়া পাও? অথবা তাদের ক্ষীণতম আওয়াযও কি তুমি শুনতে পাও?

এভাবেই আল্লাহ তাআলার আযাব এসেছে তাদের উপর, যখন তারা মজ-মাস্তি আর ভোগ-বিলাসে মত্ত ছিল, কিংবা তারা বিশ্রাম নিচ্ছিল, কিংবা ছিল ঘুমন্ত অবস্থায়।

আর আল্লাহ তাআলা যখন কোনো পাপপূর্ণ জনপদকে ধরেন, তখন এমনিভাবেই ধরে থাকেন। নিশ্চয় তাঁর পাকড়াও অত্যন্ত মারাত্মক, বড়ই কঠোর।

ওহে সারা দুনিয়ার বাতিল শক্তি! তোমরা বড্ড বেশি কাফের, নাকি তোমাদের পূর্বপুরুষরা? তোমরা বেশি শক্তিশালী, নাকি তোমাদের বাপ-দাদারা? তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে আমাদের সত্য প্রভু, আসমান যমীনের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা ধ্বংস করে দিয়েছেন। তোমরা কি তাঁর ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেলে? তাঁর আযাব কি তোমাদের উপর আসবে না, যেমনি এসেছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের দুয়ারে? তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য আসমান-যমীনের কেউই এক ফোটা অশ্রু বিসর্জন করেনি, তোমাদের জন্যও করবে না। একটু অপেক্ষা কর, সে সময়টা কিন্তু খুব নিকটবর্তী!

ওহে মুসলিম সম্প্রদায়! কিসে তোমাদেরকে তোমাদের পালনকর্তা, মহা শক্তিধর প্রভু আল্লাহ তাআলা হতে গাফেল করে রেখেছে? তোমরা কিসের অপেক্ষা করছো? তোমাদের কিসের অভাব? তোমাদের জন্য কি এক আল্লাহ-ই যথেষ্ট নন?

তোমরাই বল-

ইসরাঈল বেশি শক্তিশালী, নাকি আল্লাহ তাআলা?

আমেরিকা বেশি শক্তিশালী, নাকি আল্লাহ তাআলা?

ইংল্যান্ড বেশি শক্তিশালী, নাকি আল্লাহ তাআলা?

রাশিয়া বেশি শক্তিশালী, নাকি আল্লাহ তাআলা?

ভারত বেশি শক্তিশালী, নাকি আল্লাহ তাআলা?

চীন বেশি শক্তিশালী, নাকি আল্লাহ তাআলা?

মায়ানমার বেশি শক্তিশালী, নাকি আল্লাহ তাআলা?

ইরান বেশি শক্তিশালী, নাকি আল্লাহ তাআলা?

ইতালী বেশি শক্তিশালী, নাকি আল্লাহ তাআলা?

....

এভাবে, সারা দুনিয়ার যেখানেই বাতিল ও ত্বগুত আছে, তাদের সম্মিলিত শক্তি, এক আল্লাহ তাআলার সামনে কি ক্ষমতা রাখে? তাদের সমস্ত সৈন্য, অস্ত্র, গোলা-বারুদ, কামান-ট্যাংক, মিসাইল আর পারমানবিক বোমা, এগুলো আল্লাহ তাআলার এক হুকুমের সামনে কি শক্তি রাখে?

তিনি যদি তোমাদের সাহায্য করেন, তাহলে তারা কি তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে? তাহলে তোমরা কাকে ভয় করছ? এরা একত্রিত হয়ে একটি মাছির ডানাও তো সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়? অথচ আল্লাহ তাআলাই কি এদের সকলের সৃষ্টিকর্তা নন?

আহ! মুসলমানদের এই অনুভূতি আজ গেল কোথায়? এই ঈমান গেল কোথায়? কেন আজ তারা এমন কাপুরুষতার মহা বীমারে ভুগছে?

ওহে মুসলমান! জেগে ওঠো! তোমরা কি পারনা নারায়ে তাকবীর "আল্লাহু আকবার" বলে আবারো ময়দান কাঁপাতে? তোমরা কি পারনা তাকবীরে তাকবীরে বাতিলের এককে মসনদ গুড়িয়ে দিতে? আল্লাহ তাআলার মহাপবিত্র নামের মাঝে যে অসীম শক্তি আছে, সে শক্তিতে কুফ্ফার গোষ্ঠিকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দিতে? এখনও সময় আছে। বিজয় তোমাদেরই পদচুম্বন করবে। "হয়তো শরীয়ত, নয়তো শাহাদত"- এই প্রতীজ্ঞা নিয়ে এখনি ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়। আল্লাহ তাআলা আমাদের সাথেই আছেন। তিনিই আমাদের রব। তিনিই আমাদের মাওলা, তিনিই আমাদের বন্ধু ও অভিভাবক। কত উত্তম মাওলা তিনি, কতই না উত্তম সাহায্যকারী!

চেয়ে দেখ! আমাদের প্রিয় নবীজীর দিকে, আমাদের প্রিয় নবীজীর সীরাতের দিকে, সাহাবায়ে কেরামের যিন্দেগীর দিকে, কিভাবে তাঁরা এই ঈমানকে বুকে লালন করেছেন, কিভাবে তাঁরা এই ঈমানকে নিয়ে ময়দানে লড়েছেন আর আল্লাহ তাআলাও কিভাবে তাঁদের সাহায্য করেছেন?

সেই আল্লাহ তাআলা কি এখনও আছেন না, তিনি কি মৃত্যুবরণ করেছেন? না, তাঁর তো মৃত্যু নেই, তিনি তো চিরঞ্জীব, শ্বাশ্বত, তিনিই তো জন্ম ও মৃত্যুর সৃষ্টিকর্তা। বরং যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে তরবারি উত্তোলন করেছিল, যুগে যুগে মুসলমানদের ধ্বংসের পায়তারা করেছিল, মুসলিম উম্মাহর সাথে গাদ্দারী করে 'মুনাফেকদের' খাতায় নিজের নাম লিখিয়েছিল, তারাই মৃত্যুবরণ করে আল্লাহ তাআলার কাছে

চলে গিয়েছে, তারাই ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, তারাই হয়েছে অভিশপ্ত, তাদের উপর লানত আল্লাহ তাআলার, সকল ফেরেশতাদের, সকল মানবজাতির এবং সকল মাখলূকের।

অন্যদিকে যারাই মুসলমানদের পক্ষে তরবারি উত্তোলন করেছে, উম্মাহর জন্য রক্ত, ঘাম আর চোখের পানি ঝরিয়েছে, তাদেরকে আল্লাহ আল্লাহ তাআলা মরতে দেননি। তাদেরকে 'শাহাদাত' নামক চিরজীবন দান করেছেন, ফলে তারা কবরেও রিযিকপ্রাপ্ত হচ্ছে। আর যারা গাজী হয়েছেন, তাদের যিকিরকে আল্লাহ তাআলা বুলন্দ করেছেন, চিরস্থায়ী করেছেন। আল্লাহ তাআলাই পারেন, আল্লাহ তাআলাই করেন।

"পাহাড় টলবে, পর্বত সরে যাবে, কিন্তু আমার ঈমান টলবে না, আমার পা সরবে না, আমার পদস্খলন হবে না। আল্লাহ আমার সাথে আছেন, আল্লাহ আমাকে দেখছেন, তিনিই আমাদের সাহায্যকারী।"-এই ঈমান মুসলমানের থাকবে, আর ময়দানে সে পরাজিত হবে এমনটি কখনো হয়নি, কখনো হবেও না।

এবার নতুন এক অধ্যায়ে যাওয়া যাক। সীরাতের মহাসমুদ্র থেকে একটি ফোটাতুল্য এমনি কিছু দৃষ্টান্ত, এমনি কিছু নির্ভীকতা আর বীরত্বের গল্প এখন আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নির্ভীকতা ও বীরত্বঃ

বীরত্ব ও বাহাদুরির ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর স্থান ছিল সকলের উপরে। তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বীর। কঠিন পরিস্থিতিতে বিশিষ্ট বীর পুরুষদের যখন পদস্খলন হয়ে যেত, তখনও রাসূলুল্লাহ ﷺ দৃঢ়তার সাথে টিকে থাকতেন। তিনি সে সুকঠিন সময়েও পশ্চাদপসরণ না করে সামনে অগ্রসর হতেন। তাঁর দৃঢ়চিত্ততায় এতটুকু বিচলিত ভাবও আসত না। হযরত আলী রদিয়াল্লহু আনহু বলেন, "যে সময় যুদ্ধের বিভীষিকা দেখা যেত এবং সুকঠিন পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো, সে সময় আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ছত্র ছায়ায় আশ্রয় নিতাম। তাঁর চেয়ে বেশি দৃঢ়তার সাথে অন্য কেউ শত্রুর মোকাবিলা করতে পারতো না।" (শাফী, কাজী আয়ায, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৮৯)

হযরত আনাস রদিয়াল্লহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমাকে অন্য লোকের উপর চার বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছেঃ দানশীলতা, বীরত্ব, পৌরুষশক্তি ও বিপক্ষের উপর প্রাধান্য। তিনি নবুয়তের পূর্বে এবং নবী থাকা কালেও প্রতিপত্তিশালী ছিলেন।" (নশরুত্তীব)

একদিন কুরাইশ প্রধানগণ কাবা ঘরের হাতিমের ভিতরে বসে গল্প করছিলো। তারা পরস্পর বলাবলি করছিলো, 'মুহাম্মাদ ﷺ এর ব্যাপারে আমরা যতখানি ধৈর্য্য ধারণ করেছি, ইতিপূর্বে আর কারো জন্য তা করতে হয়নি। আমাদের সে মূর্খ নির্বোধ বলে। আমাদের পূর্বপুরুষদের সে মন্দ বলে। আমাদের ধর্মের সমালোচনা করে। আমাদের ঐক্যের মাঝে ফাটল সৃষ্টি করেছে। আমরা এই সববিছু সহ্য করেছি।' এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ কাবা প্রাঙ্গণে এসে হাজরে আসওয়াদ পাথরকে চুম্বন করলেন। বাইতুল্লাহ

তাওয়াফ করতে শুরু করলেন। তাওয়াফের সময় কুরাইশদের নিকট দিয়ে অতিক্রমকালে তারা নবীজী ﷺ-কে কটু কথা বলে ঠাট্টা করতে লাগলো। নবীজী ﷺ-এর পবিত্র চেহারায় তাদের বিদ্রুপের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেলো। তিনি কাউকে কিছু না বলে তাওয়াফ করতে লাগলেন। দ্বিতীয়বার তাদের সামনে দিয়ে অতিক্রমকালে তারা আবারো বিদ্রূপ করলো। এবারো নবীজী ﷺ চুপচাপ সামনের দিকে অগ্রসর হলেন। তৃতীয়বারও তারা নবীজী ﷺ-কে কটু কথা বললে তিনি তাদের দিকে ফিরে বললেন, "হে কুরাইশগণ, তোমরা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? শুনো, সেই পাক যাতের কসম, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! আমি তো তোমাদেরকে জবাই করার জন্য এসেছি।" নবীজী ﷺ-এর মুখে এমন কঠোর কথা শুনে কাফেররা ভয় পেয়ে গেলো। তাদের মধ্য থেকে একজন বললো, হে আবুল কাসেম, আপনি চলে যান। আল্লাহর কসম! আপনি তো অন্যদের মতো নির্বোধ লোক নন। নবীজী ﷺ সেখান থেকে চলে গেলেন।

একরাতে অজানা একটি আওয়াযে মদীনা বাসীদের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। সবাই আওয়ায অনুসরণ করে ছুটতে লাগল। পথে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে দেখা হল। সকলেই বুঝলেন, তিনিই ﷺ সবার আগে সে আওয়াযের উৎস জানতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। নবীজী ﷺ কোলাহল লক্ষ্য করে অগ্রসর হলেন। সে সময় তিনি হযরত আবু তালহা রদিয়াল্লহু আনহুর একটি ঘোড়ার খালি পিঠে সওয়ার হয়ে ছিলেন। তাঁর ﷺ গলায় তরবারি ঝুলানো ছিল। তিনি ﷺ লোকদের বলছিলেন, ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না। (সহীহ মুসলিম, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ.২৫২)

একদিন প্রচণ্ড রোদ থেকে ফিরে তিনি একটি গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিলেন। ক্লান্তির দরুন তিনি নিদ্রায় ঢলে পড়লেন। তাঁর তলোয়ার ঝুলিয়ে রেখেছিলেন গাছের ডালে। এক লোক এসে তরবারিটি হাতে নিয়ে কোষমুক্ত করে চিৎকার করে বলল, কে তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে? নবীজী ﷺ শান্ত কণ্ঠে বললেন, আল্লাহ! লোকটির হাত থেকে তলোয়ার খসে পড়ল। তিনি ﷺ তরবারি হাতে নিয়ে বললেন, এবার তোমাকে কে আমার হাত হতে রক্ষা করবে? লোকটি বলল, হে মুহাম্মাদ! তুমি তরবারির সদ্ব্যবহার করো। তিনি ﷺ লোকটিকে ছেড়ে দিলেন।

উহুদ যুদ্ধের পরের ঘটনা। আবু সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বদরের প্রান্তরে দ্বিতীয়বার যুদ্ধের আহ্বান করে। নবীজী ﷺ তার এই আহ্বানকে সানন্দে গ্রহণ করেন। এদিকে আবু সুফিয়ান কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে বলে, সে সৈন্য পাঠানোর আগে মুসলমানদের ভীত-সন্ত্রস্ত করতে চায়। সে এ লক্ষ্যে ইহুদীদের হাত করে এবং দ্বিগুণ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে তাদেরকে মদীনায় পাঠায়। তাদের দায়িত্ব ছিল, মদীনায় গিয়ে এই গুজব ছড়ানো যে, কুরাইশরা বিশাল এক বাহিনী নিয়ে বদরে আসছে, যা ইতোপূর্বে মুসলমানরা দেখেনি। মদীনার মুসলমানরা এই গুজবকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। ফলে তাদের চেহারায় এক মারাত্মক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। শেষ পর্যন্ত এই গুজব এবং তাতে সাহাবায়ে কেরামের ভীতির কথা নবীজী ﷺ-এর পবিত্র দরবারে পৌঁছলে, তিনি সকল সাহাবায়ে কেরামকে একত্র করে ঈমানদীপ্ত এক ভাষণ প্রদান করেন, যা ছিল একদিকে হৃদয়স্পর্শী, অন্যদিকে অত্যন্ত জ্বালাময়ী!

"সংখ্যায় বেশির কথা শুনে আল্লাহর সৈনিকরা এত ভীত কেন? আল্লাহর ইবাদতকারীরা কি মূর্তি-পূজারীদের ভয়ে সন্ত্রস্ত? যদি তোমরা কুরাইশদের ভয়ে এত ভীত হয়ে পড় যে, তাদের যুদ্ধ-আহ্বানে সাড়া দেয়ার হিম্মত না থাকে, তাহলে যে সত্তা আমাকে রাসূল করে প্রেরণ করেছেন, তাঁর নামে শপথ করে বলছি, কেউ না গেলেও আমি একাই তাদের মোকাবেলার জন্য বদরে যাবো। আল্লাহর কসম! আমার গর্দান (দেহ থেকে) পৃথক হওয়া পর্যন্ত আমি একাই তাদের বিরুদ্ধে লড়ে যাবো।"

রাসূল ﷺ কিছুক্ষণ থেমে আরো কিছু বলতে চাচ্ছিলেন; কিন্তু রাসূল প্রেমিকদের আকাশ-বাতাশ প্রকম্পিত করা আবেগ-উত্তেজনাকর শ্লোগানে ঘুমন্ত মরু সিংহের দল জেগে উঠে। নবীজী ﷺ-এর এক ভাষণেই গোজবের প্রতিক্রিয়া দূর হয়ে যায়। পরের দিনই মুসলমানরা বদরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। ঐদিকে আবু সুফিয়ানও প্রথমে তার বাহিনী নিয়ে বের হয়েছিল, কিন্তু অজানা ভীতির কারণে, মাঝপথ থেকে সে তার বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ না করেই লেজ গুটিয়ে মক্কায় পালিয়ে যায়।

হুনায়ন যুদ্ধের সময় কাফেররা অবিশ্রান্ত তীর বর্ষণ করে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে একপ্রকার অস্থিরতা ও চিত্ত চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে দিয়েছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের অবস্থান একটুও পরিবর্তন করেননি। তিনি একটি ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিলেন এবং আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস রদিয়াল্লহু আনহু তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। কাফেররা সরাসরি তাঁকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলে তিনি ঘোড়া থেকে নেমে

আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং এক মুঠো মাটি হাতে নিয়ে শত্রুদের দিকে নিক্ষেপ করেন। তখন শত্রুপক্ষের এমন কেউ ছিল না, যার চোখে সে ধূলিকাণা প্রবেশ করেনি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এই কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন:

اَنَا النَّبِىُّ لَاكَذِبْ - اَنَابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

অর্থাৎ "আমি নবী; এতে সন্দেহ নেই। আমি বীর আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান।"

সেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ অপেক্ষা অধিক দুঃসাহসী, বীর ও নির্ভীক কাউকে দেখা যায়নি। (মাদারেজুন্নবুওয়ত)

হযরত ইবনে উমর রদিয়াল্লহ আনহু বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ অপেক্ষা না কোনো বীর, সরল ও উদারপ্রাণ ব্যক্তি দেখেছি এবং না অন্যান্য চরিত্র গুণেও তাঁর চাইতে পছন্দনীয় কাউকে দেখেছি। বদর যুদ্ধে আমরা তাঁর আড়ালে আশ্রয় নিতাম। কারণ, তখন তিনিই ছিলেন কাফেরদের সবচেয়ে নিকটবর্তী। (নশরুত্তীব)

সাহাবায়ে কেরামের নির্ভীকতা ও বীরত্বঃ

হযরত আবু বকর রদিয়াল্লহু আনহুর নির্ভীকতা ও বীরত্বঃ

হযরত আলী রাদিয়াল্লহু আনহু বলেন, সাহাবাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বীর ছিলেন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লহু আনহু। বদর যুদ্ধের দিন যখন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য একটি ছাপড়া তৈয়ার করলাম তখন আমরা বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কে থাকবে? যাতে কোনো মুশরিক তাঁর দিকে আসতে না পারে? আল্লাহর কসম, তখন কেউই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে থাকার সাহস করে নাই, একমাত্র হযরত আবু বকর রদিয়াল্লহু আনহুই ছিলেন, যিনি খোলা তরবারি হাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথার নিকট দাঁড়িয়ে গেলেন। যখন কোনো দুশমন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করত, তিনি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন। ইনিই হলেন লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় বীর ও বাহাদুর ব্যক্তি। (মাজমা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর প্রথম খলীফা নিযুক্ত হলেন হযরত আবু বকর রদিয়াল্লহু আনহু। আশেপাশের মুনাফিকরা একত্রিত হতে লাগল। চারদিকে ইসলাম ত্যাগের হিড়িক পড়ে গেল। অবাধ্য, বিদ্রোহীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। ফেতনা, ফাসাদ, দাঙ্গা, হাঙ্গামা দাবানলের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ল। তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রদিয়াল্লহু আনহু সকল আনসার ও মুহাজির সাহাবীদেরকে একত্রিত করলেন। তাদের সাথে পরামর্শ করলেন। তিনি বললেন, "আরবের লোকেরা যাকাত স্বরূপ তাদের উট এবং বকরী দিতে অস্বীকার করেছে এবং তারা বলছে যে, ঐ ব্যক্তি (নবীজী ﷺ), যার কারণে তোমাদেরকে সাহায্য করা হতো, সে মৃত্যু বরণ

করেছে। এখন তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও, আমিও তো তোমাদের মতো একজন মানুষ।" হযরত উমর রদিয়াল্লহু আনহু বললেন, "আমার মতামত হলো, তাদের থেকে নামায কবুল করা হোক এবং তাদের থেকে যাকাত মাফ করে দেয়া হোক। কেননা, তারা তো অজ্ঞতা যুগের কাছাকাছি। (অর্থাৎ নও মুসলিম।)" হযরত আবু বকর রদিয়াল্লহু আনহু উপস্থিত লোকদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন এবং লক্ষ্য করলেন যে, সকলেই হযরত উমরের কথায় সন্তুষ্ট। তখন হযরত আবু বকর রদিয়াল্লহু আনহু নিজ স্থান হতে দাঁড়ালেন এবং মিম্বরে আরোহন করলেন। প্রথমে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করলেন। অতঃপর তিনি সিংহের মতো গর্জে উঠলেন, নিজের ঈমানী চেতনা প্রকাশ করলেন এবং বললেন,

" হে লোক সকল! আমি সেই সময় পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার একটি আদেশের জন্য জিহাদ করতে থাকব, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা স্বীয় অঙ্গিকার পূর্ণ করবেন এবং আমাদের মধ্য থেকে জিহাদকারী জিহাদ করতে করতে শহীদ হয়ে যাবে এবং জান্নাতের হকদার হয়ে যাবে। আমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে, তারা খলিফা হয়ে জমিনের মালিক হয়ে যাবে। আল্লাহর শপথ! এ লোকেরা (যাকাত অস্বীকারকারীরা) যদি একটি রশিও যা নবীজী ﷺ-এর যামানায় তারা দিত, আমাকে দিতে অস্বীকার করে, তাহলে আমি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবো। যদিও তাদের পক্ষে বৃক্ষ, পাথর এবং সমগ্র জীন ও ইনসান লড়াই করে। আর এ যুদ্ধে আমার ডান হস্ত আমার সঙ্গ না দিলে বাম হস্ত দিয়েই (অর্থাৎ কেউ আমার সাথে না থাকলেও) আমি (একাই) তাদের (মুর্তাদদের) বিরুদ্ধে জিহাদ করে যাবো।"

এ কথা শুনে হযরত উমর রদিয়াল্লহু আনহু জোরে তাকবীর দিয়ে উঠলেন, "আল্লাহু আকবার", "আল্লাহু আকবার"। অতঃপর বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি বুঝতে পেরেছি, একথা সত্য।" (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, তাফসীরে ইবনে আতিয়্যাহ ২/৮৬)

হযরত উমর রদিয়াল্লহু আনহুর নির্ভীকতা ও বীরত্বঃ

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত উমর রদিয়াল্লহু আনহু নবীজী ﷺ-কে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সেই পাক যাতের কসম, যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন, আমি যে সকল মজলিসে কুফুরির অবস্থায় বসতাম, সে সকল মজলিসে আমার ঈমানকে অবশ্যই প্রকাশ করবো। তারপর তিনি দারুল আরকাম থেকে বেরিয়ে বাইতুল্লাহ আসলেন এবং তাওয়াফ করলেন। তাওয়াফ শেষে কুরাইশদের মজলিসে গেলেন। কুরাইশরা তার অপেক্ষাতেই ছিল। সেখানে তিনি সবার সামনে উচ্চস্বরে বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। কুরাইশরা এই কালেমা শুনামাত্রই তাঁর উপর ঝাপিয়ে পড়লো। তিনি একাই সবার সাথে লড়াই করলেন এবং উতবাকে মাটিতে ফেলে তার বুকের উপর চড়ে বসলেন। তারপর তাকে বেদম মারতে লাগলেন। তার চোখে এত জোরে আঘাত করলেন যে উতবা চিৎকার করা শুরু করলো। উতবাকে সেখানে ফেলে রেখে ওমর রদিয়াল্লহু আনহু উঠে দাঁড়ালেন এবং সেখান থেকে কুরাইশদের অন্য এক মজলিশে গেলেন। সেখানেও নিজের ঈমানকে প্রকাশ করে সেখানকার সর্দারকে পিটালেন। এভাবে কুরাইশদের প্রত্যেক মজলিশে গিয়ে ওমর রদিয়াল্লহু আনহু তাদের সর্দারদেরকে পিটিয়ে

আসলেন এবং নিজের ঈমানকে প্রকাশ করে আসলেন। তারপর তিনি নবীজী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, "আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! আপনার আর কোনো ভয় নেই।" তখন নবীজী ﷺ ঘর হতে বের হলেন। হযরত উমর ও হযরত হামযা রদিয়াল্লহু আনহুমা তাঁর সম্মুখে চললেন, মুসলমানরাও পিছে পিছে চললেন। তারা বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করলেন এবং নিশ্চিন্ত মনে সেখানে নামায আদায় করলেন। তারপর সকলে যার যার ঘরে ফিরে গেলেন।

মদীনায় হিজরতের সময় সকল সাহাবীই গোপনে হিজরত করেছেন। একমাত্র হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লহু আনহুই এমন ব্যক্তি যিনি প্রকাশ্যে হিজরত করেন। তিনি যখন হিজরত করার ইচ্ছা করলেন তখন নিজের তলোয়ার গলায় বাঁধলেন এবং ধনুক কাঁধে ঝুলিয়ে নিলেন এবং তীরদান হতে কয়েকটি তীর হাতে নিয়ে বাইতুল্লাহর নিকট আসলেন। কুরাইশদের কয়েকজন সর্দার সেখানে বসেছিল। হযরত উমর রদিয়াল্লহু আনহু বাইতুল্লাহর সাত চক্কর তাওয়াফ করে মাকামে ইবরাহীমের নিকট এসে দুই রাকাত নামায আদায় করলেন। এরপর মুশরিকের এক একটি মজলিশের নিকট গিয়ে বললেন, এই সমস্ত চেহারা অপদস্ত হোক! (আমি হিজরত করার জন্য বের হয়েছি।) যে ব্যক্তি চায়, তার মা পুত্র-হারা হোক, তার সন্তানরা এতীম হোক আর তার স্ত্রী বিধবা হোক, সে যেন এই ময়দানের অপর পাশে এসে আমার সাথে সাক্ষাৎ করে। (অতঃপর তিনি সেখান হতে হিজরতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন) কুফ্ফারদের একজনও তার পিছু নিতে সাহস পায়নি। (মুন্তাখাবুল কান্‌য)

হযরত আলী রদিয়াল্লহু আনহুর নির্ভীকতা ও বীরত্বঃ

তিনি বলেন, “আমি তো যে কোনো দুশমনের মোকাবেলা করেছি, আমার হক আমি উসুল করে নিয়েছি।” (অর্থাৎ সর্বদাই ইসলামের দুশমনদেরকে পরাজিত করেছি।)

ওহুদের যুদ্ধের দিন হযরত আলী রদিয়াল্লহু আনহু হযরত ফাতেমা রদিয়াল্লহু আনহার নিকট যেয়ে বললেন, দোষত্রুটিমুক্ত এই তরবারি নাও। (অর্থাৎ ইসলামের শত্রুনিধনে এই তলোয়ার কোনরূপ ত্রুটি করেনি।)

খন্দকের যুদ্ধের দিন আমর ইবনে আব্দে উদ্দ যুদ্ধের জন্য পরিখা অতক্রম করে মুসলমানরা যে পাশে ছিল সে পাশে চলে আসল এবং ‘মোকাবেলার জন্য কে প্রস্তুত আছে?’ বলে বলে চিৎকার করতে লাগল। সে ছিল বিশাল বপুধারী, দৈত্য সমতুল্য। ফলে আরবরা তাকে মানুষ নয়, অসুর শক্তির অধিকারী বলে মনে করত। এ কথা সবাইকে বলতে শুনা যায় যে, আমর শক্তিশালী ঘোড়াকে পর্যন্ত অতি সহজভাবে কাঁধে তুলতে পারে এবং পাঁচশ অশ্বারোহীকে সে একাই পরাজিত করতে পারে। মুসলমানরা জানত, তার মোকাবেলা করা মানে ‘আত্মহত্যার’ শামিল। ফলে কেউ সামনে অগ্রসর হওয়ার সাহস পাচ্ছিল না। ইতোমধ্যে হযরত আলী রদিয়াল্লহু আনহু দাঁড়িয়ে গেলেন, বললেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি প্রস্তুত আছি।” রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এই ব্যক্তি আমর, বসে যাও। এদিকে আমর হুঙ্কার দিয়েই যাচ্ছিল, মুসলমানদেরকে তিরস্কার করে বলতে লাগল, কোথায় তোমাদের সেই জান্নাত যার ব্যাপারে তোমাদের ধারণা যে, তোমাদের যে কেউ কতল হয় সে তাতে প্রবেশ করে? তোমরা আমার মোকাবেলায় কি কাউকে পাঠাতে পারো না?

হযরত আলী রদিয়াল্লহু আনহু তিনবার অনুমতি চাইলেন, নবীজী ﷺ তিনবারই বললেন, সে আমর, বসে যাও। এবার আলী রদিয়াল্লহু বললেন, হোক না সে আমর (আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট)! অবশেষে রাসূল ﷺ তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরে স্বীয় পাগড়ি মাথা হতে খুলে হযরত আলী রদিয়াল্লহু আনহুর মাথায় স্বহস্তে বেঁধে দেন। নিজের তরবারিটিও হযরত আলী রদিয়াল্লহু আনহুর হাতে তুলে দেন। এসময় রাসূল ﷺ এর যবান মুবারক থেকে বের হয়ে যায়- "আলীর সাহায্যকারী একমাত্র তুমিই হে আল্লাহ।"

হযরত আলী রদিয়াল্লহু আনহু এগিয়ে গেলেন। আমর কে প্রথমে ইসলামের দাওয়াত দিলেন, সে প্রত্যাখ্যান করলো। আমর বলল, "হে আমার ভাতিজা, আমাকে মোকাবেলার জন্য তুমি কেন এসেছো? আল্লাহর কসম, আমি তো তোমাকে কতল করতে পছন্দ করি না।" হযরত আলী রদিয়াল্লহু আনহু বললেন, কিন্তু আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে কতল করতে ভালোবাসি। একথা শুনে আমর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলো এবং হযরত আলী রদিয়াল্লহু আনহুর দিকে অগ্রসর হলো। উভয়ে আপন আপন সওয়ারী হতে নেমে পড়ল এবং একে অপরকে আক্রমণ করার জন্য যুদ্ধের ময়দানে চক্কর দিতে লাগল। অবশেষে হযরত আলী রদিয়াল্লহু আনহু আল্লাহ তাআলার সাহায্যে এই দৈত্যের ভবলীলা সাঙ্গ করে দিলেন।

খায়বারের যুদ্ধের দিন ইহুদী পালোয়ান মুরাহহাব স্বগর্বে আপন তরবারি নাড়িয়ে নাড়িয়ে বাহির হয়ে এলো এবং এই কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল-

"সমস্ত খায়বার বাসী ভালো করে জানে,
আমি মুরাহ্হাব, অস্ত্রসজ্জিত, অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বাহাদুর,
(আমার বাহাদুরী তখন দেখা যায়)
যুদ্ধের অগ্নিশিখা যখন প্রজ্জ্বলিত হয়।"

তাকে মোকাবেলা করতে গিয়ে সর্বপ্রথম হযরত আমের রদিয়াল্লহু আনহু শাহাদাত বরণ করেন। অতঃপর নবীজী ﷺ বললেন, আজ আমি এমন এক ব্যক্তিকে ঝাণ্ডা দান করব, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে মহব্বত করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আলী রদিয়াল্লহু আনহুর হাতে ঝাণ্ডা তুলে দিলেন। মুরাহ্হাব পূর্বের ন্যায় কবিতা আবৃত্তি করতে করতে ময়দানে হুঙ্কার দিচ্ছিল।

তার মোকাবেলায় হযরত আলী রদিয়াল্লহু আনহু এই কবিতা আবৃত্তি করতে করতে বাহির হয়ে আসলেন-

"আমি সেই ব্যক্তি, যার মা তার নাম রেখেছে হায়দার (আল্লাহর সিংহ)'
আমি জঙ্গলের বিভৎসদর্শন সিংহের ন্যায়।
আমি দুশমনকে পরিপূর্ণ মাপ দিব,
যেমন প্রশস্ত দাড়িপাল্লায় পূর্ণরূপে মেপে দেয়া হয়।
(অর্থাৎ অতিমাত্রায় শত্রুনিধন করবো।)"

অতঃপর হযরত আলী রদিয়াল্লহু আনহু তরবারির এমন আঘাত হানলেন যে, মালাউন মুরাহ্হাবের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করে তাকে হত্যা করে ফেললেন।

খায়বারের যুদ্ধের দিন হযরত আলী রদিয়াল্লহু আনহু দূর্গের দরজা তুলে ধরলেন। মুসলমানরা সেই দরজার উপর আরোহন করে দূর্গের ভিতর

প্রবেশ করলেন এবং দূর্গ জয় করলেন। পরবর্তীতে সেই দরজা উত্তোলন করতে চল্লিশ জন (আরেক বর্ণনায় সত্তর জন লোক) প্রয়োজন হয়েছিল।

হযরত যুবাইর বিন আওয়াম রদিয়াল্লহু আনহুর নির্ভীকতা ও বীরত্বঃ

ইসলামের ইতিহাসে হযরত যুবাইর মুরতাজা রদিয়াল্লহু আনহুর তরবারীই সর্বপ্রথম তরবারী যা আল্লাহর খাতিরে ক্রোধান্বিত হয়ে উত্তোলিত হয়েছিল।

তখন তাঁর বয়স মাত্র বার বছর। একদিন দুপুরবেলা তিনি কাইলুলাহ অর্থাৎ বিশ্রাম করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ তিনি একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন, মক্কার কেউ নবীজী ﷺ-কে শহীদ করে দিয়েছে। এই আওয়াজ শুনামাত্রই তিনি খোলা তরবারি হাতে বের হয়ে গেলেন। পথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সামনা সামনি দেখা হয়ে গেল। নবীজী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, হে যুবায়ের, তোমার কী হয়েছে? তিনি আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি শুনতে পেয়েছি, আপনাকে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। নবীজী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কী ইচ্ছা করেছিলে? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, আমার ইচ্ছা ছিল যে, সমস্ত মক্কাবাসীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বো। তখন নবীজী ﷺ তাঁর জন্য ও তাঁর তরবারির জন্য দোয়া করলেন।

ওহুদের যুদ্ধের দিন মুশরিকদের ঝাণ্ডা বহনকারী তালহা বিন আবি তালহা আবদারী মুসলমানদেরকে তার মোকাবেলা করার জন্য আহ্বান জানাল। প্রথমতঃ মুসলমানরা তার সাথে মোকাবেলা করতে ঘাবড়িয়ে গেলেন। এদিকে হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম রদিয়াল্লহু আনহু তার মোকাবেলার জন্য বের হলেন এবং এক লাফে তালহার উটের উপর উঠে

তার সাথে যেয়ে বসলেন। উটের উপরই লড়াই আরম্ভ হলো। হযরত যুবাইর রদিয়াল্লহু আনহু তালহাকে উটের পিঠ হতে মাটিতে ফেলে দিয়ে আপন তরবারি দ্বারা জবাই করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর প্রশংসা করলেন এবং বললেন, প্রত্যেক নবীর জন্য (জীবন উৎসর্গকারী) হাওয়ারী (সাহায্যকারী) থাকে। আর আমার হাওয়ারী হলো যুবাইর। তিনি আরো বলেন, যেহেতু আমি দেখেছি, লোকেরা তালহা আবদারীর মোকাবেলায় পিছু হটছে, সেহেতু যদি যুবাইর তার মোকাবেলার জন্য না যেত তবে আমিই স্বয়ং যেতাম। (বিদায়াহ)

ইয়ারমূকের যুদ্ধের দিন অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম হযরত যুবাইর রদিয়াল্লহু আনহুকে বললেন, আপনি যদি কাফেরদের উপর হামলা করতেন, তাহলে আমরাও আপনার সাথে কাফেরদের উপর হামলা করতাম। হযরত যুবাইর রদিয়াল্লহু আনহু বললেন, আমি যদি হামলা করি তবে তোমরা তোমাদের কথা রক্ষা করতে পারবে না। তাঁরা বললেন, আমরা এমনটি করবো না। (বরং আমরা আপনার সাথেই থাকব।) তারপর হযরত যুবাইর রদিয়াল্লহু আনহু কাফেরদের উপর এমন জোরদার হামলা করলেন যে, তাদের কাতার ভেদ করে অপরদিকে বের হয়ে গেলেন অথচ সাহাবায়ে কেরামের মধ্য হতে কেউই তার সঙ্গে ছিলেন না। তিনি পুনরায় শত্রুর কাতার ভেদ করে ফিরে আসার সময় কাফেররা তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরে তাঁর কাঁধের উপর তরবারীর দুটি আঘাত করলেন, যা তাঁর বদরযুদ্ধে লাগা আঘাতের ডানে বামে দুই দিকে লাগল।

֍ হযরত মুআয ইবনে আমর ও মুআয ইবনে আফরা রদিয়াল্লহু আনহুমার নির্ভীকতা ও বীরত্বঃ আবু জেহেলের হত্যাকাণ্ড

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রদিয়াল্লহু আনহু বলেন, বদর যুদ্ধের দিন আমি যুদ্ধের কাতারে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এমতাবস্থায় আমি দেখলাম, আমার ডানে ও বামে (দশ/বার বছরের) দুইজন আনসারী বালক দাঁড়িয়ে আছে। আমার মনে খেয়াল আসল, যদি আমার পাশে দুইজন শক্তিশালী পুরুষ থাকতো (তবে কতই না ভালো হতো!) হঠাৎ তাদের একজন আমার হাত ধরে চুপিসারে বললো, চাচাজান, আপনি কি আবু জেহেলকে চিনেন? আমি বললাম, হ্যা, চিনি। তাকে দিয়ে তোমার কী প্রয়োজন? সে বলল, আমি শুনেছি, সে আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে গালাগালি করে। সেই পাক যাতের কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যদি তাকে দেখতে পাই, তবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট থেকে আমি পৃথক হবো না, যতক্ষণ না আমাদের উভয়ের মাঝে একজনের মৃত্যু হয়।

আমি তার মুখে বীরত্ব ব্যঞ্জক এমন কথা শুনে আশ্চর্যান্বিত হলাম। এমন সময় দ্বিতীয়জনও আমার হাত ধরে চুপিসারে একই প্রশ্ন করলো এবং প্রথমজন যা বলেছিল, দ্বিতীয়জনও তা-ই বলল। ইতিমধ্যে আবু জেহেলকে দেখলাম ময়দানে লোকদের মধ্যে ছুটে বেড়াচ্ছে। আমি তাদের উভয়কে বললাম, ঐ যে তোমাদের শিকার, যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে। একথা শুনামাত্র উভয় আনসার বালক ক্ষুধার্ত বাজপাখির মতো আবু জেহেলের উপর ঝাপিয়ে পড়লেন এবং তার উপর তরবারি চালাতে লাগলেন। অবশেষে তাকে কতল করে ফেললেন। এরপর তাঁরা উভয়ে নবীজী ﷺ-এর নিকট আসলেন এবং তাঁকে সংবাদ দিলেন।

নবী করীম ﷺ বললেন, তোমাদের উভয়ের মধ্যে কে আবু জেহেলকে হত্যা করেছ? প্রত্যেকেই বললেন, আমি তাকে হত্যা করেছি। রাসূলুল্লাহ বললেন, তোমরা কি তোমাদের নিজ নিজ তরবারি মুছে ফেলেছ? তারা বললেন, না। অতঃপর তিনি তাদের উভয়ের তরবারি দেখে বললেন, তোমরা উভয়েই তাকে হত্যা করেছো। এরপর তিনি আবু জেহেলের সামানপত্র হযরত মুআয ইবনে আমর ইবনে জামূহ রদিয়াল্লহু আনহুকে প্রদান করলেন। অপরজন হযরত মুআয ইবনে আফরা রদিয়াল্লহু আনহু ছিলেন।

মুআয ইবনে আমর ইবনে জামূহ রদিয়াল্লহু আনহু বলেন, আবু জেহেল কাফেরদের তীর-তলোয়ারের দুর্ভেদ্য পাহারার মাঝে অবস্থান করছিল। কাফেররা বলছিল, আবু জেহেলের কাছে কেউ যেন ঘেষতে না পারে। একথা শুনে আমি তার কাছাকাছি অবস্থান করতে লাগলাম এবং তাকেই আমার একমাত্র লক্ষ্য স্থির করে নিলাম এবং আবু জেহেলের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলাম।

যখন সে আমার আয়ত্তের ভিতর আসল, তখন তার উপর আক্রমণ করলাম এবং এমনভাবে তলোয়ার দ্বারা আঘাত করলাম যে, তার পায়ের অর্ধেক হাঁটুর নিচ দিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ঝরে পড়া খেজুরের ন্যায় তার পা উড়ে গেল। এদিকে আবু জেহেলকে আমি আঘাত করলাম আর অন্যদিকে তার পুত্র ইকরামা আমাকে আঘাত করলো। এতে যুদ্ধ করতে আমার অসুবিধা হচ্ছিল। আমি তখন হাতের কাটা অংশ পায়ের নীচে রেখে এক ঝটকায় হাত থেকে আলাদা করে ফেললাম। এরপর আবু জেহেলের নিকট মুআয ইবনে আফরা উপনীত হলেন। তিনি ছিলেন আহত। তিনি

আবু জেহেলের উপর এমন আঘাত করলেন যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দুশমন সেখানেই ঢলে পড়লো। আবু জেহেলের শেষ নিঃশ্বাস তখনো বের হয়নি। শ্বাস-প্রশ্বাস তখনও চলছিল।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর নবীজী ﷺ বললেন, আবু জেহেলের পরিণাম কে দেখবে, দেখে আস। সাহাবারা তখন আবু জেহেলের সন্ধান করতে লাগলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রদিয়াল্লহু আনহু আবু জেহেলকে এমতাবস্থায় পেলেন যে, তার নিঃশ্বাস তখনও চলাচল করছিল। তিনি আবু জেহেলের ধড়ে পা রেখে মাথা কাটার জন্য দাঁড়ি ধরে বললেন, ওরে আল্লাহর দুশমন, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তোকে অপমান অপদস্ত করলেন তো? আবু জেহেল বললো, কিভাবে আমাকে অসম্মান করলেন? তোমরা যাকে হত্যা করেছ তার চেয়ে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন আর কোনো মানুষ আছে নাকি? আহ! আমাকে কিশোর ছাড়া অন্য কেউ যদি হত্যা করতো! এরপর বলতে লাগল, আজ কারা বিজয়ী হয়েছে? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রদিয়াল্লহু আনহু বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ । হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রদিয়াল্লহু আনহু আবু জেহেলের কাঁধে পা চাপা দিয়ে রেখেছিলেন। আবু জেহেল তাকে বলল, ওরে বকরির রাখাল! তুই অনেক উঁচু স্থানে পৌঁছে গিয়েছিস। উল্লেখ্য, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রদিয়াল্লহু আনহু মক্কায় বকরি চরাতেন।

এ কথোপকথনের পর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রদিয়াল্লহু আনহু আবু জেহেলের মাথা কেটে নবীজী ﷺ-এর সামনে হাজির করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ হচ্ছে আল্লাহর দুশমন আবু জেহেলের মাথা। নবী করীম ﷺ বললেন, "হ্যাঁ সত্য, সেই আল্লাহর শপথ, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, হ্যাঁ সত্য, সেই আল্লাহর শপথ, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, হ্যাঁ সত্য, সেই আল্লাহর শপথ, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহ তাআলা সুমহান। সকল প্রশংসা তাঁরই জন্যে নিবেদিত, তিনি তাঁর ওয়াদা সত্য করে দেখিয়েছেন। নিজের বান্দাদের সাহায্য করেছেন এবং একাকীই সকল দলকে পরাজিত করেছেন।"

নারী সাহাবীদের নির্ভীকতা ও জিহাদ প্রেম:

হযরত ছফিয়্যাহ বিনতে আব্দুল মুত্তালিব রদিয়াল্লাহু আনহার নির্ভীকতা ও জিহাদপ্রেম:

কে সেই সেরা বুদ্ধিমতী নারী, পুরুষরা যার কারণে হাজার রকম হিসাব-নিকাশ করতে বাধ্য হতো?

কে সেই নির্ভীক সাহাবিয়া, যিনি ছিলেন সর্বপ্রথম এক মুশরিক হত্যাকারিণীর গৌরবে ভূষিত?

কে সেই বিচক্ষণ মহিলা, যিনি সৃষ্টি করেন আল্লাহর পথে সর্বপ্রথম তরবারির খাপমুক্তকরণের ইতিহাস?

তিনিই হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সম্মানিতা ফুপু আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা হযরত ছফিয়্যাহ হাশেমী ও কুরাইশী রদিয়াল্লহু আনহা।

চলুন দেখি, তিনি ওহুদের ময়দানে কী করলেন?

"জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ"র উদ্দেশ্যে ওহুদের যুদ্ধে তিনি ছোট্ট একটি মহিলা দল নিয়ে মুসলিম সৈনিকদের সাথে যোগ দেন। সেখানে তিনি আত্মনিয়োগ করেন পানির ব্যবস্থাপনায়, তৃষ্ণার্ত মুজাহিদদের পানি পান করিয়ে তৃপ্ত ও উজ্জীবিত করলেন, তীর চেঁছে তীক্ষ্ণ করলেন, ত্রুটিপূর্ণ ধনুক মেরামত করলেন।

তিনি যখন দেখতে পেলেন অল্প কয়েকজন ছাড়া মুসলিম বাহিনীর সকলেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একা ফেলে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে.....

এবং দেখতে পেলেন মুশরিকরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছাকাছি এবং প্রায় তাঁর উপর আক্রমণে উদ্যত, তখন তিনি হাতের পানির পাত্রটি ছুঁড়ে

ফেললেন জমিনের উপর আর আক্রান্ত শাবকের 'মা সিংহী'র মতো লাফিয়ে উঠলেন, ছিনিয়ে নিলেন এক পরাজিত সৈনিকের বর্শা, তা দিয়ে সৈনিকদের সারি ভেদ করতে করতে ছুটে চললেন, বর্শার তীক্ষ্ণ ফলা দিয়ে এদিক-ওদিক আঘাত করতে লাগলেন, মুসলিম সৈনিকদের লক্ষ্য করে গর্জে উঠলেন-

"আরে ও কাপুরুষের দল! আল্লাহর রাসূলকে ফেলে পালাতে চাও! নিজেদের জান বাঁচাতে চাও!"

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁকে এগিয়ে আসতে দেখলেন, তাঁর আশঙ্কা হলো যে, তিনি (ছফিয়্যাহ) তাঁর মৃত ভাই হযরত হামযা রদিয়াল্লহু আনহুর লাশ দেখে ফেলবেন, মুশরিক বাহিনী অত্যন্ত কুৎসিতরূপে যার বিকৃতি ঘটিয়েছে। তাই তাঁর পুত্র হযরত যুবাইর রদিয়াল্লহু আনহুকে নবীজী ﷺ বললেন,

-মাকে ফিরাও যুবাইর, তাড়াতাড়ি.....

যুবাইর রদিয়াল্লহু আনহু সেদিকে এগিয়ে গেলেন। বললেন,

মা, থামো, মা এদিকে এসো।

-সরে যা, খবরদার মা মা করবি না।

-আল্লাহর রাসূল ঐ দিকে যেতে নিষেধ করেছেন।

-কিন্তু কেন? আমি তো জানি আমার ভাইয়ের লাশ বিকৃত করা হয়েছে। তাঁর এ কুরবানি আল্লাহর জন্য।.....

এ কথা শুনে আল্লাহর রাসূল ﷺ যুবাইর রদিয়াল্লহু আনহুকে বললেন, যেতে দাও।

যুবাইর রদিয়াল্লহু আনহু তাঁর পথ ছেড়ে দিলেন।

যুদ্ধ শেষ হলে হযরত ছফিয়্যাহ রদিয়াল্লহু আনহা তাঁর আপন ভাই (নবীজী ﷺ-র আপন চাচা) হযরত হামযা রদিয়াল্লহু আনহুর বিকৃত লাশ দেখে বললেন-

এ সবই আল্লাহর খাতিরে হয়েছে।
আমার কোনো অসন্তুষ্টি নেই। আল্লাহর ফয়সালায় আমি তুষ্ট। সম্পূর্ণ সমর্পিত।
আল্লাহর কসম। আমি সবর করবো। আমি মনে করবো এ বিপদ আল্লাহর দ্বীনের জন্য এবং সে কারণে এর পূর্ণ প্রতিদান আমি অবশ্যই পাবো। ইন্‌শাআল্লাহ।

এবার দেখি, খন্দকের যুদ্ধে তিনি কী ঘটালেন?

খন্দকের যুদ্ধে তাঁর অবস্থান, সে তো বীরত্ব গাঁথা এক রুদ্ধশ্বাস কাহিনী, যার পরতে পরতে তাঁর বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা প্রস্ফূটিত, সাহসিকতা ও সঙ্কল্প প্রকাশিত.....

তাহলে চলুন, কান পেতে শুনি ইতিহাসের সেই বিখ্যাত কাহিনি.....

রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিলে নারী ও শিশুদের সুরক্ষিত দুর্গে রেখে যাওয়া ছিল তাঁর অভ্যাস। কেননা, প্রহরীদের অবর্তমানে কোনো বিশ্বাসঘাতক মদীনার ওপর আক্রমণ করে বসতে পারে। এবারও তিনি তাই করলেন।

মুসলমানরা যখন খন্দকের আশপাশে কুরাইশ ও তার মিত্রদের মুখোমুখি অবস্থান গ্রহণ করছিলেন, নারী ও শিশুদের শত্রুর আক্রমণ নিয়ে ভাবার সুযোগ তাদের ছিল না। মদীনার সীমান্তবর্তী এলাকায় ছিল পরিখা আর মদীনার ভিতরে একটি দূর্গের অভ্যন্তরে অবস্থান করছিল নারী ও শিশুরা । আর এদিকে মদীনার ভিতরে কিন্তু দূর্গের বাহিরে অবস্থান করছিল বনু কুরাইযার ইহুদী সম্প্রদায়। এদের সাথে মুসলমানদের শান্তিচুক্তি ছিল।

তখন ফযরের অন্ধকার। হযরত ছাফিয়্যাহ রদিয়াল্লহু আনহা হঠাৎ আবিষ্কার করলেন, এক ব্যক্তি দুর্গের দিকে এগিয়ে আসছে, দুর্গের চারপাশে উঁকিঝুকি করছে, আঁড়ি পেতে শুনতে চাচ্ছে কারা আছে এর ভিতরে.....

হযরত ছাফিয়্যাহ রদিয়াল্লহু আনহা বুঝে ফেললেন, নিশ্চয়ই এ লোক ইহুদী, কেননা মদীনায় এখন ইহুদী ছাড়া আর কেউ নেই। নিশ্চয়ই এর সাথে আরো লোক আছে। তাহলে নিশ্চয়ই এরা তাদের চুক্তি ভঙ্গ করেছে। কুরাইশদের সাথে হাত মিলিয়েছে। নিশ্চয়ই এরা এখন জানতে এসেছে, এখানে আক্রমণ প্রতিরোধকারী পুরুষ মানুষ আছে, না শুধু নারী আর শিশু অবস্থান করছে। এ মুহূর্তে এরা যদি আমাদের উপর আক্রমণ করে তাহলে তা ঠেকানোর জন্য কোনো একজন মুসলিম পুরুষ আমাদের পাশে নেই।....

এ অবস্থায় আল্লাহর ওই দুশমন যদি আমাদের প্রকৃত পরিস্থিতির খবর তার কওমের কাছে পৌঁছাতে সফল হয়, তাহলে ইহুদীরা নারীদের করবে বন্দী-বাঁদী আর শিশুদের বানাবে দাস-দাসী, সেটা হবে মুসলমানদের জন্য ভয়াবহ বিপদ ও বিপর্যয়ের কারণ।.....

এসব ভেবে তিনি নিজের ওড়না খুলে জড়ালেন মাথায়। কোমরে শক্ত করে গামছা বেঁধে কাঁধে তুলে নিলেন একটি বড় লৌহদণ্ড। নেমে এলেন দুর্গের প্রধান ফটকের কাছে। খুব ধীরে ও সাবধানে সেখানে তৈরি করলেন একটি ছিদ্র। সেই ছিদ্রপথ দিয়েই আল্লাহর দুশমনকে নিরীক্ষণ করতে থাকলেন সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টিতে। একসময় তিনি লোকটির অবস্থান দেখে নিশ্চিত হলেন। এবার তার উপর চূড়ান্ত আক্রমণ চালানো সম্ভব.....

নিশ্চিত হয়েই চালিয়ে দিলেন চরম হামলা। সর্বশক্তি দিয়ে লৌহদণ্ডের আঘাত হানলেন তার মাথায়। একদম নির্ভুল নিশানা। এমন ভয়াবহ আঘাত সহ্য করা ছিল অসম্ভব। লোকটি ধপাস করে পড়ে গেল মাটিতে।....

অবিলম্বে দ্বিতীয় ও তৃতীয় আঘাত হেনে তার জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দিলেন.....

প্রাণহীন নিথর দেহের কাছে নেমে এলেন দ্রুত। নিজের সঙ্গে রাখা ছুরি দিয়ে মাথা কেটে দেহ থেকে আলাদা করে ফেললেন। দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন মাথাটি দুর্গের উঁচু স্থান থেকে ছুঁড়ে মারলেন নিচের দিকে.....

ঢাল বেয়ে সেটি গড়াতে গড়াতে গিয়ে থামল সেই ইহুদীদের সামনে, যারা অপেক্ষা করছিল ওই সঙ্গীর সবুজ সংকেতের....

তারা সঙ্গী ইহুদীর কর্তিত মস্তক দেখে পরস্পর বলাবলি করতে থাকল, আরে এটা আমরা নিশ্চিতরূপেই জানতাম, মুহাম্মাদ কখনোই নারী ও শিশুদের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা না করে যাবার মানুষ নয়.....

এখন তো নিজের চোখেই দেখলাম....

এসব বলতে বলতে তারা ফিরে গেল নিজেদের গন্তব্যে।

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা! বলুনতো, ইতিহাসের এমন এক গুরুত্বপূর্ণ হত্যাকাণ্ড যখন ঘটালেন, তখন হযরত ছাফিয়্যাহ রদিয়াল্লহু আনহার বয়স কত ছিল?

ষাট বছর........(!!!)

কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই হত্যাকাণ্ডটি, একটু চিন্তা করুন! আল্লাহ তাআলাই ইসলাম ও মুসলমানদের হেফাযতকারী! সেদিনের এই হত্যাকাণ্ডটি না ঘটলে হয়ত আজ আমি, আপনি মুসলমান হতে পারতাম না। ইহুদীরা যদি নারী শিশুদের আক্রমণ করতো, মুসলমানদের মনোবল ভেঙে যেত, মদীনার বাহির এবং ভিতর দু'দিক দিয়ে আক্রমণের শিকার হয়ে মুসলমান জাতি ইতিহাস থেকে হারিয়ে যেতে পারতো!

আল্লাহ তাআলা তাঁর আপন শান অনুযায়ী নবীজী ﷺ-এর ফুপু আম্মাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমীন।

❀ হযরত নাসিবাহ আল্ মাযেনিয়া (উম্মে উমারা) রদিয়াল্লাহু আনহার নির্ভীকতা ও জিহাদপ্রেম:

তিনি ছিলেন সেই দুইজন আনসারী সাহাবিয়্যাহর অন্তর্ভূক্ত, যারা আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াতের দিন বাহাত্তর জন পুরুষের পাশাপাশি নবীজী ﷺ-এর কাছে বাইয়াত হন।

বাইয়াত শেষে হযরত উম্মে উমারা রদিয়াল্লহু আনহা ফিরে এলেন মদীনায়, আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত সম্মান বুকে নিয়ে.....

বাইয়াতের শর্তসমূহ পূরণ করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে.......

এরপর পেরিয়ে গেল বহু সময়, বহু দিন ও মাস.......

তারপর একদিন এসে গেল ওহুদের যুদ্ধ। সে যুদ্ধে হযরত উম্মে উমারা রদিয়াল্লহু আনহার রয়েছে এক বিরাট ভূমিকা, আহ্! কী যে উজ্জ্বল ও সমুন্নত সে কাহিনী!!! তাঁর বীরত্বের কাহিনী শুনলে পুরুষের পৌরুষত্বও লজ্জা পায়!!!

হযরত উম্মে উমারা রদিয়াল্লহু আনহা ওহুদের উদ্দেশ্যে বের হলেন নিজের পানির পাত্রটি নিয়ে, উদ্দেশ্য তাঁর আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীদের তৃষ্ণা নিবারণ করা। আরও নিয়েছেন যখমের একগুচ্ছ পট্টি (ব্যান্ডেজের প্যাকেট)......

আশ্চর্যের কিছু নেই! কেননা, ময়দানে থাকবেন তাঁর স্বামী আর কলিজার তিনটি অংশ-

এক অংশ হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ আর অপর অংশ হলো তাঁর দুই পুত্র হাবীব ও আব্দুল্লাহ......

তাছাড়া আল্লাহর দ্বীন হেফাযতের জন্য দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়াইকারী অন্যান্য মুসলমান ভাইয়েরাও তাঁর প্রিয় মানুষ।

ওহুদের যুদ্ধে ঘটে গেল যা ঘটার ছিল......

হযরত উম্মে উমারা রদিয়াল্লহু আনহা নিজের দুচোখে দেখলেন, কীভাবে মুসলিম বাহিনীর সুনিশ্চিত বিজয় 'মহা বিপর্যয়ে' রূপান্তরিত হয়ে গেল.....

তিনি দেখলেন কিভাবে মুসলিম বাহিনীর কাতারে হত্যা আর ধ্বংসযজ্ঞ তীব্রভাবে ছড়িয়ে পড়ল এবং একের পর এক তাঁদের লাশ পড়তে থাকল......

চলুন না, এই ভয়াবহ কঠিন মুহূর্তের বর্ণনার ভার ছেড়ে দেই খোদ হযরত উম্মে উমারা রদিয়াল্লহু আনহার ওপর, কারণ তিনিই পারবেন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ওই সময়ের সঠিক বিবরণ দিতে। তিনি বলেন-

"খুব সকালে আমি ওহুদের ময়দানে গেলাম, আমার হাতে ছিল একটি পানির মশক, যা থেকে আমি মুজাহিদ ভাইদের পানি পান করাব। একসময় আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছাকাছি পৌঁছলাম। শক্তি, বিজয় ও সাহায্যের পাল্লা তখন তাঁর ও তাঁর সঙ্গীদের দিকে ঝুঁকে ছিল.....

একটু পরেই মুসলিম বাহিনী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো, ফলে তিনি পড়ে রইলেন সামান্য কয়েকজনের প্রহরার মধ্যে যাঁদের সংখ্যা দশের উপরে নয়.....

ফলে আমি, আমার স্বামী ও পুত্র দ্রুত এগিয়ে গেলাম তাঁর নিকট.....

বালা যেমন কব্জিকে ঘিরে রাখে ঠিক তেমনি আমরা তাঁকে ঘিরে রাখলাম আর আমাদের সকল শক্তি ও অস্ত্র দিয়ে তাঁর উপর থেকে আক্রমণ প্রতিরোধ করতে থাকলাম.....

মহানবী ﷺ আমার দিকে তাকিয়ে দেখলেন মুশরিকদের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য কোনো ঢাল আমার কাছে নেই।

এরপর তাঁর দৃষ্টি পড়লো পলায়নপর একজনের উপর যার হাতে ঢাল ছিল। তিনি তাকে ডেকে বললেন, "তোমার ঢালটি এমন কাউকে দিয়ে যাও যে লড়াই করছে।" লোকটি নিজের ঢাল ফেলে রেখে চলে গেল। আমি সেটা তুলে নিলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি আক্রমণ ঠেকাতে লাগলাম।

আমি প্রিয়নবী ﷺ-এর প্রতিরক্ষায় তরবারি চালিয়ে, তীর ছুঁড়ে আমার সর্বশক্তি ব্যয় করতে করতে এক পর্যায়ে অক্ষম হয়ে পড়লাম। আমার শরীরের গভীর ক্ষতগুলো আমাকে অপারগ করে দিল।

এমন এক কঠিন মুহূর্তে উত্তেজিত উটের মতো চিৎকার করে 'ইবনে কামিআ' বলতে লাগল,

কোথায় মুহাম্মাদ? গেল কোথায়.......

আমি আর মুছআব ইবনে উমায়ের আগলে দাঁড়ালাম তার পথ, তখন সে তরবারির আঘাতে মুছআবকে ভূপাতিত করলো, আরেক আঘাতে তাকে শহীদ করে ফেলল.....

এরপর ভয়াবহ আঘাত করলো আমার কাঁধে, যাতে সৃষ্টি হলো গভীর ক্ষত....

তারপরও আমি তার উপর উপর্যুপরি আঘাত করলাম, কিন্তু আল্লাহর দুশমনের গায়ে ছিল দুটি বর্ম......

যে মুহূর্তে আমার পুত্র রাসূলের ওপর থেকে অবিরাম আক্রমণ প্রতিহত করে যাচ্ছিল হঠাৎ তাকে ভীষণ আঘাত করে বসল এক মুশরিক, যাতে তাঁর বাহু কেটে বিচ্ছিন্ন হবার উপক্রম হলো........

ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হতে থাকল........

আমি তাঁর কাছে এগিয়ে গেলাম, সেখানে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলাম। কোমল সুরে তাঁকে বললাম-

'আমার বেটা, আল্লাহর জন্য ওঠে পড়ো, আল্লাহর দুশমনদের খতম করতে এগিয়ে যাও....ওঠো বেটা....ওঠো....'

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার দিকে ফিরে তাকালেন আর বললেন-

'তুমি যা করতে পারলে এমনটি আর কে পারবে হে উম্মে উমারা?'

এরপর সেখানে এগিয়ে আসতে লাগল সেই লোকটি যে আমার পুত্রকে আঘাত করেছিল, তাকে দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ডেকে বললেন-

'উম্মে উমারা, এই দেখো, এটাই তোমার পুত্রের ঘাতক।'

দৌঁড়ে আমি এক লাফে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, তরবারি দিয়ে সজোরে আঘাত করলাম তার পায়ের নলায়, ধপাস করে পড়ে গেল সে মাটিতে.....

আমি তার কাছে এগিয়ে গেলাম। তরবারি ও বর্শার উপর্যুপরি আঘাতে তাকে শেষ করে দিলাম। প্রিয় নবী ﷺ আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন-

'তুমি তো তার কেসাস নিয়ে ফেললে, উম্মে উমারা......

আল্লাহর প্রশংসা করছি যিনি তোমাকে কেসাস গ্রহণে সফল করলেন.... তোমাকে নিজের চোখেই তার পতন দেখিয়ে দিলেন।'

*****

হযরত উম্মে উমারা রদিয়াল্লহু আনহার দুই পুত্রের বীরত্বও কম ছিল না, তাঁদের ত্যাগ ও কুরবানীও পিতা-মাতার চেয়ে কোনো অংশে তুচ্ছ ছিল না.....

কারণ সন্তান তো পিতা-মাতার আদর্শই পেয়ে থাকে, তারা হয় মা-বাবারই দৃষ্টান্ত।

তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ রদিয়াল্লহু আনহু বর্ণনা করেন-

"ওহুদের যুদ্ধে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ময়দানে হাজির হয়েছিলাম। লোকেরা যখন তাঁর নিকট থেকে দূরে সরে পড়ল, আমি আর আমার মা তাঁর নিকটবর্তী হলাম তাঁর উপর থেকে আক্রমণ ঠেকাতে......

নবীজী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি উম্মে উমারার পুত্র?

-হ্যাঁ।

-মারো, আঘাত করো......

তাঁর সামনে এক মুশরিককে লক্ষ্য করে প্রচণ্ড শক্তিতে একটি পাথর নিক্ষেপ করলাম, সঙ্গে সঙ্গে লোকটি পড়ে গেল, আমি পাথর ছুঁড়তে ছুঁড়তে তার উপর পাথরের স্তূপ বানিয়ে ফেললাম। নবীজী ﷺ আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসি দিলেন।

দৃষ্টি একটু ফিরাতেই তাঁর চোখে পড়ল আমার মায়ের কাঁধের যখম, সেখান থেকে ফোটায় ফোটায় রক্ত ঝরছিল। তিনি সচকিত হয়ে বললেন-

'তোমার মাকে দেখো...... তোমার মা.......

ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বেঁধে দাও। আল্লাহ তোমাদের পরিবারের মধ্যে বরকত দান করুন.......

তোমার মায়ের মর্যাদা অমুক অমুকের চেয়ে ঊর্ধ্বে........

আল্লাহ রহম করুন তোমাদের সকলের উপর।'

আমার মা তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন-

ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাদের জন্য এই দুআ করুন-

আমরা যেন জান্নাতে আপনার সঙ্গে থাকতে পারি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ দুআ করলেন-

'ইয়া আল্লাহ, জান্নাতে ওদের আমার সঙ্গী বানিয়ে দাও'।

এই দুআ শুনে আমার মা বললেন-

'এরপরে আমি আর কোনো কিছুরই পরোয়া করি না, দুনিয়াতে আমার যা হয় হোক। আমার কিছু যায় আসে না।'

উম্মে উমারা রদিয়াল্লহু আনহা ওহুদের ময়দান থেকে গভীর ক্ষত আর তাঁর জন্য রাসূলের বিশেষ সেই দুআ নিয়ে ফিরে এলেন।

আর প্রিয়নবী ﷺ ওহুদের ময়দান থেকে ফিরলেন এই কথা বলে-

'আমি যখনই ডানে, বামে তাকিয়েছি, দেখেছি উম্মে উমারা আমার প্রতিরক্ষায় লড়াই করছে।'

******

উম্মে উমারা রদিয়াল্লহু আনহা ওহুদের প্রান্তরে লড়াইয়ের প্রথম প্রশিক্ষণ নিলেন, যুদ্ধের ব্যাপারে দক্ষতা লাভ করলেন.......

স্বাদ উপভোগ করলেন জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর, ফলে জিহাদ থেকে দূরে সরে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

তাঁর নামে লিপিবদ্ধ রয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে অধিকাংশ যুদ্ধে শামিল থাকার বিরল গৌরবগাঁথা.......

তিনি হাজির ছিলেন হুদাইবিয়াতে, খাইবারে....

উমরাতুল কাযা-তে, হুনাইনে........

বাইয়াতে রিযওয়ানে.....

তিনি অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন ইয়ামামার প্রান্তরে......

আল্লাহ তাআলা হযরত উম্মে উমারা রদিয়াল্লহু আনহার প্রতি যেন খুশি হয়ে যান এবং তাঁকে খুশি করে দেন, কারণ তিনি ছিলেন মুমিন নারীদের জন্য এক অনন্য দৃষ্টান্ত......

অটল, অবিচল জিহাদকারিনীদের মাঝে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়া.....

আর নিঃসন্দেহে, তাঁর যিন্দেগী ছিল কাপুরুষদের গালে ভয়াবহ জুতার বাড়ি, মারাত্মক রকমের এক চপেটাঘাত!!!!!

এরকম অসংখ্য, অগণিত ঈমানদীপ্ত কাহিনীতে ইসলামের ইতিহাস ও সীরাতের গ্রন্থসমূহ সমৃদ্ধ। সকল কাহিনী এই কিতাবে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। তাই আমরা প্রত্যেকেই নিজ উদ্দ্যোগে বেশি বেশি সীরাত পাঠ করি।

“আল্লাহর তরবারি”র নির্ভীকতা ও বীরত্ব, অজেয় ‘রণকৌশল’: বিশ্লেষণ

➢ কে সেই “আল্লাহর তরবারি”:

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লহু আনহু ইসলামের সেই তরবারির নাম যা কাফেরদের বিরুদ্ধে চিরদিন খোলা থাকে, কখনো খাপবদ্ধ হয় না। তাঁর উপাধি “সাইফুল্লাহ”- আল্লাহর তরবারি। ইসলাম এমন এক ধর্ম যা একসাথে, অতি ক্ষুদ্র সময়ে মানবেতিহাসের সবচেয়ে চৌকষ বহু সমরনায়কের জন্ম দিয়েছে, যাদের অবদানে ইসলামের আলো দূর-দূরান্তে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে। তন্মধ্যে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লহু আনহু একজন। তাঁর রণ কৌশল, তুখোর নেতৃত্ব, সমরপ্রজ্ঞা, প্রত্যুৎপন্নমতীত্ব এবং বিচক্ষণতা ছিল অসাধারণ, ইতিহাসে অতুলনীয়। প্রতিটি রণাঙ্গণেই মুসলমানদের সংখ্যা ছিল অপ্রতুল। কাফেরদের সংখ্যা কোথাও দ্বিগুণ, কোথাও তিনগুণ। তথাপি তাঁর জীবনের প্রতিটি যুদ্ধেই মুসলমানরা বিজয় লাভ করে। তাঁর যুদ্ধের কৌশলগুলো ছিল অদ্বিতীয়। প্রতিটি যুদ্ধে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লহু আনহু যে সফল রণ-কৌশল অবলম্বন করেছিলেন তা আজকের প্রতিটি রাষ্ট্রের সেনা প্রশিক্ষণে গুরুত্বের সাথে ট্রেনিং দেয়া হয়ে থাকে।

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লহু আনহু এটা মানতে রাজি ছিলেন না যে, দুশমনের সৈন্যসংখ্যা বেশি হলে এবং তাদের রণসম্ভার অত্যাধুনিক ও উন্নত হলে আর মুসলমানদের সংখ্যা কম হলে ও তাদের অস্ত্র-শস্ত্রের মধ্যে আধুনিকতা না থাকলে শত্রুর মুখোমুখি হওয়া উদ্বেগজনক ও আত্মঘাতী হবে।

এমন ঘটনাও ঘটেছে, তিনি উর্ধ্বতনের নির্দেশ এড়িয়ে শত্রুর উপর আক্রমণ করে শ্বাসরুদ্ধকর বিজয় ছিনিয়ে এনেছেন। এটা আল্লাহ তাআলার প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ঈমান এবং দৃঢ় প্রত্যয়ের ফসল ছিল। ইসলাম এবং রাসূল ﷺ-এর প্রতি অগাধ ভালোবাসার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ছিল। তাঁর কথা হলো, মুসলমানরা কখনো পরাজিত হতে পারেনা। মুসলমানরা যদি এমন হয়ে যায় যে, তাদের হাত আল্লাহ তাআলা ফিরিয়ে দেন না, ময়দানে দৃঢ় থাকে, আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই সাহায্য করবেন, বিজয় দিবেন। মুসলমানদের পক্ষে আছেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা, সুতরাং পৃথিবীর কোনো শক্তিই নেই যে মুসলমানদের পরাজিত করতে পারে।

মূতার যুদ্ধে তার নেতৃত্বে তিন হাজার মুসলমান দুই লক্ষ রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে জয় লাভ করে। এ যুদ্ধে তাঁর হাতে নয়টি তরবারি ভাঙে।

আল্লাহ তাআলা তাঁর এই তরবারির হাতে পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যকে তছনছ করে দেন। তিনি পারস্য বাহিনীর কুফ্ফারদের সামনে হুঙ্কার দিয়ে উঠতেন,

انا فارس الضديد
انا خالد بن الوليد

"আমি পারস্যের যমদূত,
আমি খালিদ বিন ওলীদ।"

তিনি ছিলেন যুদ্ধ-প্রেমী। যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর প্রতি তাঁর মোহ ছিল না। নারীর মোহ কিংবা দুনিয়ার মহব্বত তাঁকে কোনোদিনই আকৃষ্ট করেনি, এসব ব্যাপারে তিনি ছিলেন পাথরসম নিস্পৃহ। তিনি তাঁর

সমস্ত যিন্দেগী কাটিয়েছেন রণাঙ্গণে। ইসলামের জন্য তিনি তাঁর যিন্দেগীকে ওয়াক্ফ করে দিয়েছিলেন।

তিনি বলতেন, "বাসর রাত কিংবা যে রাতে আমাকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়, তা আমার নিকট সেই কনকনে শীতের রাতের চেয়ে অধিক প্রিয় নয়, যে রাতে আমি মুহাজিরদের সঙ্গে আল্লাহর শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি।"

➢ হযরত খালিদ রদিয়াল্লহু আনহুর রণকৌশলঃ

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লহু আনহুর রণকৌশলের ভিত্তি ছিল আল্লাহর রাসূলের সমরনীতি, আর তা হলো, "দুশমন যত শক্তিশালীই হোক না কেন তাকে ভয় না পাওয়া, তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা এবং শত্রুপক্ষকে প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ না দিয়ে তাদের উপর চড়াও হওয়া, শত্রুর মাথায় চড়ে বসা, শত্রু বাড়ি হতে বের হবার পূর্বেই তার বাড়িতে উপস্থিত হয়ে মোকাবেলা করা। কোনো স্থান থেকে শংকার আভাস পেলেই তিনি সেখানে আক্রমণ করতেন। দুনিয়া থেকে কুফর নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে, তাই মুসলমানদের ঘরে থাকার সুযোগ নেই"। তিনি আজীবন এ নীতির উপর অটল ছিলেন।

তাঁর শক্তির মূল উৎস ছিল "ঈমানী জযবা ও প্রেরণা, আল্লাহর যিকির এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর স্মরণ। যুদ্ধের ময়দানে বুদ্ধি দানকারী একমাত্র আল্লাহ তাআলা। ঈমানের অগ্নিশিখার সামনে কোনো বাতিল টিকে থাকতে পারে না। শক্তি সংখ্যার দ্বারা হয় না, বরং শক্তি আল্লাহর মদদ দ্বারা সৃষ্টি হয়। আল্লাহ যাদের সঙ্গে থাকেন না তারা বড়ই দুর্বল হয়ে যায়।"

তিনি মাঝে মধ্যে চিন্তায় ডুবে যেতেন। তাঁর এই চিন্তা হত এক রণাঙ্গন শেষ করে অপর রণাঙ্গনের চিন্তা। তিনি অত্যন্ত চিন্তা-ভাবনা করে এবং ভালো-মন্দ সবদিক ভেবে যুদ্ধ করতেন। শত্রুদের নিকট অজস্র সমরশক্তি ছিল। তিনি এভাবে গভীর চিন্তা ভাবনা ছাড়াই স্বীয় বাহিনীর টানা জয় এবং দুর্দান্ত আত্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে লড়াই করে যেতে পারতেন। কিন্তু সেটা ঝুঁকি ও আশংকামুক্ত হতো না। আর মুসলমানদের জন্য বিনা প্রয়োজনে কোনো ঝুঁকি নেয়া শোভনীয় নয়। মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা কোনো যুদ্ধেই ১৫ হাজারের বেশি ছিল না। সাধারণত তাদের সংখ্যা ১৫ হাজার থেকে ১৮ হাজারের মধ্যে থাকত। মুসলমানরা সব সময়ই তিন থেকে ছয়গুণ সংখ্যক কাফেরের সাথে যুদ্ধ করতেন। ফলে তাদের মাথা ঠিক রেখে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে যুদ্ধ করতে হতো। তাদেরকে জোশের চেয়ে হুশের সঙ্গে লড়াই করতে হতো বেশি।

তাঁর ছিল দুর্ধর্ষ এক গোয়েন্দা বাহিনী। তারা সর্বক্ষণ জীবনের ঝুঁকিতে থাকতেন। যে কোনো মুহূর্তে ধরা পড়ে প্রাণ হারাবার সম্ভাবনা ছিলো তাদের। অসীম সাহসী মুজাহীদদের নিয়ে তাঁর গোয়েন্দা বাহিনী গঠিত হয়েছিলো। তারা গুপ্তচরবৃত্তীতে ছিলেন অত্যন্ত পারদর্শী। তাঁরা শত্রুর হৃদপিণ্ড কিংবা কলিজার ভিতর থেকে তথ্য বের করে নিয়ে আসতেন। ফলে যুদ্ধের পূর্বেই তিনি সঠিকভাবে জেনে নিতেন শত্রুদের অবস্থান, সৈন্য সংখ্যা, সৈন্য বিন্যাস, তাদের রণকৌশল কি হতে যাচ্ছে ইত্যাদি। এসব তথ্যের ভিত্তিতে তিনি অন্যান্য সিপাহসালারদের সাথে পরামর্শ করে খুব সহজেই যুদ্ধের পরিকল্পনা সাজাতে ও বাস্তবায়ন করতে পারতেন। গোয়েন্দা রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত তিনি অন্ধকারে ঢিল ছুড়তেন না।

কোনো সামরিক অভিযান বা হামলা করতেন না। এটাই ছিল তাঁর সামরিক দুরদর্শিতার অন্যতম নিদর্শন।

তিনি তাঁর সমস্ত বাহিনীকে একবারে যুদ্ধের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে বলতেন না। প্রতিটি যুদ্ধেই তিনি গোপনে এক বা একাধিক চৌকষ "রিজার্ভ ফোর্স" রাখতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা ঘোড়সওয়ার কিংবা তীরন্দাজ বাহিনী হতেন। এই বাহিনীকে তিনি তখন কাজে লাগাতেন, যখন অগ্রবাহিনী দুর্বল হয়ে যেত বা পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখা দিত বা দুশমন বাহিনীকে শেষ মার দেয়ার প্রয়োজন পড়ত।

তিনি তাঁর বাহিনীকে যখন যুদ্ধের জন্য দাঁড় করাতেন, মুজাহিদদের সামনে এমন হাস্যোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে হাজির হতেন যে, সকলের মনোবল বৃদ্ধি পেত এবং ঈমানী জযবা জাগ্রত হতো।

প্রতিটি যুদ্ধেই চট করে তিনি অভিনব সব নতুন নতুন কৌশল আবিষ্কার করতেন। ফলে কুফ্ফাররা তাঁর ফাঁদে নিশ্চিত পড়ত। তিনি যেভাবে পরিকল্পনা সাজাতেন দেখা যেত কুফ্ফাররা সেভাবেই তাঁর ফাঁদে পা দিয়েছে। ফলে সংখ্যায় অধিক হওয়া সত্ত্বেও তারা মুসলমানদের ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয়েছে।

যে কোনো যুদ্ধে তিনি কাফেরদের মাঝে ভীতি ও ত্রাস সৃষ্টিতে ছিলেন উস্তাদ। রণাঙ্গনে এমন ত্রাস সৃষ্টি করতেন যে, যে একবার তাঁর সাথে যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা নিয়ে জীবিত ফিরে গিয়েছে, সে দ্বিতীয়বার আর তাঁর সাথে যুদ্ধ করার কল্পনাও করতো না। অধিকাংশ যুদ্ধেই তিনি লড়াই শেষে পলায়নকারী কাফেরদের হত্যা না করে কয়েকশ মাইল পর্যন্ত এমন ধাওয়া করতেন যে, বাড়ি ফিরে গিয়ে এসব পরাজিত কুফ্ফার সৈন্যরা নিজেদের

মধ্যেই মুসলিম ভীতি ও ত্রাস ছড়াত। তার উদ্দেশ্য এটা হতো যে, সে অযথা পালায়নি। তাই সে যা ঘটত, তার চেয়ে আরো বাড়িয়ে বলত। বলত- 'মুসলমানরা মানুষ নয়, হয়তো ফেরেশতা, নয়তো জ্বীন-ভূত। এদের সাথে তোমরা কোনোদিন পারবে না।' এই ভীতির ফলাফল এই দাঁড়াত যে, পরবর্তীতে কোনো যুদ্ধে এরা যোগদান করলেও দেখা যেত, মুসলমানদের তাকবীর ধ্বনি শুনলেই কিংবা হযরত খালিদ রাদিয়াল্লহুর নাম শুনলেই এরা সর্বাগ্রে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাতে শুরু করতো, ফলে অন্য সকল কুফ্ফাররাও ভয়ে পরাজয় বরণ করে নিত।

কাফেরদের প্রতি তিনি ছিলেন অকল্পনীয়রূপে কঠোর। যারা ইসলামের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছে, আল্লাহ তাআলার দাসত্ব মেনে নিতে অস্বীকার করেছে, কিংবা মুসলমানদের আনুগত্য মেনে নিয়ে জিযিয়া কর দিতে অস্বীকার করেছে, তাদের সাথে সংলাপ নয়, আলোচনা নয়, সন্ধি নয়, তরবারির ফয়সালাই হতো প্রকৃত ফয়সালা। কুফ্ফারদেরকে মনভরে মূলা আর গাজরের মতো কাটতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। নির্দয়ভাবে ক্রুসেডারদের কঁচুকাটা করতে তার জুঁড়ি ছিল না।

➢ রক্তের নদী: উপমা নয় সত্যি!

ইরাক তখন পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত। উলাইয়িসের প্রান্তর। ময়দানের দুইপাশে নদী। পারস্য (ইরানী) ফৌজ সমবেত। তাদের সাথে যোগ দিয়েছে মাদায়েন থেকে আগত ইহুদী বাহিনী। সম্মিলিত বাহিনীর সংখ্যায় মুসলমানদের থেকে প্রায় চারগুণ। তাদের প্রত্যেক সৈন্যের মাথা শিরস্ত্রাণ এবং চেহারা লৌহ শিকলে ঢাকা। তাদের পা পশুর মোটা এবং শুষ্ক চামড়ার আবরণে আচ্ছাদিত।

মুজাহিদ বাহিনী সর্পিল গতিতে এগিয়ে প্রতিপক্ষের সামনে তখন উদয় হয়, যখন শত্রুদের দুপুরের আহার প্রস্তুত সদ্য শেষ হয়েছে। ইরান সেনাপতি যাবানের নির্দেশে আজ অন্য দিনের চেয়ে উত্তম ও মজাদার খাবার পাকানো হয়, উদ্দেশ্য এই যে, তার সৈন্যরা যেন আন্তরিকতার সাথে লড়াই করে এবং এরকম খাবার খাওয়ার জন্য বেঁচে থাকে। যখনই সৈন্যরা খানা খেতে প্রস্তুত তখনই ইরানী এবং ইহুদী সালার ও কমাণ্ডাররা গলা ফাটিয়ে ঘোষণা দিতে থাকে, 'মুসলমান বাহিনী চলে এসেছে, যুদ্ধের জন্য বেড়িয়ে যাও।' কেউ কেউ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়, আর অধিকাংশই ছিল ক্ষুধায় কাতর, তাই মজাদার খানার লোভে আদেশ অমান্য করেই খানা খেতে শুরু করে।

হযরত খালিদ রদিয়াল্লাহ আনহুর মুজাহিদ বাহিনী যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে একবারে সামনে এসে দাঁড়ায়। তাঁরা পৌঁছেই যুদ্ধের জন্য উন্মোখ ছিল। ইরানী ও ইহুদী বাহিনীর মাঝে তারাও ছিল যারা ইতোপূর্বে মুসলমানদের হাতে পরাজিত হয়েছিল। তারা নিজেদের ফৌজ মুসলমানদের তলোয়ার

আর বর্শায় নির্মমভাবে নিহত হতে দেখেছিল। এ সমস্ত লোকেরা মুসলমানদের কথা শুনেই ভীত হয়ে পড়ে।

"পানাহার বন্ধ কর" পূর্ব পরাজিত সৈন্যদের কয়েকজন সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাতে থাকে "এই মুসলমানদের সুযোগ দিও না।...তারা নির্বিচারে হত্যা করবে। পালানোর সুযোগ দিবে না।....প্রস্তুতি নাও।"

আহাররত সৈন্য অগত্যা মাঝপথেই উঠে পড়ে। শত্রুবাহিনী তখনও ঘোড়ায় জীন স্থাপন এবং দেহে বর্ম ধারণে ব্যস্ত ছিল। যাবান আরেকটু সময় হাতে পেতে তৎকালীন রীতি অনুযায়ী ইহুদী নেতা আব্দুল আসওয়াদ আযলীকে মল্লযুদ্ধ করতে সামনে পাঠায়।

তার মোকাবেলার জন্য স্বয়ং হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লাহ আনহু এগিয়ে আসেন। এবং এই অভিশপ্তকে জাহান্নামের রাস্তা দেখিয়ে দেন।

ঠিক এই মুহূর্তে ফোরাতের দিক থেকে অসংখ্য ঘোড়ার খুরধ্বনি ভেসে আসে। ঘোড়াগুলো দ্রুত ছুটে আসে। এটি ছিল হযরত মুসান্না রদিয়াল্লহু আনহুর গেরিলা ঘোড়সওয়ার বাহিনী। ঘোড়াগুলো যেদিক থেকে আসে সেদিকে ইহুদীদের সৈন্যরা ছিল। ঘোড়াগুলো বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে এসে সোজা ইহুদীদের সারি ভেদ করে ভিতরে ঢুকে যায়। অশ্বারোহীদের হাতে বর্শা ছিল। অশ্বারোহীদের বর্শাগুলো এ সময় ইহুদীদের এফোঁড়-ওফোঁড় করতে থাকে।

এদিকে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লাহ আনহু মল্লযুদ্ধ শেষ হতেই একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন। তিনি পার্শ্ব বাহিনীকেও যুদ্ধে শামিল করে দেন। প্রথম আক্রমণের নেতৃত্ব তিনি নিজেই দেন।

ইরানী বাহিনী ক্ষুধার্ত ও অপ্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও প্রথম চোটেই তারা অনেক মুসলমানকে শহীদ করে দেয়। একজন মুসলমান চার-পাঁচজন ইরানী ও ইহুদীর সাথে লড়ছিল। শত্রুকে দুর্বল করার জন্য হযরত মুসান্না রদিয়াল্লহু আনহু দুর্ধর্ষ গেরিলা বাহিনী শত্রু শিবিরে ঝড়-তুফান সৃষ্টি করেই যাচ্ছিলেন। তথাপি শহীদদের সংখ্যা বেড়েই চলছিল।

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লাহ আনহু প্রত্যেক রণাঙ্গনেই দুআ করতেন। কিন্তু এই সর্বপ্রথম যুদ্ধ, যেখানে তিনি ঘোড়া থেকে নেমে মাটিতে হাঁটু ফেলে এবং হাত তুলে দুআ করেন, "ইয়া আল্লাহ! ইয়া পরওয়ারদেগার! আমাদের শক্তি বৃদ্ধি এবং অটুট মনোবল দান করুন যেন আমরা শত্রুদের পিছপা করতে পারি। আমি অঙ্গীকার করছি যে, আপনার দ্বীনের শত্রুদের রক্তে আমি নদী বইয়ে দিব।"

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লাহ আনহু দুআ শেষে নতুন উদ্দীপনা নিয়ে হামলা চালাতে থাকেন। ইতোমধ্যে দু'পার্শ্বের মুজাহিদ সালারদ্বয় শত্রুদেরকে দুদিক থেকে ঘেরাও করে ফেলে। হযরত মুসান্না রদিয়াল্লহু আনহুর বাহিনী অব্যাহত গেরিলা হামলা চালিয়ে যেতে থাকে। চর্তুমুখী পরিকল্পিত তীব্র হামলার মুখে শত্রদের পা টলটলায়মান হয়ে উঠছে। শত্রুসংখ্যা বেশি হওয়ায় তুলনামূলকভাবে তারাই অধিক হারে হতাহতের শিকার হচ্ছিল। স্বপক্ষীয় সৈন্যদের উপর এই ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ দেখে ইতোপূর্বের বিভিন্ন যুদ্ধে যারা পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছিল তারা

সাহস হারিয়ে ফেলে এবং রণাঙ্গন থেকে পালানোর মাঝেই বুদ্ধিমত্তা খুঁজে পায়। তাদের দেখাদেখি অন্যরাও পলায়নের পথ বেছে নেয়। শত্রুদের পিছু হটার দৃশ্য দেখে মুসলমান বাহিনী আক্রমণ তীব্র থেকে তীব্রতর করে। তাদের তরবারি তখন অগ্নিস্ফূলিঙ্গ আর বিদ্যুৎ বর্ষণ করতে থাকে। এরপর হঠাৎ করে কাফেররা রণে ভঙ্গ দিতে শুরু করে।

"পশ্চাদ্ধাবন কর" হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লাহ আনহু এই পয়গাম দিয়ে বাহিনীতে দূত পাঠান এবং উচ্চ আওয়াজে এই ঘোষণাও করান যে, "তাদেরকে পালিয়ে যেতে দিও না। হত্যাও করো না। জীবিত বন্দী কর।"

এই ঘোষণার তাৎক্ষণিক ফল এই দেখা দেয় যে, কুফ্ফাররা পালানোর পরিবর্তে গণহারে অস্ত্র সমর্পণ করতে শুরু করে। যারা পালানোর মাঝেই নিরাপত্তার সন্ধান পেয়েছিল, হযরত মুসান্না রদিয়াল্লহু আনহুর বাহিনী তাদের ইচ্ছায় বাঁধ সাধে। তাদেরকে ঘেরাও করে ধরে ফেলা হয়।

যুদ্ধ শেষ। রণাঙ্গণ লাশ এবং অজ্ঞান ও ছটফটরত আহতদের দ্বারা ভরা ছিল। এক কোণে ঐ খানা অবহেলায় পড়েছিল যা শত্রুরা দুপুরে খেতে বসেছিল। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লাহ আনহুর নির্দেশে মুজাহিদরা খানা খেতে বসে যায়। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লাহ আনহু এসময় মুজাহিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছিলেন, "খানা আল্লাহ পাক তোমাদের জন্য প্রস্তুত করিয়েছেন। প্রাণভরে খাও।" মুসলমানরা বিভিন্ন পদের খানা দেখে বিস্মিত হলো। তারা ইতোপূর্বে এমন খানা খাওয়া তো দূরে থাক, চোখেও দেখে নি। তারা যবের রুটি, উটের দুধ

এবং খেজুর খেতে অভ্যস্ত ছিলেন। আর খাদ্য বলতে তারা এগুলোকেই বুঝতেন।

যে সমস্ত শত্রু জীবিত ধরে আনা হচ্ছিল হযরত খালিদ রদিয়াল্লহু আনহুর নির্দেশে তাদেরকে খুসাইফ নদীর পাড়ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাদের মাথা ধড় থেকে এভাবে বিচ্ছিন্ন করা হয় যে, মাথা সোজা নদীতে গিয়ে পড়ত। অতঃপর মুণ্ডুহীন ধড় নদীর কূলে এভাবে নিক্ষেপ করা হতো যে, রক্ত যা পড়ার সবই নদীতে গিয়ে পড়ত।

এভাবে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মদদ, নুসরত ও বিজয় লাভের পর হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর কৃত অঙ্গীকারকে বাস্তবায়ন করতে থাকেন।

যে নদীর কূলে এই হত্যাকাণ্ড চলে সেখানে একটি বাঁধ ছিল। এই বাঁধের ফলে নদীর পানি থমকে ছিল; পানির প্রবাহ ছিল না। যার দরুণ রক্তও জমে থাকছিল, পানিতে প্রবাহিত হচ্ছিল না। এক ব্যক্তি পরামর্শ দেয় যে, এই বাঁধ খুলে দিলে তবেই রক্তের নদী বইবে; নতুবা বইবেনা। অতঃপর হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লাহ আনহুর নির্দেশে নদীর বাঁধ খুলে দেয়া হয়।

হাজার হাজার মানুষের রক্ত নদীতে পড়লে পানি লাল হয়ে যায় এবং পানি বাঁধ মুক্ত হয়ে স্রোতের বেগে বইতে থাকে। এ কারণে এ দরিয়াকে "খুনের দরিয়া" নামে অভিহিত করা হয়েছে।

পলায়নপর এবং আত্মসমর্পণকারী সৈন্যদের হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লাহ আনহু এজন্য পাইকারী হারে গণহত্যা করেন যে, এই

সৈন্যরা এক যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পালিয়ে গিয়ে আবার পরবর্তী রণাঙ্গণে উপস্থিত হতো। এর প্রতিষেধক 'এন্টিবায়োটিক' হিসেবে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লাহু আনহু এই সিদ্ধান্ত নেন যে, এবার একজনকেও জীবিত রাখা হবে না, এবার সকল ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া আর ফাংগাসকে নির্মূল করা হবে।

ঐতিহাসিকগণ লিখেন, একাধারে তিন দিন পর্যন্ত ইরানী এবং ইহুদীদের গণহত্যা চলতে থাকে। আপনাদের কী ধারণা এই তিনদিনে কত জন আল্লাহর দুশমনকে এভাবে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছিল?

৭০,০০০ (সত্তর হাজার) মাত্র!!!

➤ পরিসংখ্যানটা মনে হয় কম হয়ে গেল!

এ যুদ্ধের কিছুকাল পর (১২ হিজরীতে) মুসলমানদেরকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য এবার রোম, পারস্য (অগ্নিপূজারী) ও ঈসায়ী (খ্রিস্টান)-দের সম্মিলিত বাহিনী ফোরাত নদীর পাড়ে তাঁবু ফেলে। ঠিক অপর পাড়ে অবস্থান নেয় মুসলমানরা।

মুসলিম বাহিনী সম্মিলিত বাহিনীকে শক্তি প্রদর্শনের নিমিত্তে সামরিক মহড়া পরিচালনা করতে থাকে। এদিকে তারাও পাল্টা কিছু মহড়া প্রদর্শন করে। কিন্তু মুসলমানদের উদ্দেশ্যমূলক এই মহড়ার ধারা ষোল দিন যাবত চলতে থাকে। এদিকে মুসলমানরা কোনো আক্রমণ করছে না দেখে সম্মিলিত বাহিনী যুদ্ধের জন্য অস্থির হয়ে ওঠে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, হযরত খালিদ রদিয়াল্লহু আনহু শত্রুদের মনোবলে চিঁড় ধরাতে খুবই পারঙ্গম ছিলেন। মানসিকভাবে শত্রুদের কোন্ঠাসা করতে তাঁর জুড়ি ছিল না। উদ্ভূত পরিস্থিতিতেও হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লাহ আনহু সম্মিলিত বাহিনীকে দোদুল্যমান অবস্থায় নিক্ষেপ করে তাদের মানসিকভাবে এমন পঙ্গু করে দেন যে, বর্তমানে কোন্ অবস্থা চলছে এবং এহেন পরিস্থিতিতে তাদের করণীয় কী- তা তারা নির্ণয় করতে পারছিল না।

শেষ পর্যন্ত ৬৩৪ ঈসায়ী সালের ২১ জানুয়ারি (১২ হিজরীর ১৫ জিলকদ) ওপাড় থেকে জনৈক সেনাপতি নদীর কিনারায় দাঁড়িয়ে জোর আওয়াজে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলে "তোমরা নদী পেরিয়ে এপাড়ে আসবে নাকি আমরা ওপাড়ে আসব? যুদ্ধ করতে চাইলে মুখোমুখি হও।"

"আমাদের সংখ্যা খুবই সীমিত" হযরত খালিদ রদিয়াল্লহু আনহু লোক মারফৎ ঘোষণা করিয়ে দেন,"আমাদের ভয় কর কেন? তোমাদের সংখ্যা এত বেশি যে, জিজ্ঞাসা ছাড়াই তোমাদের এপারে আসা উচিত।"

"তাহলে ঠেলা সামলাও" শত্রু বাহিনীর পক্ষ থেকে উচ্চকিত আওয়াজ শোনা যায় "আমরা আসছি"।

শত্রুরা নদী পার হচ্ছে। এদিকে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লাহ আনহু বাহিনীকে নদীর পাড় হতে কিছুটা দূরে সরিয়ে এনে সৈন্য বিন্যাস করেন। তিনি শত্রুবাহিনীর জন্য এত বেশি স্থান খালি করে দেন, যাতে শত্রুদের সকলেই সেখানে সমবেত হতে পারে এবং তাদের পশ্চাতে থাকে নদী। শুধু তাই নয়, হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লাহ আনহু মুসলিম বাহিনীকে আরও সরিয়ে নেন এই উদ্দেশ্যে, যাতে শত্রু বাহিনীর

পেছনেই নদী না পড়ে, তাহলে পেছনের দিক তাদের সংরক্ষিত হয়ে যাবে। তাই তিনি সৈন্যদের আরও সরিয়ে নেন, যাতে শত্রু বাহিনীর পেছনে নদীর আগে কিছু স্থান খালি থাকে, যাতে প্রয়োজনে সেদিক দিয়েও আক্রমণ করা যায়।

নদীর এপাড় এসে রোমীয় বাহিনীর জেনারেলরা পারস্য বাহিনী ও ঈসায়ীদের পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত করে। তাদের যুক্তি ছিল, এই বিভাজন দ্বারা সহজেই জানা যাবে, কারা কেমন লড়েছে। পলায়নপর গোত্র কারা তাও জানা যাবে। এভাবে সকল গোত্র পৃথক পৃথক হয়ে যায়।

"আমার বন্ধুগণ!" হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লাহ আনহু শত্রুদের এভাবে বিভক্ত হতে দেখে সালারদের ডেকে পাঠান এবং তারা উপস্থিত হলে তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, "আল্লাহর কসম! হয়তো শত্রুরা বোকা, নয়তো তারা আমাদেরকে বোকা মনে করেছে। আপনারা কি দেখছেন না, শত্রুরা কিভাবে নিজেদের ছড়িয়ে দিয়েছে?"

"শত্রুরা আমাদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করেছে, ইবনে ওলীদ!" সালার কা'কা বিন আমর রদিয়াল্লহু আনহু বলেন,"তাদের মতো আমাদেরকেও তো বিক্ষিপ্ত হতে হবে। অতঃপর এক একজনের মোকাবেলা দশ দশজনের সঙ্গে হবে।"

"মাথায় বুদ্ধিদানকারী আল্লাহ তাআলা!" হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, "আমরা মুখোমুখি লড়াই করবো না। অশ্বারোহী বাহিনীর সালার শুনুন! অশ্বারোহী বাহিনী দু'ভাগে ভাগ হয়ে শত্রুদের ডান-বাম পাশে চলে যাবেন। পদাতিকরাও তাদের সঙ্গে থাকবে। ডানে বামে গিয়ে পশ্চাতে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। আমি স্বীয় বাহিনীর সঙ্গে

শত্রুদের সামনে থাকব। চতুর্দিক হতে শত্রুদের উপর জোরদার হামলা করুন। শত্রুরা এখনও লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়নি। চারদিক থেকে শত্রুদের উপর এমনভাবে আক্রমণ করুন, যাতে তাদের ভাগ-বিন্যাস লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। আল্লাহর নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন।"

শত্রুরা এখনোও পুরোপুরি প্রস্তুত হয়নি। ইতোমধ্যে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লাহু আনহুর ইশারায় মুসলিম বাহিনী চতুর্দিক হতে তাদের উপর একযোগে হামলা চালায়। আক্রমণের পাশাপাশি যখন শত্রুদের উপর চতুর্দিক থেকে তীর বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছিল, তখন ছড়িয়ে পড়া বিভক্ত দলগুলো ক্রমেই ভেতর দিকে আসতে থাকে। চারপাশের সৈন্যরা ক্রমে সরে আসায় মূল রণাঙ্গণে এত সৈন্যের সমাগম হয় যে, চরম ভীড়ের অবস্থার সৃষ্টি হয়। এত চাপাচাপির কারণে শত্রুদের ঘোড়াগুলো পর্যন্ত এদিক-ওদিক ফেরানোর স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। এদিকে অতি সহজেই মুসলিম অশ্বারোহী বাহিনী সংখ্যার স্বল্পতা সত্ত্বেও শত্রুদের ঘিরে ফেলে। ইরানী এবং ঈসায়ীরা প্রথম থেকেই মুসলমানদের ভয়ে ভীত ছিল। তারা মুসলমানদের হাতে চরম মার খেয়ে আত্মরক্ষা করতে পালানো বা পিছু হটার পন্থায় রোম বাহিনীর অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। এতে করে সেখানেও মানবজট সৃষ্টি হয়। রোমীয়দের স্থান সংকুচিত হয়ে যাওয়ায় তারাও পূর্বের মত স্বাধীন ও স্বাচ্ছন্দে লড়তে পারে না।

এভাবে চতুর্দিকের বিক্ষিপ্ত শত্রু সৈন্য এক স্থানে এসে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হয়, ঠিক তখনি পদাতিক বাহিনী শত্রুদের পিছনে চলে যেতে সক্ষম হয়।

এবার পুরো শত্রু বাহিনী মুসলমানদের ঘেরাওয়ের মধ্যে।

হা হা হা! বলুনতো এর পর কী হলো?

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লাহ আনহু যুদ্ধে এমন চাল চালেন যে, রণক্ষেত্রে যুদ্ধ চলছিল না; যা চলছিল তা হলো, রোম, পারস্য ও খ্রিস্টানদের উপর গণহত্যা।

একেকজন সাহাবী পারমাণবিক বোমার চেয়েও ভয়ংকর রূপ ধারণ করেন। এক পর্যায়ে রোমীয়রা আত্মরক্ষামূলক লড়াই করার চেষ্টা করে কিন্তু রণাঙ্গন তাদের আহত সৈন্য ও মরা লাশ দ্বারা ভরে গিয়েছিল। চোখের সামনে সাথী-সৈন্যদের এভাবে কাতরাতে ও মরতে দেখে অবশিষ্ট সৈন্যদের মনোবল ভেঙ্গে যায়। তারা জীবন বাঁচাতে পালাতে চেষ্টা করে।

"পশ্চাদ্ধাবন কর", আল্লাহর তরবারির হুঙ্কার, "একজনও যেন জান নিয়ে পালাতে না পারে।"

মুজাহিদ বাহিনী পলায়নপর সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবন করে তাদের তীর এবং বর্শার টার্গেট বানিয়ে বধ করতে থাকে। এভাবে এক সময় যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। যুদ্ধের ফলাফল কী ছিল জানেন?

প্রায় সকল ঐতিহাসিক লিখেছেন, এ যুদ্ধে রোম, পারস্য ও ঈসায়ীদের এক লক্ষ সৈন্য মুসলমানদের নির্দয় গণহত্যার শিকার হয়। একটি বিরাট সম্মিলিত বাহিনী এক দিনে খতম হয়ে যায়। এই যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা কত ছিল ধারণা করতে পারেন? মাত্র পনের হাজার। আল্লাহু আকবার!!!

এইভাবে ইসলামের প্রতিটি যুদ্ধই কাফেরদের কঁচুকাটা করার ইতিহাস। "(সাহাবাগণ) কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর, নিজেদের প্রতি বড়ই সহানুভূতিশীল"-এই আয়াতের বাস্তব নমুনা পাওয়া যায়।

➤ সাহাবায়ে কেরাম এটি কী করলেন?:

আল্লাহ তাআলা চান মুসলমানরা জিহাদের মাধ্যমে পৃথিবীর বুক থেকে কাফেরদের মূলোৎপাটন করুক। বদরের যুদ্ধে যখন ৭০ জন কাফের বন্দী হলো, তাদের ব্যাপারে কী করা যায়, তা সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য আল্লাহর রাসূল ﷺ পরামর্শ সভা আহ্বান করলেন। সকলেই খেয়াল দিচ্ছিলেন, এদের মধ্যে হযরত ওমর রদিয়াল্লহু আনহু খেয়াল পেশ করলেন, এদের হত্যা করা হোক। কিন্তু নবীজী ﷺ ছিলেন দয়ার সাগর, তিনি আরেকটু নরম হতে চাচ্ছিলেন। হযরত আবু বকর রদিয়াল্লহু আনহু বুঝতে পেরে খেয়াল পেশ করলেন, ওদেরকে মুক্তিপণ দিয়ে ছেড়ে দেয়া হোক। অবশেষে মুক্তিপণের সিদ্ধান্তই হলো। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি চাচ্ছিলেন কাফেরদের হত্যা করা হোক। এদের শিকড় কেটে দেয়া হোক। ভবিষ্যতে এরা যেন আর কোনোদিন মুসলমানদের বিরুদ্ধে তরবারি উত্তোলন করতে না পারে। এদের দ্বারা উম্মতের ক্ষতির আশঙ্কা যেন পুরোপুরি নির্বাপিত হয়ে যায়। আর এরা এমন নির্বোধ, অভিশপ্ত সম্প্রদায়, আল্লাহর যমীনে এদের এক ফোঁটা পানি পান করার অধিকারও নেই। তাই এদের হত্যা করা হোক!!! এই কারণে নবীজী ﷺ-এর সাহাবাদের সেই মকবুল জামাতের উপরও আল্লাহর আযাব চলে এসেছিল। কেবল পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হওয়ায় আল্লাহ তাআলা

আযাব উঠিয়ে নেন। এই ৭০ জন কাফেরকে হত্যা না করায় আল্লাহ পাক পরবর্তী যুদ্ধে (ওহুদের প্রান্তরে) ৭০ জন সাহাবীর শাহাদাতের ফয়সালা করেন। আল্লাহ তাআলা নবীজী ﷺ-কে উদ্দেশ্যে করে ইরশাদ করেন,

يَٰأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَاهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ

"হে নবী! আপনি কাফের ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের উপর কঠোরতা অবলম্বন করুন; কেননা, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম; আর তা হচ্ছে এক নিকৃষ্ট ঠিকানা।" (৬৬ সূরা আত্তাহরীম: ০৯)

তাই 'আল্লাহর তরবারি' হিসেবে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লহু আনহু এবং তাঁর সঙ্গী সাহাবীগণ মূলতঃ আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাকেই প্রতিটি যুদ্ধে বাস্তবায়ন করেছেন। কুফ্ফারদের নির্মম ও নির্দয়ভাবে গণহত্যার মাধ্যমে নির্মূল করেছেন। আল্লাহ তাআলার ইরশাদ,

لِيَقْطَعَ طَرَفاً مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَآئِبِينَ

"আল্লাহ তাআলা এই যুদ্ধের দ্বারা কাফেরদের একটি দলকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চান, অথবা তাদের একাংশকে তিনি এর মাধ্যমে লাঞ্ছিত করে দিতে চান, অতঃপর তারা যেন ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়।" (৩ সূরা আলে ইমরান: ১২৭)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন,

وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَافِرِينَ

“আর (জিহাদকে) এ কারণে (ফরয করা হয়েছে যে,) আল্লাহ তাআলা (এর দ্বারা) ঈমানদারদেরকে পাক-সাফ করতে চান এবং কাফেরদেরকে ধ্বংস করে দিতে চান।” (৩ সূরা আলে ইমরান: ১৪১)

ঠিক একইভাবে, বর্তমান বিশ্বের যত ইহুদী, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান আর নাস্তিক-মুরতাদ রয়েছে, যে বা যারা আল্লাহ তাআলার দ্বীন পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বাধা হয়ে দাঁড়াবে কিংবা মুসলমানদের উপর তরবারি উত্তোলন করবে, ইন্‌শাআল্লাহ হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস্‌ সালাম ও হযরত ঈসা আলাইহিস্‌ সালামের নেতৃত্বে তাদের সকলের পরিণতি খুব শীঘ্রই এমনই হবে। এদের পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোনো অধিকারই নেই। হযরত ঈসা আলাইহিস্‌ সালাম এসে জিযিয়া কর উঠিয়ে দিবেন। তাঁর পর পৃথিবীতে আর কোনো জিহাদ হবে না। অর্থাৎ উনার আমলে পৃথিবীতে কোনো অমুসলিম থাকবে না। তা কিভাবে সম্ভব হবে?

হয়তো পৃথিবীর সকল হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ইহুদী ও অন্যান্য কাফের-মুশরিক মালাউনরা ঈমান আনবে, নয়তো এদেরকে একসাথে করে টমেটো আর বেগুনের মতো কেটে রক্তের নদী প্রবাহিত করা হবে, আর এদের ঘরের ললনাদের ধরে দাসী-বাদী বানিয়ে মুসলমানদের ভোগ্য পণ্য বানানো হবে । এটিই হচ্ছে খোদাদ্রোহীদের ন্যায্য পাওনা!!! এটিই হচ্ছে পৃথিবীতে বাতিলের শেষ পরিণতি!!! আর আখিরাতের আযাব তো আরো ভয়াবহ!!!

➤ দুঃসাহসী অভিযাত্রী হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লাহ্ আনহুঃ

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লহু আনহু ছিলেন এমন এক সমর অধিনায়ক, যিনি সঙ্কটে পা দিয়ে তার গভীরতা মাপতেন। তিনি যুদ্ধের খাতিরে আল্লাহর উপর ভরসা করে আত্মঘাতী পদক্ষেপ নিতেও পিছপা হতেন না। একবার আমীরুল মু'মিনীন হযরত আবু বকর রদিয়াল্লহু আনহু হযরত খালিদ রদিয়াল্লহু কে নির্দেশ পাঠান যে, তিনি যেন জলদি সিরিয়ার সীমান্তবর্তী স্থানে গিয়ে পৌঁছান, যেখানে মদীনার বাহিনী শিবির স্থাপন করেছে। সেখানকার মুজাহিদ বাহিনী বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। রোমানদের প্রায় এক লক্ষাধিক সৈন্য মুসলমানদের অস্তিত্বকে পৃথিবীর বুক থেকে মিটিয়ে দেয়ার জন্য একত্রিত হয়েছে। হযরত খালিদ রদিয়াল্লহু আনহু চিন্তা করলেন, যদি স্বাভাবিক রাস্তা দিয়ে যাওয়া হয় তাহলে অনেকদিন সময় লেগে যাবে, ফলে মুসলমানরা কুফ্‌ফারদের ঘেরাওয়ের মাঝে পড়ে যাবে। তাই কোনো শর্টকাট রাস্তা অবলম্বন করতে হবে। ফলে তিনি মরুভূমির এমন এক দুর্গম রাস্তা বেছে নিলেন, যে পথে সাপও চলতে সাহস পায়না, ঘোড়াও চলতে পারে না। ১২০ মাইল দীর্ঘ পথটি এতই উত্তপ্ত ছিল যে ঘোড়াও তৃষ্ণা সহ্য করতে পারে না, ঘোড়ার পানের জন্য সাথে করে পানিও নেয়া যায় না। ভয়াবহ এই রাস্তা দিয়ে কোনোদিন কোনো সৈন্য অতিক্রম করেনি। ফলে এই রাস্তা দিয়ে গমন করার অর্থ ছিল আত্মহত্যা করা কিংবা নিজের বাহিনীকে নিজের হাতে হত্যা করা।

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লহু আনহু নয় হাজার মুজাহিদীন নিয়ে আত্মহত্যার সমতুল্য এই সফরে রওয়ানা হলেন। মরুভূমি তখন বারুদের মতো জ্বলছিল। মুসলিম এবং ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ যাকে ইতিহাসের

সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ও ভয়াবহ সফর বলে আখ্যায়িত করেছেন। হযরত মুসান্না রদিয়াল্লহু আনহু বিদায় দিতে এসে কান্না শুরু করে দিলেন। কারণ তাঁর বিশ্বাস হচ্ছিল না যে, হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লহু আনহু ও নয় হাজার মুজাহিদ (যাঁদের অধিকাংশই সাহাবী)-কে দ্বিতীয়বার তিনি কখনো জীবিত দেখতে পারবেন। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লহু আনহু উটে চড়তে থাকলে হযরত রাফে বিন উমাইরা রদিয়াল্লহু আনহু দৌঁড়ে এসে বললেন-"এখনও ভাবুন। রাস্তা বদলান। এতগুলো প্রাণ নিয়ে খেলবেন না।" এতে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লহু আনহু রেগে যান এবং তাঁর সিদ্ধান্তে তিনি অটল, অবিচল থাকেন।

যাত্রা শুরু হলো।

প্রথম দিন। যে মরু প্রান্তর রাতে শীতল ছিল তা সূর্য উঠতেই উত্তপ্ত হতে থাকে। সূর্য যখন আরো উপরে উঠে যায় তখন জমিন থেকে পানির মতো রংয়ের অগ্নিশিখা উঠতে থাকে। পানির রংয়ের মরীচিকা ঝলমল করতে থাকে। সামনে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। মুজাহিদরা একে অপরকে চিনতে পারছিলেন না। প্রথম সন্ধ্যায় যখন যাত্রা বিরতি দেয়া হয় তখন সকলে পানির উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তাদের দেহে যেন আগুন জ্বলছিল।

দ্বিতীয় দিন। প্রত্যেক মুজাহিদ অনুভব করেন, তাঁরা আগেও মরুভূমি দিয়ে পাড়ি দিয়েছেন, এবারের মরুভূমি যেন মরুভূমি নয়; সাক্ষাৎ জাহান্নাম, যার মধ্য দিয়ে তারা পথ চলছিলেন। একদিকে কঠিন উত্তাপ, অপরদিকে বালু সোনালী ঝলক, যা তাদের চোখ খুলতে দিচ্ছিল না।

তৃতীয় দিন। সফর এত ভয়ংকর এবং কষ্টকর হলো যে, উঁচু-নিচু এবং অসংখ্য টিলা বিশিষ্ট স্থান শুরু হলো। বালু এবং মাটির টিলা ও ঢিবিগুলো আগুনের প্রাচীরের মতো হয়ে গিয়েছিল। দেয়ালের মতো টিলাগুলো মুজাহিদ বাহিনীকে দগ্ধ করছিল। এদিন সন্ধ্যায় যাত্রাবিরতির পর দেখা গেল যে, মুজাহিদরা কথা বলতে পারছিলেন না। সবচেয়ে ভয়াবহ যা ঘটল তা হলো, তারা যে পানি বহন করে নিয়ে এসেছিলেন তা শেষ হয়ে গিয়েছে।

চতুর্থ দিন। এ দিনটি কেয়ামতের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। এক ফোঁটাও পানি নেই। মরুভূমিতে পিপাসার একটি অবস্থা হলো মাথা বিগড়ে যায়। এটা হয় তখন যখন মরীচিকা চোখে পড়ে। শহর এবং সামুদ্রিক জলযান চোখে পড়ে এবং মুসাফির তাকে বাস্তব মনে করে। এক মুজাহিদ বলে উঠে, "ঐ যে পানি দেখা যায়,....প্রথমে আমি পানি পান করব।" তার দেখাদেখি আরো তিন-চারজন মুজাহিদও তার পেছনে ছুটে যায়। এভাবে মরুভূমি কুরবানী উসুল করা শুরু করে দেয়। সকলের পরিণতি যা হলো, তা মৃত্যু। আহ্! এদিনটি ছিল বাস্তব অর্থে জাহান্নামের একটি দিন। মনে হচ্ছিল, সেদিন সূর্য আরো নিচে নেমে এসেছে। মরীচিকার শিকার মুজাহিদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। স্বয়ং হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লহু আনহু-এর অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছিল যে, তাঁর কোনো খোঁজ-খবর ছিল না যে, সৈন্যদের মাঝে কোন্ হালত চলছে। শুধুমাত্র দৃঢ়প্রত্যয় এবং এক অজেয় শক্তি তাদের জীবিত রাখছিল। এদিকে অবলা উটগুলো আপন মনে চলছিল। যদি উট থেমে যেত তাহলে একজন মুজাহিদের পক্ষেও এক কদম অগ্রসর হওয়া সম্ভব হতো না।

সফরের শেষ দিন। সকালে সূর্য উদিত হয়ে মুজাহিদদেরকে শাহাদাতের পয়গাম দিতে থাকে। কয়েকজন মুজাহিদ উটের উপর বেহুঁশ হয়ে পড়েন। ভাগ্য ভালো যে, তারা হেলে-দুলে পড়ে যায়নি। সৈন্যরা তখন একটি বাহিনীর মতো যাচ্ছিল না। উট ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল। অনেক উট বেশ পিছনে পড়ে গিয়েছিল। কিছু উট ডানে ও বামে সরে গিয়েছিল। চলার গতি আশংকাজনক হারে শ্লথ হয়ে পড়েছিল। এটা পানি ছাড়া দ্বিতীয় দিন।

পানি ছাড়া এভাবে জাহান্নামের মাঝে দ্বিতীয় দিনও বেঁচে থাকা একটি মোজেজা ছিল। কোন্ শক্তি তাঁদেরকে এভাবে জীবিত রেখেছিল? তা ছিল আল্লাহর ঐ পয়গাম যা রাসূলুল্লাহ ﷺ এনেছিলেন। মুজাহিদ বাহিনী মানবতার মুক্তির জন্য আল্লাহর এই পয়গাম পৃথিবীর কোনায় কোনায় পৌঁছানোর জন্য মরু অগ্নির মধ্য দিয়ে চলছিল। আল্লাহ তাআলা তাদের বড় কঠিন পরীক্ষায় লিপ্ত করেছিলেন এবং তিনিই তাদের জীবিত রেখেছিলেন। মুজাহিদ বাহিনী আল্লাহর জন্য জীবন বাজি ধরেছে, আর আল্লাহ তাদের জীবন রক্ষা করবেন না, তা কি হয়?

এদিকে সূর্যাস্তের অনেক পূর্বে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লহু আনহু হযরত রাফে ইবনে উমাইরা রদিয়াল্লহু আনহুর নিকট যান, যিনি এই সফরের পথ প্রদর্শক ছিলেন। বহু কষ্টে শব্দগুলো বের করে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এখন কি আমাদের ঐ ঝর্ণার নিকট থাকার কথা ছিল না, যার কথা তুমি বলেছিলে?" ইতোমধ্যে মরুভূমি হযরত রাফে রদিয়াল্লহু আনহুর দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিয়েছে। তিনি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না। তার

পক্ষে ঝর্ণার সন্ধান দেয়া অসম্ভব ছিল। তার মানে মুজাহিদ বাহিনী পথ হারিয়ে ফেলেছে। তাই সকলে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

"ইবনে ওলীদ!" রাফে বিন উমাইরা রদিয়াল্লহু আনহু বলেন, "আপনি লোকদের বলুন, তারা যেন একটি গাছ তালাশ করে, যার সারা গায়ে কাঁটা থাকবে এবং সেটা বেশি উঁচু হবে না। গাছটি দূর থেকে এমনভাবে দেখা যাবে, যেন একজন লোক বসে আছে। গাছটি দুই টিলার মাঝখানে হবে।"

প্রেরিত মুজাহিদগণ বেড়িয়ে পড়েন। তারা বহু সময় ঘুরে ফিরে এসে নিরাশার সংবাদ জানান, কোথাও এমন কোনো গাছ নযরে পড়ে নি। "ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। বুঝে নিন, আমরা সকলেই মরে গেছি।" রাফে রদিয়াল্লহু আনহু বললেন, "আবার যাও। আশা করি গাছ পেয়ে যাবে। বালুর মাঝে খোঁজ করবে।"

মুজাহিদরা আবার যান। বর্শা এবং তলোয়ার বালুরাশির মধ্যে মেরে মেরে কাঙ্ক্ষিত গাছটি খুঁজতে থাকেন। এক স্থানে তাঁরা একটি বালুর ঢিবি দেখতে পান। বালু সরালে তার নিচে মাথা মোড়ানো একটি গাছের দেহাবশেষ আবিষ্কৃত হয়।

"ঐ গাছটি উপড়ে ফেল" রাফে রদিয়াল্লহু আনহু বলেন, "এবং ঐ স্থান থেকে মাটি খনন কর।"

মাটি কিছু দূর খনন করতেই পানির দেখা মিলল। পানি মাটির অভ্যন্তর হতে বের হয়ে নদীর মতো বইতে থাকে। সৈন্যরা ঐ গর্তটি খনন করে বড় বানায়। এক পর্যায়ে তা ছোট খাট একটি পুকুরে পরিণত হয়।

পানি আবিষ্কৃত হলে মুজাহিদ বাহিনী পানির উপর হামলে পড়ে। এই পানি এত বেশি ছিল যে, সকল মুজাহিদ তা পান করেন এবং উট-ঘোড়া পান করার পরও তা সমানবেগে উঠতে থাকে। সুব্‌হানাল্লাহি ওয়াল্লাহু আক্‌বার!!!

উল্লেখ্য, প্রায় ৩০ বছর আগে ছোট সময় একবার রাফে রদিয়াল্লহু আনহু তাঁর পিতার সাথে এই পথে সফর করেছিলেন, তখন পথে একটি ঝর্ণা দেখেছিলেন। এ ঝর্ণাটিকে বর্তমানে বালুরাশি ঢেকে ফেলেছিল। এটা আল্লাহ তাআলার এক রহস্য যে, তিনি হযরত রাফে রদিয়াল্লহু আনহুকে ছোট সময় এই রাস্তা চিনিয়েছিলেন এবং ঝর্ণাটিকে মুজাহিদ বাহিনীর জন্য বালুরাশির নীচে বিদ্যমান রেখেছিলেন।

➢ ঘটনাটির শিক্ষা:

উক্ত ঘটনা দ্বারা হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লহু আনহুর নির্ভীকতা, আল্লাহর সাহায্যের প্রতি অপরিসীম ভরসা, দ্বীনের জন্য দুঃসাহসিক আত্মঘাতী পদক্ষেপ গ্রহণের মানসিকতা এবং সাহাবায়ে কেরামের কুরবানী ও আমীরের ইতায়াতের (আনুগত্যের) যোগ্যতা প্রকাশ পেল। অন্যদিকে আল্লাহ তাআলাও তাঁর বাহিনীকে মদদ ও নুসরতের মাধ্যমে প্রমাণ করে দেখালেন যে, তাঁর ওয়াদা সত্য, তিনি মুসলমানদেরকে কখনোই ধ্বংস হতে দিবেন না। মুসলমানরা যখনই মৃত্যুকে উপেক্ষা করে আল্লাহ তাআলার জন্য নিজের জীবন কুরবানী করতে প্রস্তুত হয়ে যায়, তখনই আল্লাহ তাআলার সাহায্য চলে আসে।

"যারা সত্য ও সততার উপর থাকে আল্লাহ তাআলা তাদের সাথে থাকেন। কিন্তু মনে রেখ, **আল্লাহর সাহায্য তখনই লাভ করবে, যখন অন্তর থেকে ভয়-ভীতি দূর করে একে অপরের হাত ধরে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এবং আল্লাহর রাহে জীবন উৎসর্গ করার দৃঢ় শপথ করবে।** যারা রব হিসেবে একমাত্র আল্লাহকে বিশ্বাস করে না এবং ইসলামের সত্যতা স্বীকার করে না তারা আমাদের দুশমন। তাদেরকে হত্যা করা ফরয। মনে রেখ, আঘাত করতে গেলে অনেক সময় আঘাত খেতেও হয়। ঈমান থেকে শক্তিশালী এমন কোনো শক্তি নেই যা শত্রুর হাত থেকে তোমাদেরকে বাঁচাতে পারে। মদীনা নয়, লালিত চেতনা ও ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস রক্ষা করাই এখন প্রধান কাজ। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে অগ্রসর হলে দশ হাজারের মোকাবিলা করেও বিজয় ছিনিয়ে আনতে পারবে। **হতবল এবং ভীতুদের পক্ষে আল্লাহ পাক কখনো স্বীয় কুদরত প্রদর্শন করেন না।** আকীদা রক্ষা এবং স্বীয় ভূখণ্ড রক্ষায় তোমাদেরই সর্বোচ্চ নৈপুন্য ও বীরত্বের চমক দেখাতে হবে।"

-খন্দকের যুদ্ধে কুরাইশদের সম্মিলিত বাহিনী মদীনা অবরোধ করলে সাহাবায়ে কেরামদের উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ ﷺ।

নবীওয়ালা এবং সাহাবাওয়ালা যিন্দেগী

(গরীব ইসলাম)

-ঃ (প্রথম খণ্ড সমাপ্ত) ঃ-

[কিতাবটি তিন খণ্ডে রচিত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হবে ইন্‌শাআল্লাহ।]

বর্তমান যামানায় সবচেয়ে বড় দাওয়াত- উম্মতকে ‘অপরিচিত’ ইসলামের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

-শাইখ মাহমুদ আল হিন্দী।